ড: মুহাম্মাদ জুবায়ের

# মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতাবাদ ও তার প্রবক্তারা

# মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতাবাদ ও তার প্রবক্তারা

ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের

অনুবাদক : শাকের আনোয়ার

সম্পাদক : ইলিয়াস মশহুদ

কালান্তর প্রকাশনী



# প্রকাশকের কথা

মুসলিম সমাজে ধর্মীয় পরিসরে আধুনিকতাবাদী বলতে এমন লোককে বোঝায়, যিনি শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত এবং স্বীকৃত ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন এবং ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতায় সামঞ্জস্য প্রমাণে চেষ্টমান। নামে মুসলিম হলেও আধুনিকতাবাদীরা পশ্চিমের নানা মতবাদ ও ধ্যান-ধারণার নিরিখে ইসলামকে বিচার করেন। ইসলামের যা কিছু ইউরো-মার্কিন আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে অসমঞ্জস, সেই সবকিছুকে তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয় করতে তাঁদের মেধা ও মনন ব্যয় করেন। এ জন্য তাঁরা চৌদ্দশো বছর ধরে চলে আসা কুরআন-হাদিসের প্রতিষ্ঠিত মত ও সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এই আধুনিকতাবাদী প্রবণতা প্রথমে মুতাজিলাদের হাত ধরে হিজরি প্রথম শতকে শুরু হয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উনিশ ও বিশ শতকে এ আন্দোলন নতুনভাবে জেগে ওঠে, অতীতের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে। এই সময়ে যাঁদের মাধ্যমে এই আন্দোলনটি গতি পায়, তাঁদেরকে বলা হয় আধুনিকতাবাদী বা মডারেট মুসলিম। এঁরা হয়ে থাকেন মেধায় অনন্য, জ্ঞানে-গুণে অসাধারণ। 'বেশি জ্ঞান'-এর ফলে তাঁরা একসময় হয়ে ওঠেন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। তাঁদের মন-মগজ অভিভূত করে রাখে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ। এরই আলোকে তাঁরা ইসলামের অদ্ভুত সব ব্যাখ্যা করতে থাকেন। দীনকে হাসি-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেন। ফলে ইসলামের এমন এক সংস্করণের উদ্ভব ঘটে, যেখানে প্রকৃত ইসলামকে খুঁজে পাওয়া শুধু কঠিনই নয়, রীতিমতো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের এমন কজন আধুনিকতাবাদী মুসলিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের চিন্তার ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি এ বিষয়ে পথিকৃৎ হতে পারে। একে আশ্রয় করে আরও অনেক রচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

অনুবাদক শাকের আনোয়ার গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি অনুবাদ করে বড় একটি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেছেন এবং মূল বইয়ে কয়েকজনের আলোচনা একেবারে সংক্ষিপ্ত হওয়ায় একই লেখকের অন্যান্য বইয়ের

সহযোগিতা নিয়ে এর পূর্ণতাসাধন করেছেন। মুসলিম আধুনিকতাবাদের অন্যান্য প্রবক্তাদের নিয়ে তাঁরই অনুবাদে আমরা আরেকটি বই প্রকাশের ইচ্ছা রাখি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

বইটি সম্পাদনা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। সম্পাদনা সহযোগী ছিলেন মুতিউল মুরসালিন। পাঠকের দৃষ্টিতে দুইবার আগাগোড়া নিরীক্ষা করেছেন আলমগীর হুসাইন মানিক। সবশেষে প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ এবং আবদুল হকও একবার করে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়েছেন এবং শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও কালান্তরের অন্যান্য প্রকাশনার মতো এতে প্রয়োজনীয় শিরোনাম-উপশিরোনাম ও টীকা-টীপ্পনী সংযোজন করা হয়েছে এবং এর বিন্যাসকে সাবলীল ও সুন্দর করার সম্ভব সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। তবু অপূর্ণতা, অসংগতি বা ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠকের সকল প্রস্তাব ও পরামর্শ আমরা সবসময়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করি। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টা মহান আল্লাহ কবুল করুন!

**খতিব তাজুল ইসলাম**

চেয়ারম্যান

কালান্তর প্রকাশনী

সেপ্টেম্বর ১, ২০২৩





# অনুবাদকের কথা

ইসলামকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে উপস্থাপন করা, হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়াদির ক্ষেত্রে শিথিলতা করা কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বৈধতা দেওয়া—সর্বোপরি কুরআন ও হাদিসের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার প্রবণতাই সংক্ষেপে আধুনিকতাবাদ।

মুতাজিলাদের বহু শতাব্দী পরে মুমূর্ষু এ দৃষ্টিভঙ্গি যাঁদের শুশ্রূষায় পুনর্জীবন লাভ করে, তাঁদের অগ্রসারিতে ছিলেন মিসরে সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি ও তাঁর দুই ভাবশিষ্য মুফতি আবদুহু ও শায়খ রশিদ রিজা এবং আমাদের উপমহাদেশে স্যার সাইয়িদ আহমাদ খান, গোলাম আহমাদ পারভেজ, মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান, জাবেদ আহমাদ গামিদি, তাহির কাদরি প্রমুখ।

বাংলাভাষায় ইসলামি পরিসরের আধুনিকতাবাদ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ আমাদের চোখে পড়েনি—না মৌলিক রচনা, না অনুবাদ। এ খালি জায়গাটা পূরণ করতেই আমি বক্ষ্যমাণ বইটি অনুবাদে আগ্রহী হই। সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল এ বইয়ে লেখক আধুনিকতাবাদীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁদের চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস এবং নানা বিষয়ে তাঁদের মনগড়া ব্যাখ্যাগুলো গুছিয়ে তুলে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। বিজ্ঞ পাঠক সমালোচনায় তাঁকে আশ্চর্যরকম ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ এবং উদ্ধৃতি উপস্থাপনে চূড়ান্ত সতর্ক হিসেবেই দেখতে পাবেন।

লাহোরের রিফাহ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. হাফিজ মুহাম্মাদ জুবায়ের পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলিম ও গবেষক। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর কিছু প্রবন্ধের সংকলন, যেগুলো ২০১০-২০১১ সালে লাহোরের মাসিক *মিসাক* ও মুলতানের *আল-আহরারে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পাঠকদের অনুরোধে লেখক সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

উর্দু মূল বইটির নাম *তাহরিকে তাজাদ্দুদ আওর মুতাজাদ্দিদিন*। এতে ওয়াহিদুদ্দিন খান এবং গামিদির আলোচনা ছিল না। পূর্ণতাসাধনের স্বার্থে আমরা অনুবাদক-প্রকাশক মূল লেখকের অনুমতি ও পরামর্শক্রমে তাঁরই অন্য দুটি বই *মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান : আফকার ওয়া নাজরিয়াত* এবং *ফিকরে গামিদি : এক তাহকিকি ওয়া তাজজিয়াতি*

*মুতালাআ* থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ চয়ন ও তরজমা করে সংশ্লিষ্ট দুটি অধ্যায় যোগ করে দিয়েছি। সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি কিছু প্রয়োজনীয় টীকা ও তথ্যসূত্র—যা মূলে ছিল না।

লেখালিখিতে আমি নতুন। তাই জ্ঞান ও পাঠের স্বল্পতার কারণে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুধী পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে বইটির পরবর্তী সংস্করণকে আরও সুন্দর করতে সাহায্য করবেন, এই নিবেদন রইল। অনুবাদকার্যে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই নোমান, ইমরান ও বোন রাহিমার ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। আমার মুহতারাম শিক্ষক ও প্রিয় সহপাঠী-বন্ধুরা আমাকে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। কালান্তর প্রকাশনীর কর্ণধার গুরুতম আবুল কালাম আজাদ ও তাঁর সম্পাদনা পর্ষদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করুন!

**শাকের আনোয়ার**

জুন ১২, ২০২৩

ফেনী।





# সূচিপত্র

## গোলাম আহমাদ পারভেজ # ১০৬



## প্রফেসর ড. তাহির আল কাদরি # ১১৭



## মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান # ১৩৮





# تمہید

کچھ عرصہ پہلے جناب شاکر انور صاحب نے واٹس ایپ پر رابطہ کیا کہ وہ ہماری کتاب "تحریک تجدد اور متجددین" کا بنگالی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال یہ کسی بھی مصنف کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے کہ اس کی تحریر کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا جائے۔ راقم نے ان کو بخوشی اجازت دی اور اب یہ کتاب اپنی طباعت کے مراحل میں ہے کہ مترجم نے مجھ سے اس کی تمہید کے طور کچھ الفاظ لکھنے کو کہا۔

راقم کی اس وقت تک کوئی بیس سے زائد کتب اور دو صد سے زائد تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب راقم کی ابتدائی کتب میں سے ہے۔ اس وقت میں نیا نیا لکھاری تھا۔ اس لیے اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج اس کتاب کے موضوع پر قلم اٹھاتا تو اس سے بھی بہتر مواد سامنے آتا، ان شاء اللہ۔ لیکن بہر حال اللہ عزوجل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے کہ جس پر اس کو ہونا ہے۔

میری سب سے پہلی کتاب "حقوق الزوجین" پر تھی کہ جس کا ہندی ترجمہ شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب میں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کی تھی۔ کتاب کے مضامین اچھے تھے کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے اس کا اردو سے ہندی ترجمہ کروا کے اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر مفت بانٹا اور ہمیں بھی دو نسخے بھیجے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ افغانستان سے کال آئی کہ آپ حافظ زبیر ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے کہ میں نے آپ کی "چہرے کے پردے" پر کتاب کا پشتو ترجمہ کیا ہے جو ہم یہاں سے شائع کر رہے ہیں۔ کتاب پر آپ کا نمبر دیا ہوا تھا۔ بس تصدیق کے لیے فون کیا تھا۔ اور فون بند کر دیا۔

بہر حال یہ اللہ کا فضل ہے اور سب تعریف اسی کی ہے کہ ہماری کتب کے مقامی زبانوں

میں تراجم بھی ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان اور ہندوستان سے کئی ایک ناشر ان کتب کو اردو میں بھی پبلش کر رہے ہیں۔ ہندوستان سے بھی چار پانچ ناشرین نے ہماری کتب کو شائع کرنا شروع کیا ہے۔

میں بنگالی زبان نہیں جانتا ہوں جبکہ ہمارے بنگالی مترجم اردو جانتے ہیں لہٰذا میرے لیے اس ترجمے پر کوئی بات کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بنگالی اور اردو زبان کا رسم الخط مختلف ہے۔ بہر حال مترجم سے اردو زبان میں واٹس ایپ کال پر گفتگو رہی ہے اور ان کی اردو بہتر ہے۔

میں آخر میں اپنے مترجم اور مکتبہ کالانتور پرکاشنی، بنگلہ دیش کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اس کتاب کو اپنے مکتبے سے شائع کر کے ہمارے لیے عزت افزائی کا باعث بن رہے ہیں۔

ڈاکٹر حافظ محمد زبیر

19-09-2023





# লেখকের কথা

## রচনার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

২০০৪ থেকে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি লাহোরের কুরআন অ্যাকাডেমির গবেষণাবিভাগে যুক্ত ছিলাম। বিভিন্ন কোর্স ও প্রোগ্রামে পাঠদান ছাড়াও কমবেশি গবেষণার কাজ তখন আমাকে করতে হয়। মূলত সে সময়কার ২০টি প্রবন্ধের সংকলনই এ বই। *তাহরিকে তাজাদ্দুদ আওর মুতাজাদ্দিদিন* নামে এ প্রবন্ধগুলো লাহোরের *মাসিক মিসাকে* ডিসেম্বর ২০১০ থেকে জুলাই ২০১১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মুলতানের *মাসিক আল-আহরারে*ও ছাপা হয় কয়েকটি লেখা। ব্যাপক প্রচারের জন্য সেগুলোই এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

## গবেষণা-পদ্ধতি

মূলত বইটি আমার অধ্যয়নের সারনির্যাস, যাকে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে। তাই এর রচনাশৈলী গবেষণার ঢঙে রাখা হয়নি, যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের সূত্র বিশদভাবে টীকায় উল্লেখ করা যায়নি; বরং বইয়ের শেষে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুত এটি লেখকের নিজস্ব গবেষণাও নয়। কোথাও অন্য লেখকদের গবেষণা সংক্ষেপে উৎকলিত হয়েছে। আবার কোথাও বিদ্যমান গবেষণায় নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম লক্ষ্য হলো সৃষ্টি। দ্বিতীয় লক্ষ্য, ইতিপূর্বে গবেষণা করা হয়েছে এমন বিষয় সংযোজন। তৃতীয় লক্ষ্য, গবেষণাকৃত উপাত্তকে সংক্ষিপ্ত করা। এ বই গবেষণার অন্তত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য পূরণ করেছে বলেই মনে হয়।

এতে মূলত দুই শ্রেণির লোকদের আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে—প্রথমত, যাঁদের চিন্তাধারা ও মতবাদ এতই দূষিত যে, তাঁদেরকে স্পষ্টত আধুনিকতাবাদী বলে চিহ্নিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, শাখা-প্রশাখাগত কিছু ক্ষেত্রে যাঁদের চিন্তায় আধুনিকতাবাদের প্রভাব দেখা যায়, তবু মোটাদাগে তাঁদেরকে আধুনিকতাবাদী আখ্যা দেওয়া সংগত নয়।

## কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কমস্যাটস বিশ্ববিদ্যালয় (Comsats University) ইসলামাবাদ ক্যাম্পাসের রেক্টর প্রফেসর ড. এসএম জুনায়েদ জায়দি, লাহোর ক্যাম্পাসের ডাইরেক্টর প্রফেসর ড. কায়সার আব্বাস এবং মানবিক বিভাগের প্রধান ড. মুদ্দাসসার মাহমুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া আমার সহধর্মিণীর প্রতিও রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা, যাঁর সহযোগিতা ও চেষ্টায় গ্রন্থটি পূর্ণতা পেল।

ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের





ভূমিকা

# তাজাদ্দুদ, মুতাজাদ্দিদ, তাজদিদ ও মুজাদ্দিদ

'তাজাদ্দুদ' আরবি শব্দ। এর মূল হরফ যথাক্রমে 'জিম', 'দাল' এবং 'দাল'। এই ধাতু থেকে আরবিতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—একটি তাজাদ্দুদ, অপরটি তাজদিদ। 'তাজাদ্দুদ' বাবে তাফাউলের একটি ক্রিয়ামূল, এর কর্তৃপদ হলো 'মুতাজাদ্দিদ'। অন্যদিকে 'তাজদিদ' বাবে তাফয়িলের ক্রিয়ামূল, যার কর্তৃপদ 'মুজাদ্দিদ'। আধুনিক উর্দু সাহিত্যে 'তাজাদ্দুদ' এবং 'তাজদিদ' যথাক্রমে নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি পরিভাষা হিসেবে পরিগণিত।

বাবে তাফয়িল থেকে 'তাজদিদ' ক্রিয়ামূল সকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থ দাঁড়ায় جدد الشيء অর্থাৎ কোনোকিছু নবায়ন করা। কিছু কিছু আলিমের মতে উল্লিখিত ক্রিয়ামূলে 'তা' বর্ণটি 'কামনা' অর্থসূচক। অর্থাৎ কোনোকিছু নবায়ন করতে চাওয়া।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'তাজদিদ'-এর প্রেক্ষিত তখনই তৈরি হয়, যখন কোনোকিছুর নিদর্শন একেবারে হারিয়ে যায়।[১] কেননা, একজন মুজাদ্দিদই দীনের লুপ্তপ্রায় শিক্ষা ও নিদর্শনাবলি পুনরুদ্ধার করে ইসলামের বাস্তব চিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরেন। অতএব তাজদিদ অর্থ কোনোকিছুর সংস্কারসাধন, তাতে সংযোজন বা বিয়োজন নয়।

ড. ইউসুফ আল কারজাবির মতে, তাজদিদ অর্থ কোনোকিছুকে তার প্রকৃত রূপে ফেরানো। যেমন, রাসুল ﷺ ও খুলাফায়ে রশিদিনের যুগে ইসলাম আসল রূপে বিদ্যমান ছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে মানুষের আকিদা-বিশ্বাসে অসংখ্য বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। খারিজি, মুতাজিলা, জাহমিয়া, শিয়া, কালামি প্রভৃতি সম্প্রদায় শত শত বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা ইসলামের নামে প্রচার করতে শুরু করে। তখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামরা এসব বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা যথোচিতভাবে খণ্ডন করে দীনের প্রকৃত স্বরূপ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। এর নামই 'তাজদিদ'। আর এই বিরাট কাজ যিনি সম্পাদন করেন, তাঁকে বলা হয় 'মুজাদ্দিদ'।

---

[১] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ৮/১৮।

আরবি ভাষায় تجديد العهد (তাজদিদুল আহদ) পরিভাষাটি বেশ প্রসিদ্ধ। এর অর্থ হলো, নতুন কোনো শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন না করে আগের শাসনব্যবস্থাকেই ঢেলে সাজানো এবং শক্তিশালী করা। এভাবেই ইসলামের তাজদিদ অর্থ নতুন কোনো ইসলাম নয়, বরং ইসলামের ব্যাপারে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর কৃত অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যা নিরসন করে ইসলামকে নতুন করে ঢেলে সাজানো।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক শতবর্ষ পরে উম্মতের জন্য এমন একেকজন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যারা তাদের দীনের তাজদিদ করবে।[২]

অপরদিকে 'তাজাদ্দুদ' ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয় অকর্মকরূপে। যেমন تجدد الشيء অর্থাৎ কোনোকিছু নতুন হওয়া। আরবিতে تجدد الضرع অর্থ হচ্ছে, কোনো জন্তুর দুধ শুকিয়ে যাওয়া। জন্তুর আগের দুধ শুকিয়ে নতুন দুধ এলে তবেই এ বাগ্‌ধারাটি বলা হয়। সুতরাং 'তাজাদ্দুদ' অর্থ দাঁড়ায় পুরানো কিছু চলে যাওয়ার পর সেখানে নতুন কিছু আসা। একবার দুধ দোহনের পর জন্তুর স্তনে যে দুধ আসে, সেটা নতুন এবং তা আগের দুধ নয়। কাজেই ইসলামের 'তাজাদ্দুদ' অর্থ দাঁড়ায়, আগে থেকে চলে আসা ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে সেখানে নতুন ইসলাম চালু হওয়া। একে বাংলায় পুনর্গঠন বা পুনর্নির্মাণ এবং ইংরেজিতে Reconstruction বলা হয়। অর্থাৎ ইসলামের ভিত্তি নির্মূল হয়ে গেছে, এবার এর পুনর্নির্মাণ চাই।

সাইয়িদ সুলায়মান নদবি ড. ইকবালের 'তাশকিলে জাদিদ' বা ইসলামের পুনর্গঠন-তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে লেখেন, 'মরহুম ইকবাল তাঁর বক্তব্য-সংকলনের নাম রেখেছেন *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, এ ব্যাপারে আমার আপত্তি ছিল। পুনর্নির্মাণ বা পুনর্গঠন অর্থ কী? এ কি নির্মূল হয়ে গেছে? ইসলামের প্রকৃত রূপ কি হারিয়ে গেছে, যাকে এখন পুনর্গঠন করতে হবে? এমন দাবি ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাসকে অস্বীকার ছাড়া আর কী![৩]

সারকথা, তাজদিদ একটি ইতিবাচক পরিভাষা, যা দীনের ক্ষেত্রে কাম্য। অন্যদিকে তাজাদ্দুদ নেতিবাচক, যা দীনের ক্ষেত্রে নিন্দনীয়।



[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৯১।

[৩] *সে মাহি ইজতিহাদ*, জুন ২০০৭ : ৫৪।



# প্রথম আধুনিকতাবাদ আন্দোলন

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে এমন কিছু ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা ইসলামের চিরাচরিত পথ ছেড়ে ভিন্ন এক পথে চলতে শুরু করেন। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাচেতনা ও আকিদা-বিশ্বাস যদিও মা'বাদ জুহানি, গায়লান দিমাশকি, জাহম ইবনু সাফওয়ান ও জাদ ইবনু দিরহাম প্রমুখের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু সাংগঠনিকরূপে এ সম্প্রদায়টির আত্মপ্রকাশ ঘটে ওয়াসিল ইবনু আতার (৮০-১৩১ হি.) হাত ধরেই। ওয়াসিল ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ি হাসান বসরির অন্যতম শিষ্য। একবার হাসান বসরির সঙ্গে এক মাসআলায় ভিন্নমত করেন ওয়াসিল। কবিরা গুনাহকারী প্রকৃত মুমিন কি না, এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় দুজনের মধ্যে। হাসান বসরির বক্তব্য ছিল এমন, কবিরা গুনাহের ফলে কারও ইমান যদিও সাময়িক হ্রাস পায়, তবু তা একেবারে নাই হয়ে যায় না। সাহাবি-তাবিয়িদের মতও এটাই। অপরদিকে ওয়াসিলের মতে, কোনো মুসলিম কবিরা গুনাহ করলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর, কবিরা গুনাহের কারণে যার ইমান চলে যায়, তাকে কাফির বলা হবে কি না? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সে কাফির নয়। কাফির ও মুমিনের কোনোটাই যদি না হয় তবে কী, এটা জিজ্ঞেস করা হলে ওয়াসিল বলেন, তার অবস্থান কুফর ও ইমানের মাঝামাঝিতে। এ স্তরকে তিনি মানজিলা বাইনাল মানজিলাতাইন আখ্যা দেন। সহজ কথায়, ইমান ও কুফরের মধ্যে ওয়াসিল নতুন আরেকটি পরিভাষা তৈরি করেন—যা বলে যে, ব্যক্তির এমন অবস্থাও হতে পারে যখন তার অন্তরে ইমান যেমন থাকে না, তেমনি কুফরও না।

যুগপৎ মুমিন না থাকার এবং কাফির না হওয়ার ধারণাটি তবু কিছুটা বোধগম্য হলেও হতে পারে, কিন্তু এটি আরেকটি প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে, তা হলো—গুনাহগার অবস্থায় অথবা তাওবার আগে যদি এই লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহলে আখিরাতে তার পরিণতি কী হবে? ওয়াসিল উত্তরে বলেন, এমন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামি। এভাবে একসময় বিতর্কটি যখন প্রকট আকার ধারণ করে, ওয়াসিল তার অনুসারীদের নিয়ে হাসান বসরির মজলিস থেকে বেরিয়ে যান এবং আরেকটি ইলমি মজলিস বা হালাকা কায়েম করেন।

এরপর তাঁর ব্যাপারে হাসান বসরি বলেন, اعتزل عنا واصل। অর্থাৎ ওয়াসিল আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! এই ঘটনার পর থেকেই তাঁকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফিরকায়ে মুতাজিলা বা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় বলা হয়।[৪]

## এক. মুতাজিলা সম্প্রদায়ের পাঁচ মূলনীতি

ক্রমশ মুতাজিলাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সময়ে সময়ে তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রত্যেক দল নিজেদের বিচ্যুত ও ভ্রান্ত মতবাদসমূহের তালিকা প্রণয়ন করে সেগুলোকে যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে সঠিক বলে সাব্যস্ত করতে থাকে। তবে এসব অভ্যন্তরীণ বিভক্তি সত্ত্বেও পাঁচটি মূলনীতিতে তাদের সকল উপদলের ঠিকই ঐকমত্য ছিল। এ মূলনীতিগুলোই পরবর্তী সময়ে তাদের স্বকীয় পরিচিতিরূপে গণ্য হয়। মূলনীতিগুলো ছিল :

### ১. তাওহিদ

মুতাজিলাদের প্রধান পাঁচ মূলনীতির প্রথমটি হলো তাওহিদ। এই নীতির ভিত্তিতে তারা আল্লাহ তাআলার সিফাত বা গুণাবলি অস্বীকার করে। তাদের ভাষ্য, 'যদি আমরা ধরেও নিই আল্লাহ যেমন শুনতে পান তেমনি মানুষও শোনে, আল্লাহ যেমন দেখতে পান তেমনি মানুষও দেখে, তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করতে হয় যে, আল্লাহর গুণাবলি মানুষের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে, ফলে আল্লাহর সিফাতে শিরক হয়ে যাচ্ছে।'

তারা আরও বলে, 'মানুষের ব্যাপারে তো আমরা জানিই যে, তারা কথা বলে, শোনে এবং দেখে—এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই; তবে আল্লাহর ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কোনো সিফাতের আলোচনা এলে তা এমনভাবে তাবিল বা ব্যাখ্যা করতে হবে, যেন সেগুলো অস্বীকার করতে হয়, যেন মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয়।' এভাবে এরা আল্লাহ তাআলার শ্রবণ, দর্শন, কালাম, ইরাদা, হায়াত, কুদরতসহ সকল প্রকার সিফাত অস্বীকার করে।

---

[৪] *আল-মাউসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাজাহিব* : ১/৬৪। ইমাম জাহাবি বলেন, 'ফাসিক মুমিনও নয়, কাফিরও নয়'—ওয়াসিলের এমন কথা শুনে হাসান বসরি তাকে নিজের হালাকা থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেক দল গঠন করেন। তখন থেকেই তাদের মুতাজিলা বলা হয়। (*সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/৪৬৪)। (ওয়াসিল হাসান বসরির দারসে হাজির হতেন। একবার খারিজিরা কবিরা গুনাহকারীকে কাফির আখ্যা দেয়। আরেক দল বলে, কবিরা গুনাহকারী মুমিনই; কাফির নয়। ওয়াসিল এই দুটো মত থেকে সরে এসে বলেন, ফাসিক মুমিন তো নয়ই, কাফিরও নয়। পরে তিনি হাসান বসরির মজলিস ত্যাগ করেন। এরপর থেকেই তাকে ও তার সম্প্রদায়কে মুতাজিলা বলা হয়।—*আল-আলাম* : ৮/১০৭।—অনুবাদক।)

অপরদিকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে, 'যদি আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করা হয়, তাহলে এক অন্ধ ও বধির এবং নির্বাক সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন অবধারিত হয়। এমনটা হলে কাফির, মুশরিক, হিন্দু ও বস্তুপূজারিদের উপাস্য, অবতার এবং অন্ধ ও বধির প্রভুর সঙ্গে মুসলিমদের প্রভুর কী পার্থক্য থাকে?'

তাঁরা আরও বলেন, 'আমরা আল্লাহর সকল সিফাত বিশ্বাস করি; কিন্তু কোনো সিফাতের অবস্থা বর্ণনা করি না অথবা এগুলোকে মানুষের সিফাতের মতো বলেও মনে করি না। সেই সঙ্গে কোনো সিফাতের বিকৃতি যেমন ঘটাই না, তেমনি যুক্তি-প্রমাণের আশ্রয়ও নিই না। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহে যেসব সিফাত আলোচিত হয়েছে, আমরা প্রত্যেকটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং এ ব্যাপারে গভীর গবেষণার প্রয়োজনবোধ করি না। কুরআনে বলা হয়েছে 'আল্লাহ তাআলা কথা বলেন', তাই আমরা আল্লাহর কালামের সিফাতের প্রতি ইমান রাখি। তবে এর প্রকৃত অবস্থা বা গূঢ় রহস্য কী, তা আমাদের গবেষণার বিষয় নয়।'

কিন্তু মুতাজিলারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলে। তারা বলে, 'যদি আমরা ধরেও নিই আল্লাহ তাআলা কথা বলেন, তাহলে এ থেকে অবশ্যই তাঁর মুখ ও ভাষা থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কারণ এ ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয়। আবার যদি আমরা আল্লাহর মুখ ও ভাষা থাকা মেনে নিই, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর শরীর থাকবে...।'

এভাবে এরা আল্লাহর সিফাত নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে একসময় পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে বসে। কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে, 'আল্লাহর সিফাতসমূহ যেহেতু কুরআন-হাদিসে রয়েছে, তাই এসবের স্বীকৃতিদান ও বিশ্বাস আবশ্যক। তবে এসবের কাইফিয়াত বা প্রকৃত অবস্থা আমাদের অজানা। তাই এ সংক্রান্ত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অনুচিত। যে সিফাতের কাইফিয়াত অনুসন্ধান করে, সে বিদআতি।'

ইমাম মালিককে আল্লাহ তাআলার আরশে 'ইসতিওয়া' হওয়ার অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

الاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ.

আল্লাহ তাআলার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া জ্ঞাত হলেও তাঁর প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাত। এর প্রতি ইমান রাখা আবশ্যক এবং প্রশ্ন তোলা বিদআত।[৫]

মোটকথা, কুরআন-হাদিসে যতটুকু যেভাবে বলা হয়েছে, তা নিয়েই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত সন্তুষ্ট। কেউ যদি এসব সিফাত নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাহলে সে

[৫] *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, বায়হাকি : ২/৩০৫।

আহলুস সুন্নাতের সীমা থেকে বেরিয়ে যায় এবং বিদআতি আখ্যায়িত হয়। কেননা প্রশ্নই সব বিতর্কের মূল।

ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন :

> وله يدٌ ووجهٌ ونفسٌ كما ذكرَهُ اللهُ تعالى فى القرآنِ، منْ ذكرِ اليدِ والوجهِ والنفسِ فهو لهُ صفةٌ بلا كيفٍ، ولا يقالُ : إنّ يدَهُ قدرتُهُ أو نعمتُهُ، لأنّ فيهِ إبطالُ الصفةِ، وهوَ قولُ أهلِ القَدَرِ والإعتزالِ.
>
> আল্লাহ তাআলার হাত, চেহারা এবং অন্তঃকরণ রয়েছে, যেমন তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর হাত, মুখ এবং অন্তঃকরণ রয়েছে। এগুলো তাঁর সিফাত, ধরণহীনভাবে। কাজেই আমরা এগুলোর স্বরূপ বলি না। এমন বলাও সংগত মনে করি না যে, হাত দ্বারা কুদরত অথবা নিয়ামত উদ্দেশ্য। কারণ, এভাবে বললে আল্লাহ তাআলার সিফাতকে অস্বীকার করা হয়। যেমনটা কাদরিয়া ও মুতাজিলারা করে থাকে।[৬]

## ২. আদল

দ্বিতীয় প্রধান মূলনীতি হলো 'আদল' বা ন্যায়পরায়ণতা। এই মূলনীতির ভিত্তিতে তারা বলে, 'মানুষ নিজেদের কাজকর্মের শুধু সম্পাদনকারীই নয়, বরং স্রষ্টাও।' কিন্তু আহলুস সুন্নাতের মতে, 'মানুষ তার কর্মের সম্পাদনকারী এ কথা ঠিক, তবে এর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ।'

আহলুস সুন্নাতের আকিদা অনুসারে ভালো-মন্দ উভয়ের স্রষ্টাই আল্লাহ; কিন্তু মুতাজিলারা বলে, 'আমরা যদি ধরে নিই মন্দের স্রষ্টাও আল্লাহ, তাহলে মন্দের সম্পৃক্ততা আল্লাহর দিকে করা হচ্ছে, যা বিবেকের বিচারে সঠিক নয়।' আহলুস সুন্নাত এর উত্তরে বলে, 'কোনো কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে তার সম্পর্ক কর্তার দিকেই হয়। যেহেতু মন্দের সম্পাদনকারী মানুষ, তাই এর সম্পর্ক মানুষের দিকেই হবে—যদিও এরও স্রষ্টা আল্লাহ। যেমন ইবলিস যদিও অসৎ, কিন্তু তার মন্দের স্রষ্টাও আল্লাহ।'

আল্লাহ তাআলার ইরাদা বা ইচ্ছাকে আহলুস সুন্নাত দু ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত শরিয়া-সংশ্লিষ্ট, এবং দ্বিতীয়ত সৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট। শরিয়া-সংশ্লিষ্ট ইচ্ছাই মূলত আল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য, আর সৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট ইচ্ছার সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গো।

মোটকথা, এই সৃষ্টিজগতের সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। এটাই আহলুস সুন্নাতের আকিদা।

---

[৬] *শারহুল ফিকহিল আকবার*, মোল্লা আলি কারি : ৬৬-৬৭; দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

অপরদিকে মুতাজিলাদের আকিদামতে, আল্লাহ তাঁর নিজ কর্মের স্রষ্টা হলেও মানুষের কর্মের স্রষ্টা তিনি নন, বরং মানুষই।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে, 'মানুষ যখন কোনো কর্মের কর্তা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেন। যখন মানুষ মন্দ কাজ করে, তখন এর কর্তা মানুষই। তবে আল্লাহ তাআলা এই মন্দকে অস্তিত্ব দান করেন। তাই আল্লাহ এর স্রষ্টা। যদি মানুষ কর্তা হয় আর আল্লাহ স্রষ্টা না হন, তাহলে এমন কর্ম পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ইবরাহিম আ. তাঁর ছেলে ইসমাইলকে ছুরি দিয়ে জবাই করে সেই কর্মের কর্তা হয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ এই কর্ম সৃষ্টি না করায় 'ইসমাইলকে জবাই করা' কর্মটি অস্তিত্ব লাভ করে নি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরি করো তা-ও। [সুরা সাফফাত : ৯৬]

## ৩. আল-ওয়া'দ ওয়াল ওয়ায়িদ

আল-ওয়াদ ওয়াল ওয়ায়িদ মুতাজিলাদের তৃতীয় মূলনীতি। এর ভিত্তিতে তারা বলে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনুগতদেরকে প্রতিদান দেওয়া এবং অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ তাআলার জন্য ওয়াজিব। তাই তাদের মতে, কোনো কবিরা গুনাহকারীকে ক্ষমা করা আল্লাহর জন্য বৈধ নয়। কারণ তা আল্লাহর ন্যায়বিচার-বিরুদ্ধ।

অপরদিকে আহলুস সুন্নাতের মতে, কোনো গুনাহকারীকে শাস্তিদান অথবা ক্ষমা করা উভয়টা আল্লাহর ইচ্ছাভুক্ত—চাই সে তাওবা করুক অথবা না করুক। কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করার গুনাহ কখনো ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য সব যার জন্য ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, সে অবশ্যই মহা অপবাদ আরোপ করল। [সুরা নিসা : ৪৮]

## ৪. মানজিল বাইনাল মানজিলাতাইন (দুই শ্রেণির মধ্যবর্তী শ্রেণি)

মানজিল বাইনাল মানজিলাতাইন বলতে ইমান ও কুফরের মাঝামাঝি একটি অবস্থা

বোঝানো হয়। এটা মুতাজিলাদের তৃতীয় মূলনীতি। এর ভিত্তিতে তারা বলে, কবিরা গুনাহের কারণে যদিও কেউ মুমিন থাকে না এবং কাফিরও হয় না, তবু আখিরাতে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি।

এই মাসআলায় খারিজিদের সঙ্গে এদের ভিন্নতা হলো, খারিজিরা এমন ব্যক্তিকে দুনিয়াতেও কাফির এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামি জ্ঞান করে। এর বিপরীতে মুতাজিলারা তাকে দুনিয়াতে কাফির মনে না করলেও আখিরাতে কাফির বলে সাব্যস্ত করে।

### ৫. আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার তথা কল্যাণের আদেশ ও অকল্যাণের নিষেধ মুতাজিলাদের পঞ্চম মূলনীতি। এই নীতির ভিত্তিতে তারা ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত লোকদেরকে সৎপথে চলতে আদেশ করা ও অকল্যাণে নিষেধ করাকে ওয়াজিব আখ্যা দেয়। যদিও আহলুস সুন্নাতের মতেও কল্যাণের আদেশ ও অকল্যাণের নিষেধ ফরজ—কিন্তু মুতাজিলারা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয়। তারা জালিম, ফাসিক এবং সত্যত্যাগী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব বলে মনে করে। এমনকি যে শাসক তাদের দীনবিরুদ্ধ চিন্তাচেতনার প্রবক্তা নয়, সেও এই সত্যবিচ্যুত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

জালিম ও ফাসিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষয়ে ফিকহের কিতাবাদিতে আহলুস সুন্নাতের অবস্থানের বিশদ আলোচনা রয়েছে।[৭] এ ছাড়াও এ ব্যাপারে লেখকের *আধুনিক যুগে তাকফির, খুরুজ, জিহাদ ও শরিয়া প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি* গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

## দুই. সাম্প্রতিককালে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষার্ধে যখন ইসলাম রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর বিশাল একটা অংশ পাশ্চাত্যের উপনিবেশে পরিণত হয়, তখন থেকেই এই আধুনিকতাবাদের সূচনা। এ সময় পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-দর্শনের অন্যান্য নানা মতবাদ অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহে জীবাণুর মতো ছড়িয়ে পড়ে। ফলে উম্মাহর মেধাবী ও বিদ্বান একটা শ্রেণি এই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের আধুনিক সব ব্যাখ্যা ও বয়ান পেশ করতে থাকেন। দুঃখজনকভাবে এঁদের হাতেই দীনের আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি

[৭] *আল-মাওসুআতুল মুয়াসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাজাহিব* : ৬৭-৬৮।

অত্যন্ত বাজেভাবে অপব্যাখ্যার শিকার হয়। ইসলামের এমন এক নতুন সংস্করণ এঁরা তৈরি করেন, যা পাশ্চাত্যের বিদ্বানমহলের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলেও তাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত ইসলাম খুঁজে পাওয়া কঠিন।

মুসলিমদের দাসত্বের এই সময়ে ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের থেকে মুক্তির জন্য একদিকে তখন মুসলিমরা রাজনৈতিক, সামরিক ও বৈপ্লবিক বিভিন্ন দল-উপদলে সংগঠিত হতে শুরু করেন, অপরদিকে ইউরোপীয় নব্য জাহিলিয়াতের দ্বারা প্রভাবিত আধুনিকতাবাদীদের বিকৃত চিন্তাধারাসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও খণ্ডন এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ও বাস্তব চিত্র উপস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। দয়াময় আল্লাহ তখন একদল আলিমকে বিশুদ্ধ হিদায়াতের পথে আহবানকারীরূপে নির্বাচিত করেন। নিচে আমরা গত দেড় শতাব্দীকালের আধুনিকতাবাদ আন্দোলনের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর আরোপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত একটা পর্যালোচনা উপস্থাপন করব এবং সেই সঙ্গে আধুনিকতাবাদীরা উম্মাহর সর্বসম্মত ও ঐকমত্যপূর্ণ যেসব আকিদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, সেগুলোও স্পষ্ট করব। বর্তমানে মিসর, তুরস্ক এবং পাক-ভারত উপমহাদেশই যেহেতু উম্মাহর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছে, তাই আমাদের আলোচনা এই দেশগুলোরই আধুনিকতাবাদীগণ এবং তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে পাঠককে মনে রাখতে হবে, এই গ্রন্থে যাঁদের আলোচনা এসেছে, তাঁদের সকলকেই ঢালাওভাবে আধুনিকতাবাদী বলা ঠিক হবে না। যদিও এটা ঠিক যে, আধুনিকতাবাদের প্রভাব এঁদের সবার ওপরই কমবেশি ছিল। বস্তুত আধুনিকতাবাদী তাঁদেরকেই বলা যাবে, যাঁদের চিন্তাচেতনা অধিক মাত্রায় দূষিত। কিন্তু যাঁরা পশ্চিমা চিন্তাভাবনায় পুরোপুরি প্রভাবিত ছিলেন না, বরং হাতে গোনা শাখাগত কিছু ক্ষেত্রে আধুনিকতাবাদের প্রভাব দেখা যায়—তাঁদেরকে এই অভিধায় অভিহিত করা সংগত নয়।



প্রথম অধ্যায়

# মিসরে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন

- সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি
- মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু
- সাইয়িদ মুহাম্মাদ রশিদ রিজা
- ড. তাহা হুসাইন
- তাওফিক আল হাকিম
- ড. ইউসুফ কারজাবি
- ড. ওয়াহবা আল জুহায়লি



# সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি

## এক. জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

সাইয়িদ জামালুদ্দিন ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামালুদ্দিন আফগানি অথবা জামালুদ্দিন আসাদাবাদি নামেই বেশি পরিচিত। আফগানি ছাড়াও নামের নিসবত বা স্থান-বংশ-সম্বন্ধ হিসেবে তিনি ইসতাম্বুলি, আসাদাবাদি, হুসাইনি, আফগানি, তুসি এবং রুমি পদবি ব্যবহার করতেন। অনেকের মতে, তিনি যে দেশে অথবা শহরে সফর করতেন, নামের সঙ্গো সেই স্থানবাচক পদবি যুক্ত করে নিতেন। এ কারণেই তাঁর এত নিসবত বর্ণিত হয়েছে।

কিছু কিছু জীবনীকারের মতে আফগানির এ অভ্যাসও ছিল যে, তিনি যেখানেই যেতেন সেখানকার আলিমদের রূপ ও বেশভূষা গ্রহণ করতেন। ইরানে অবস্থানকালে তিনি শিয়া আলিমদের মতো কালো পাগড়ি বাঁধতেন। তুরস্ক ও মিসরে সাদা পাগড়ি পরিধান করতেন। ইউরোপে কখনো শুধু টুপি আর হিজাজে আরবদের ইকাল বাঁধতেন।

সাইয়িদ জামালুদ্দিনের জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। কারও কারও মতে তিনি ইরানের হামাদান অঞ্চলের নিকটবর্তী আসাদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কিছু ইতিহাসবিদের মতে তাঁর জন্ম আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের আসাদাবাদ অঞ্চলে। তবে প্রবল ধারণামতে তাঁর জন্মস্থান ইরানে। একজন শিয়া মুসলিম হিসেবে সেখানেই তিনি শৈশব কাটিয়েছেন। পিতা সাইয়িদ সাফদার হুসাইন ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর বংশপরম্পরা উমর ইবনু আলি ইবনু জায়নুল আবিদিন ইবনু হুসাইন ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব পর্যন্ত পৌঁছায়। কিছু জীবনীকারের মতে তিনি ইরানের শাসক নাসিরুদ্দিন শাহের ভর্ৎসনা ও প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতেই নিজেকে আফগানি ও সুন্নি মুসলিম হিসেবে পরিচিত করান। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ প্রায় ৬০ বছর বয়সে আফগানি ইনতিকাল করেন।[৮]

---

[৮] পুরো জীবনের মতো আফগানির মৃত্যুর কারণ নিয়েও বেশ বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, চোয়াল বা দাঁতের মাড়িতে ক্যান্সারের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার অনেকের মতে তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। ইসতাম্বুলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়। আফগানির ভগ্নিপতি মির্জা

## দুই. আফগানির মতাদর্শ

জামালুদ্দিন আফগানির প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা ইরানের কাজবিন শহরে। এরপর উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তেহরান ও ইরাক সফর করেন। তাঁর শিক্ষকদের অধিকাংশই শিয়া আলিম। যেমন : আগা খান সাদিক, শায়খ মুরতাজা আনসারি, কাজি বাশার, হাফিজ দারাজ, হাবিবুল্লাহ কান্দাহারি প্রমুখ।

ড. আবদুন নাইম মুহাম্মাদ হাসানাইন তাঁর *হাকিকাতু জামালিদ দীন আল-আফগানি* গ্রন্থের ভূমিকায় আফগানিকে কট্টর ইসনা আশারিয়া শিয়া[১] আখ্যায়িত করে এ ব্যাপারে কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করেন। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম তাঁর *আল-কাওমিয়া আল-আরাবিয়া* বা আরব জাতীয়তাবাদ গ্রন্থে আফগানিকে ইসনা আশারিয়া শিয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ হুসাইনও তাঁর শিয়া হওয়ার কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। এ ছাড়া ড. সাফার হাওয়ালিও তাঁকে শিয়া বলেছেন।

তবে ড. মুহাম্মাদ ইমারাহ *জামালুদ্দিন আল-আফগানি মুকিজুশ শারক ওয়া ফাইলাসুফুল ইসলাম* গ্রন্থে তাঁর শিয়া হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। ইতালির সাবেক ইরানি রাষ্ট্রদূত সাইয়িদ হাদি খসরুশাহি তাঁর *আল-আসার আল-কামিলাহ লিল-আফগানি*তেও আফগানির শিয়া হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। শায়খ রশিদ রিজা তাঁর *তারিখুল উসতাজিল ইমাম* গ্রন্থে লেখেন, 'শিয়াদের ব্যাপারে তাঁর উসতাজ মুফতি আবদুহুর বক্তব্য ইমাম ইবনু তাইমিয়ার চেয়েও কঠোর ছিল; আর আবদুহু তাঁর উসতাজ আফগানির সঙ্গে নেহাত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আফগানি শিয়া ছিলেন না।'

জামালুদ্দিন আফগানি তাঁর *খাতিরাত* গ্রন্থে নিজেকে হানাফি ও সুন্নি মতাদর্শের অনুসারী

---

লুতফুল্লাহ খানের দাবি অনুযায়ী তিনি বিষপ্রয়োগের ফলেই মারা যান। লুতফুল্লাহ ইরান সরকারকে আফগানি-হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে বলেন, তুরস্ক থেকে আফগানিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলে ইরান সরকার নাসিরুল মুলুককে তাঁকে হত্যার জন্য অথবা ইরানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠায়। *হাকিকাতু জামালিদ-দীন আল-আফগানি*, আবদুন নায়িম হাসানাইন : ৯৫।

অপরদিকে খিলাফত থেকে প্রচার করা হয়, আফগানির মৃত্যু তাঁর দাঁতের মাড়িতে হওয়া ক্যান্সারের ফলেই হয়েছে। *জামালুদ-দীন আল-আফগানি, মুকিজুশ শারক ওয়া ফাইলাসুফুল ইসলাম* : ৮৬। —*অনুবাদক*।

১ ইসনা আশারিয়া অথবা ইমামিয়ারা হলো শিয়াদের সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়। এরা মনে করে, রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর চেয়েও আলি রা. খিলাফতের বেশি হকদার ছিলেন। এদের প্রধান আকিদা হলো ১২ ইমামের ওপর ইমান রাখা। তারা মনে করে, এ সকল ইমাম নবি-রাসুলদের মতো নিষ্পাপ। দুনিয়া-আখিরাতের অধিকর্তা। মানুষকে শাস্তি প্রদান অথবা ক্ষমা করার ক্ষমতা যেমন তাঁদের রয়েছে, তেমনি হালাল বিধানকে হারাম অথবা হারাম বিধানকে হালাল করার ক্ষমতাও তাঁরা রাখেন। এই ১২ ইমামের কোনো ইমামের প্রতি ইমান না রাখলে শিয়ারা তাকে কাফির মনে করে। এ ব্যাপারে বিশদভাবে জানতে আশরাফ জায়জাবি প্রণীত *আকায়িদুশ শিয়াতিল ইমামিয়া* দেখা যেতে পারে। —*অনুবাদক*।

বলে উল্লেখ করেছেন। ড. মুহসিন আবদুল হামিদ তাঁর *জামালুদ্দিন আল-আফগানি আল-মুসলিহ আল-মুফতারা আলাইহি* গ্রন্থে আফগানিকে হানাফি ও সুন্নি মাজহাবের অনুসারী বলে মত দিয়েছেন।

## তিন. রাজনৈতিক জীবন

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জামালুদ্দিন আফগানি দিল্লিতে ছিলেন। এ বছরই হজ পালনের পর তিনি আফগানিস্তানে চলে যান। সেখানে তিনি আফগান শাসক দোস্ত মুহাম্মাদ খানের বিশেষ উপদেষ্টা মনোনীত হন। মুহাম্মাদ খানের পরে তিনি মুহাম্মাদ আজমেরও বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে ব্রিটেনের পরিবর্তে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন আফগানি। ফলে ব্রিটেন সরকার তাঁকে রাশিয়ার গুপ্তচর আখ্যা দেয়।

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শের আলি খানের হাতে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ চলে গেলে জামালুদ্দিনকে বাধ্য হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে হয়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরে চলে যান এবং জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কারের ডাক দেন। এ সময় যুবকদের এক বিরাট দলকে তিনি নিজের চিন্তাধারা ও মতবাদে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন, যাঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ আবদুহু অন্যতম। তবে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কঠোরতাবাদী আখ্যা দিয়ে তাঁকে মিসরে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এরপর তিনি ইসতাম্বুল, লন্ডন, প্যারিস, মস্কো, সেইন্ট পিটার্সবার্গ ও মিউনিখ সফর করেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে *আল-উরওয়াতুল উসকা* নামে একটি আরবি সাময়িকী চালু করেন।

জামালুদ্দিন আফগানির সব বক্তব্য ও রচনা অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয়, তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম মূলত চারটি ক্ষেত্রেই চক্রাকারে ঘুরত এবং এগুলোই তাঁর দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল :

১. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও প্রভাবের সমালোচনা।

২. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির আন্দোলন।

৩. মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি।

৪. ইসলামকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করবে, এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

তাঁর এমন কোনো চিন্তাধারা পাওয়া যায় না, যা থেকে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা সংসদীয় রীতি প্রতিষ্ঠার দাবি করেছেন বলে অনুমিত হয়। বরং যে-সকল মুসলিম শাসককে তিনি পাশ্চাত্যের স্থানীয় প্রতিনিধি মনে করতেন, তাঁদের

সমালোচনাই করতেন। পাশ্চাত্যের স্থানীয় প্রতিনিধিরূপ শাসকদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি সেখানে জাতির সেবক ও দেশপ্রেমিক মুসলিম শাসকদেরকে অধিষ্ঠিত করতে চাইতেন।

## চার. চিন্তাধারা ও মতবাদ

ড. আহমাদ আমিন মিসরি তাঁর *জুআমাউল ইসলাহ ফিল আসরিল হাদিস* গ্রন্থে লেখেন, নবুওয়াতকে 'অর্জিত পদ' আখ্যা দেওয়ার কারণে আফগানির প্রতি ইলহাদ বা ধর্মত্যাগের ফাতওয়া জারি করা হয়। তুরস্কের শায়খুল ইসলাম হাসান আফেন্দি এই চিন্তাধারার কারণে তাঁর বিস্তর সমালোচনা করেন এবং মসজিদের ইমাম ও খতিবদেরকে এ সম্পর্কে আলোচনা করার নির্দেশ দেন, যার ফলে আফগানি তুরস্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি তুরস্ক ছেড়ে মিসরে চলে যান। মিসরেও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ উলায়শ[১০] এমন চিন্তাধারার কারণে তাঁকে ধর্মত্যাগী বলে ফাতওয়া জারি করেন।[১১]

সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানির এক খ্রিষ্টান শিষ্য সালিম আনহুরি[১২] তাঁর *সিহরু হারুত* গ্রন্থের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বিশ্ব অবিনশ্বর হওয়ার এবং স্রষ্টার অস্তিত্বগ্রহণ ইত্যাদির মতো ধর্মবিরোধী দার্শনিক বক্তব্যের প্রবক্তা ছিলেন আফগানি। মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহুর শিষ্য শায়খ রশিদ রিজার বক্তব্য অনুসারে—যেমনটা তিনি তাঁর *তারিখুল উসতাজিল ইমাম* গ্রন্থে লিখেছেন—জামালুদ্দিন আফগানি ওয়াহদাতুল উজুদ মতাদর্শের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য আধ্যাত্মিক সুফি মতাদর্শসমূহের সঙ্গে মিলে যায়।

সালিম আনহুরি আরও বলেন, ভারতে অবস্থানকালে তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে জ্ঞানার্জন করেন এবং সংস্কৃত ভাষা শেখেন। সম্ভবত এই পণ্ডিতদের প্রভাবে তিনি বিশ্ব অবিনশ্বর হওয়ার মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

---

[১০] সাবেক শায়খুল আজহার। তাঁর ফাতওয়া সংকলন *ফাতহুল আলি আল-মালিকির* তাহকিকে আলি ইবনু নায়িফ বলেন, 'নামটি উলায়শই প্রসিদ্ধ, তিনি তার *মাওসিলুত তুল্লাব* -এ যদিও ইলিশ লিখেছেন'।—*অনুবাদক।*

[১১] জুআমাউল ইসলাহ ফিল আসরিল হাদিস, ড. আহমাদ আমিন: ১১০।

[১২] তাঁর পুরো নাম সালিম বেগ সুহুরি আনহুরি। তবে সালিম আনহুরি না আনজুরি, এ নিয়ে খটকা থেকেই যায়। মূল বইয়ে ড. জুবায়ের যদিও 'আনজুরিই' দিয়েছেন, কিন্তু উইকিপিডিয়া বলছে সালিম আনহুরি। আমাদের অনুসন্ধানমতে, তাঁর জন্ম দামেশকের 'আইনে হুর' অঞ্চলে হওয়ায় সেদিকে সম্বন্ধ করেই 'আনহুরি' বলা হয়। আর 'আনজুরি' মূলত অশুদ্ধ প্রচার। অধিকন্তু, আল-মাকতাবাতুল হাফনিয়া দামেশক থেকে প্রকাশিত তাঁর *দিওয়ানু সিহরি হারুত* -এর প্রচ্ছদেও সালিম আনহুরিই লেখা আছে। এ ছাড়া রশিদ রিজাও তাঁর *তারিখুল উসতাজিল ইমাম* আবদুহুতেও সালিম আনহুরিই লিখেছেন। —*অনুবাদক।*

আরেক শিষ্য আদিব ইসহাক বলেন, 'প্রথম জীবনে তিনি তাসাওউফ ও সুফিবাদের প্রতি অনুরাগী থাকলেও শেষ বয়সে দর্শন ও যুক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।'

আফগানি মনে করতেন, ইসলামের সব আকিদা ও মতাদর্শ সুস্থ-স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বস্তুবাদ খণ্ডনে *আর-রাদ্দ আলাদ দাহরিয়্যিন* (Refutation of the Materialists) নামে ফারসি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমদিকে তিনি বিবর্তনবাদ এবং ডারউইনীয় মতবাদের ঘোর বিরোধী থাকলেও পরে প্রাণীর ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ ঠিকই স্বীকার করতেন। তবে আত্মার অধিকারী হওয়ার মানুষের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করতেন না।

জামালুদ্দিন আফগানি ঐশী ধর্মসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং গবেষণা ও অধ্যয়নের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। এ কারণে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শিষ্যদের মধ্যে অনেক ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান ছিল। এদের মধ্যে ইয়াহুদি ইয়াকুব সানু, খ্রিষ্টান আবু নাজ্জারা ও সালিম আনহুরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ধর্মীয় সহনশীলতার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি দীর্ঘ সময় ফ্রিম্যাসনরির সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া তিনি শিয়া-সুন্নি ঐকমত্যের প্রবক্তাও ছিলেন এবং একে সময়ের অন্যতম দাবি মনে করতেন।

শায়খ রশিদ রিজা তাঁর *তারিখুল উসতাজিল ইমাম* গ্রন্থে লিখেছেন, সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি কমবেশি মদপানও করতেন। সম্ভবত তাঁর সমকালীন অন্যান্য পণ্ডিতদের মতো তিনিও এই মতের প্রবক্তা ছিলেন—যে পরিমাণে নেশা হয় না, তা পান করতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা যদি আমলের ক্ষেত্রে তাঁর ঔদাসীন্য থেকে হয়, তাহলে এতে আমাদের আলোচনার কিছু নেই। তবে একে তিনি শরিয়তে বৈধ মনে করলে তা অবশ্যই তাঁর স্পষ্ট ভ্রান্তি এবং নেহাত নিন্দনীয়। আফগানিকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যেহেতু এই আলোচনা এসেছে, তাই এটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। শিষ্য আদিব ইসহাক আফগানির তামাক পানের কথাও লিখেছেন। (আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।) এই বিষয়গুলো মুসতাফা ফাওজি ইবনু আবদুল লতিফ গাজালের *দাওয়াতু জামালিদ্দিন আল-আফগানি ফি মিজানিল ইসলাম* গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি মূলত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাস্তবিক অর্থে নিজের পুরো জীবনটা তিনি রাজনীতিতেই কাটিয়েছেন। কিছু রচনা ও বক্তব্য ছাড়া তাঁর তেমন গবেষণাকর্ম পাওয়া যায় না। তবে কুরআনের কিছু আয়াতের তাফসির তিনি করেছেন। কিছু আয়াতের তাফসির থেকে বোঝা যায়, তাফসিরের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিকতাপ্রিয় ছিলেন। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘ কোনো আলোচনা আমরা পাইনি, তবু তাঁর তাফসিরনীতি থেকে বোঝা যায়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বয়ানের মাধ্যমে তাফসির

করাকে তিনি প্রাধান্য দিতেন। ড. ফাহদ ইবনু আবদুর রাহমান সুলায়মান রুমির *মানহাজুল মাদরাসাতিল আকলিয়াহ আল-হাদিসা ফিত-তাফসির* গ্রন্থে আফগানির তাফসির এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ ইসতাম্বুলে জামালুদ্দিন আফগানি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আফগান সরকারের অনুরোধে তাঁর লাশ আফগানিস্তানে নিয়ে আসা হয় এবং কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দাফন করা হয়।

## পাঁচ. উপসংহার

সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনা পড়ে বোঝা যায়, তাঁর ব্যাপারে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের মতামত প্রচলিত আছে। তাঁর পক্ষে যেমন আলিমদের লেখালিখি রয়েছে, তেমনি বিপক্ষেও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিছু গ্রন্থের নাম আমরা বইয়ের শেষে উৎসতালিকায় উল্লেখ করেছি।

সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানির শিষ্য মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু লিখেছেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই আলিমরা তাঁকে নিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যান। অনেক আলিম এই বলে অভিযোগ তোলেন যে, আফগানি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অত্যাচারী ন্যায়পরায়ণ শাসকের শাসন চান। আফগানির কাছে আবদুহু এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ তো আমার ওপর অপবাদ। আমি কী করে এই চিন্তাধারার প্রবক্তা হব? তা ছাড়া অত্যাচারী ও ন্যায়পরায়ণ তো পরস্পরবিরোধী দুটি গুণ। এর দাবিই-বা কী করে করা যায়?'

তাঁর সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনা পড়লে যে-কারও মনে হবে, সুফিদের কাওয়ালি, মিউজিক এবং নৃত্যে তার বেশ আগ্রহ ছিল। এ ছাড়া ওয়াহদাতুল উজুদ ও ইসলামের যুক্তিমূলক ব্যাখ্যার প্রভাবও তাঁর মধ্যে ছিল প্রকট।

এসব চিন্তাধারার কারণে আরবের অনেক সালাফি আলিম তাঁর সমালোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত।

আফগানির শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ এবং শিয়া আলিমদের কাছে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে বেশ শক্ত প্রমাণ থাকলেও পরে তিনি মাজহাব পরিবর্তন করেছিলেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সালাফি এবং হানাফি কিছু আলিম তাঁর ব্যাপারে তাকিয়া করে নিজেকে হানাফি মাজহাবের অনুসারী বলে পরিচয় দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। অপরদিকে হানাফি মাজহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। অন্যদিকে শিয়া মতাবলম্বী কারও কারও মতে তিনি শিয়া; আবার

কারও কারও মতে হানাফি ছিলেন। তবে শিয়া-সুন্নি ঐক্যের স্বপ্ন যে তিনি দেখতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তাঁর হানাফি সুন্নি ও মুসলিম এ পরিচয়টুকুই যথেষ্ট; অদৃশ্যের ব্যাপার তো আল্লাহ তাআলার হাতেই।

ধূমপান তাঁর আরেকটা অভ্যাস ছিল। যদিও হানাফি মাজহাবমতে এতে নেশার পরিমাণ কম হলে অসুবিধা নেই, তবু অপচয় এবং শরীরের ক্ষতি তো আছেই। অন্যভাবে বললে ধূমপান নিজের প্রাণ ও সম্পদে আগুন জ্বালানোর নামান্তর, তাই তা অবৈধ। এ ভিত্তিতেই আরব আলিমরা একে হারাম আখ্যা দেন।

নবুওয়াত উপার্জিত বিষয় হওয়া, প্রাণিজগতে বিবর্তনের ধারণা-বিশ্বাস, ভাস্কর্য বৈধ হওয়া বা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসিরে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রমাণরূপে উপস্থাপন প্রভৃতি চিন্তাধারার তাঁর কিছু বক্তব্য রয়েছে। সামসময়িক আলিমরা এসব চিন্তাধারার সমালোচনাও করেছেন। অবশ্য এসব মতাদর্শ থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নাকি অটল ছিলেন, সেটা জানা যায়নি।

যাই হোক, এ চিন্তাধারাগুলোর ভ্রান্তি সম্পর্কে অবশ্যই কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এসব চিন্তাধারা যেহেতু সরাসরি বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, ফলে এসবকে আধুনিকতাবাদের প্রতিক্রিয়াও মনে করা হয়।

জামালুদ্দিন আফগানি জীবনের রাজনৈতিক যে সময়টা পশ্চিমা আধিপত্যবাদ এবং তার প্রতিনিধি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের উৎখাত করতে ব্যয় করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মূল জীবন ছিল রাজনৈতিক জীবন; আর রাজনীতির সংস্কারকেই তিনি মুসলিমদের সংস্কারের প্রধান মাধ্যম জ্ঞান করতেন। যদিও এ ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্য মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহুর ভিন্নমত রয়েছে। তিনিও মুসলিমদের সংস্কার চাইতেন, তবে এর ভিত্তি ছিল শিক্ষাদীক্ষা। তাই তিনি রাজনীতির পরিবর্তে শিক্ষার প্রচার-প্রসারে আজীবন কাজ করে গেছেন।

সামগ্রিক বিবেচনায় সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কার এবং এর উন্নতিসাধনে একজন সংস্কারক হিসেবে কাজ করে গেছেন। আমাদের কাছে তাঁর উদাহরণ আল্লামা ইকবালের মতো। আল্লামা ইকবাল নিঃসন্দেহে একজন বিদগ্ধ চিন্তক, উম্মাহের ব্যথায় ব্যথিত এবং সংস্কারক ছিলেন; কিন্তু তাঁর কিছু চিন্তাধারা ও মতাদর্শ উম্মাহর স্বীকৃত আকিদা ও মতাদর্শের পরিপন্থি ছিল। আফগানির ক্ষেত্রেও আমাদের একই অবস্থান।

এসব সংস্কারকের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি প্রচারের তুলনায় তাঁদের আধুনিক মতাদর্শসমূহের জ্ঞানগত বিশ্লেষণ তুলনামূলক বেশি হওয়া উচিত। অল্প যে কজন সালাফি আলিম তাঁকে

রাফিজি, দুষ্ট অথবা ইংরেজদের এজেন্ট প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করেন, আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। হ্যাঁ, এ কথা আমরাও বলি যে, জামালুদ্দিন আফগানির মতাদর্শ ও চিন্তাধারায় বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি রয়েছে, যেগুলোর স্পষ্ট খণ্ডন দরকার। তবে কীভাবে আমরা তাঁর নিয়তের ফায়সালা করে তাঁকে রাফিজি, দুষ্ট অথবা ইয়াহুদিদের দোসর আখ্যা দিতে পারি! আল্লাহই ভালো জানেন।





# মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু

## এক. জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন

তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহু ইবনু হাসান ইবনু খাইরুল্লাহ। ১২৬৫ হিজরি—১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। আরবি ব্যাকরণের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন গ্রামের মসজিদ থেকে; কিন্তু তিনি নিজেই বলেন, এই দুই বছরে ব্যাকরণের একটি শব্দও তাঁর বোধগম্য হয়নি। এজন্য তিনি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাচীন শিক্ষাক্রম ও পাঠদানপদ্ধতিকেই দোষারোপ করতেন। ১২৮৬ হিজরিতে প্রায় ১৭ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের পর পিতা জোর করে একটি প্রাচীন মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য পাঠালে রাস্তা থেকেই তিনি ফিরে আসেন। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়সমূহের সেকেলে শিক্ষাক্রম ও পাঠদানপদ্ধতি তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রতি অনুৎসাহ ও বিতৃষ্ণার জন্ম দিচ্ছে। এই শিক্ষাক্রম ও পাঠদানপদ্ধতির মাধ্যমে শতকরা ৯৫% শিক্ষার্থী কিছুই অর্জন করতে পারে না।

মুহাম্মাদ আবদুহু ছিলেন এই শিক্ষাক্রম ও পাঠদানপদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রবক্তা। এরপর তিনি তাঁর চাচা শায়খ দারবিশের সংস্পর্শে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রতি পুনর্বার মনোনিবেশ করেন। জ্ঞানার্জনের আগ্রহ-উদ্দীপনা নতুন করে জাগ্রত হয় তাঁর মধ্যে। এ সময়ে শায়খ দারবিশের তত্ত্বাবধানে তাসাওউফচর্চায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। আধ্যাত্মিক কিছু অভিজ্ঞতাও তিনি বর্ণনা করেছেন।

১২৮৭ হিজরিতে সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি কায়রো এলে তাঁর কাছে গণিত, দর্শন ও ইলমুল কালামের জ্ঞানার্জন করেন। এরপর আফগানির পাঠদানপদ্ধতি ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর কাছেই থেকে যান। আবদুহু ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আল আজহারে ভর্তি হয়ে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আলামিয়া ডিগ্রি লাভ করেন। আল আজহারে থাকাকালে তিনি অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। এমনকি ইবাদত-বন্দেগিতে পুরো রাত কাটিয়ে দিতেন। আফগানির প্রভাবে তিনি আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়

সাধন করেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলুম নামে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন মুফতি আবদুহু।

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উসতাজ জামালুদ্দিন আফগানির সঙ্গে আহমাদ উরাবি পাশার আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলন ব্যর্থ হলে তাঁকে কারান্তরীণ হতে হয়। একপর্যায়ে বৈরুতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে জামালুদ্দিন আফগানির আহ্বানে তিনি প্যারিসে যান এবং *আল-উরওয়াতুল উসকা* নামে একটি আরবি পত্রিকা চালু করেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতে ফিরে এসে *আল-উরওয়াতুল উসকা* নামেই একটি আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে যুক্ত না হওয়ার শর্তে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে তিনি রাষ্ট্রীয় বিচারক নিযুক্ত হন। তারপর নীতিনির্ধারণী পরিষদের সদস্য হন। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে মিসরের প্রথম ও প্রধান মুফতি ঘোষণা করা হয় এবং আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রচার-প্রসারের জন্য *জামইয়াতু ইহয়াইল উলুম আল-আরাবিয়া* প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ—১৩২৩ হিজরিতে মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সাইয়িদ রশিদ রিজা, হাফিজ ইবরাহিম, শায়খ ইজ্জুদ্দিন কাসসাম, শায়খুল আজহার মুহাম্মাদ মুসতাফা মারাগি, শায়খুল আজহার মুসতাফা আবদুর রাজজাক, শায়খ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, সাআদ জাগলুল, কাসিম আমিন, মুহাম্মাদ লুতফি জুমআহ, তাহা হুসাইন প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু তাঁর জীবনে তরুণদের এমন একটি দল গঠন করতে চেয়েছিলেন, যারা আরবি ভাষা ও ইসলামি জ্ঞানকে পুনর্জীবন দান করবে এবং শাসনব্যবস্থা ও শাসকদের সহযোগিতায় মিসরের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার সাধন করবে। এজন্য আপন উসতাজ জামালুদ্দিন আফগানির বিপরীতে বিপ্লবের জন্য রাজনীতির পরিবর্তে তিনি শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। অপরদিকে জামালুদ্দিন আফগানি রাজনীতিকেই বিপ্লবের ভিত্তি মনে করতেন। এ কারণেই মুফতি আবদুহুকে যখন শায়খুল আজহার নির্বাচিত করা হয়, তিনি জামিয়া আজহারের শিক্ষাক্রম এবং পাঠদান-পদ্ধতি, চিন্তাধারা ও মতাদর্শে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সেকেলে নিয়ম উপেক্ষা করে সব ফিকহি মাজহাবকে সমান স্তরে বিবেচনা করার আহ্বান করেন।

তাঁর পরবর্তী শায়খুল আজহারদের মধ্যে এক বিরাট অংশ ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এমনকি শায়খ মুসতাফা মারাগির সময় হানাফি, মালিকি,

শাফিয়ি ও হাম্বলি আলিমদের ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠন করা হয়েছিল, যাঁরা বিতর্কপূর্ণ বিভিন্ন মাসআলায় ঐকমত্যপূর্ণ ফাতওয়া প্রদান করতেন।

## দুই. রচনাবলি

মুহাম্মাদ আবদুহুর প্রথম গ্রন্থ *রিসালাতুল ওয়ারিদাত*। এটি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সুফিধারায় ইলমুল কালাম ও ইলমুত তাওহিদের আলোচনা করেন। চার্লস অ্যাডামসের (Charles Adams) মতে এই গ্রন্থ থেকে আবদুহুর অস্তিত্ববাদে প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে তিনি *রিসালা ফি ওয়াহদাতিল উজুদ* এবং ইসমাইল পাশার জীবনভিত্তিক গ্রন্থ *তারিখু ইসমাইল বাশা* রচনা করেন। এ ছাড়া আলি ইবনু আবি তালিব রা.-এর *নাহজুল বালাগাহ*, বাদিউজ্জামান হামাদানি কৃত *মাকামাত*, মানতিকশাস্ত্রে উমর ইবনু সাহলান কৃত *বাসায়ির আন-নুসাইরিয়া* প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

মিসরের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে *নিজামুত তালিম আল-মিসরিয়া* নামেও তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। এ ছাড়া ধর্মীয় ঐক্য নিয়ে *রিসালাতুত তাওহিদ* নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেটি তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ রচনা। গ্রন্থটি খ্রিষ্টীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে সামান্য সংযোজন-বিয়োজন করে পাঠ্যতালিকাভুক্ত। এ ছাড়া তিনি আল আজহারে ১৩১৭ থেকে ১৩২৭ হিজরি পর্যন্ত তাফসিরের পাঠদান করেন। এতে কুরআনের শুরু থেকে সুরা নিসার ১২৫তম আয়াত পর্যন্ত তাফসির সম্পন্ন হয়, যা *তাফসিরুল মানার* নামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর মুফতি আবদুহুর শিষ্য রশিদ রিজা একে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেখান থেকে সুরা ইউসুফ পর্যন্ত তাফসির করতে সক্ষম হন। এটিও *তাফসিরুল মানার* নামেই প্রকাশিত হয়েছে।

## তিন. চিন্তাধারা ও মতবাদ

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে, স্বাধীনভাবে এবং সালাফে সালিহিনের পন্থায় নিজ থেকেই দীন বোঝার প্রবক্তা ছিলেন। যুক্তি ও প্রমাণের মধ্যে বিরোধ হলে তিনি যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং এই অগ্রাধিকারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্য রয়েছে বলে দাবি করতেন। তাঁর উসতাজ সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানির সঙ্গে ফ্রিম্যাসনরির বিভিন্ন সভায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তবে এই অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানা যায়নি। তিনি দেশপ্রেম-দর্শনের কঠোর প্রবক্তা ছিলেন, এ জন্য মিসরে মুসলিম ও কিবতিদের ভিন্নমতসমূহে কিবতিদের পক্ষ নিতেন।

ড. মুহাম্মাদ ইমারাহ ও অন্যান্য বিশ্লেষকের মতে, মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহুর শিষ্য কাসিম আমিনের *তাহরিরুল মারআতিল মুসলিমা* গ্রন্থের অধিকাংশ রচনা মুহাম্মাদ আবদুহুরই। বাদবাকি কিছু অংশ কাসিম আমিনের নিজের। রচনা শেষ হলে আবদুহু এই গ্রন্থ পুনঃনিরীক্ষণ করে পুরো গ্রন্থের বর্ণনাপদ্ধতি ও উপস্থাপনাশৈলী এক করার চেষ্টা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, 'মেয়েদের জন্য মুখ ঢেকে রাখা শরিয়ত বা শিষ্টাচার কোনো দৃষ্টিতেই আবশ্যক নয়; বরং এটি আরবদের প্রচলনমাত্র, যা আজ পর্যন্ত এভাবেই চলে এসেছে। এ ধরনের প্রথার ক্ষেত্রে উম্মাহর ঐকমত্য হতে পারে না।'

অবশ্য হাত-পা-চেহারা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ পর্দাবৃত করা তিনি শরিয়তের বিধানভুক্ত বলে মনে করতেন। বহুবিবাহকেও তিনি রাসুল ﷺ-এর যুগের প্রয়োজন বলে মনে করতেন। এই গ্রন্থে তিনি এও বলেন, 'সতর ও পর্দার চাহিদা পূরণ করা হলে নারী-পুরুষ একত্রিত হওয়া বৈধ। কেননা, মিলিত হওয়ার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা একান্তে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

এ ছাড়া তালাকের অধিকাংশ মাসআলায় তিনি হানাফি মাজহাব অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতের বিপরীতে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মতকে অগ্রাধিকার দিতেন।

ড. মুহাম্মাদ ইমারাহ তাঁর *আল-আমাল আল-কামিলাহ লি মুহাম্মাদ আবদুহু*তে লিখেছেন, মুফতি আবদুহুর মতে আকিদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ শ্রেণির হাদিস প্রমাণযোগ্য নয়। অনুরূপ *মানহাজুল মাদরাসাতিল আকলিয়া আল-হাদিসাহ ফিত তাফসির* গ্রন্থে ফাহদ ইবনু আবদুর রাহমান বলেন, মুহাম্মাদ আবদুহু ছিলেন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির দর্শনের প্রবক্তা।

শায়খ ইউসুফ নাবহানি[১৩] এক কবিতায় আবদুহুকে ফাসিক শায়খ আখ্যায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে এও বলেন যে, তিনি মিসরের প্রধান মুফতি, শায়খুল আজহার এবং নীতিনির্ধারণী পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই নামাজ ত্যাগ করতেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করেননি।

দাজ্জালের আবির্ভাব বলতে দাজ্জালি ফিতনাকেই বোঝাতেন আবদুহু। সুরা ফিলের তাফসিরে তিনি 'ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি'র অর্থ নিয়েছেন মশামাছি। তিনি বলেন, পাখির

---

[১৩] ইউসুফ ইবনু ইসমাইল নাবহানি একাধারে একজন কাজি, ফকিহ এবং কবি ও সুফি ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ফিলিস্তিনের ইজজিমে (Ijzim) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩-১৮৭৬ পর্যন্ত তিনি জেনিনে কাজি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর তুরস্কে এসে *আল-জাওয়াইব* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে ফিলিস্তিনের যে কজন লেখক, সাহিত্যিক ও কবি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হাদিস, সিরাত, রাসুল ﷺ-এর শানে কবিতা এবং আলিমদের জীবনীসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন। —*অনুবাদক*

কঙ্কর নিক্ষেপের অর্থ মূলত এদের দংশন, যেসবের জীবাণু শত্রুদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেয়।

## চার. কুরআনের অদ্ভুত তাফসির

মুফতি আবদুহুর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত এবং যুক্তিমূলক কিছু তাফসির এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

**১. সুরা বাকারার ৫০ নম্বর আয়াত**

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾

আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের জন্য আমি সাগরকে দুভাগ করেছিলাম।

এই আয়াতের তাফসিরে মুহাম্মাদ আবদুহু মুসা আ.-এর লাঠির মাধ্যমে সমুদ্র দুভাগ হওয়া যদিও স্বীকার করেছেন; কিন্তু মুজিজার প্রতি ইমান রাখাকে সামগ্রিকভাবে ইমানিয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মনে করেন। অপরদিকে স্যার সাইয়িদ আহমাদসহ যারা এর ব্যাখ্যা জোয়ার-ভাটা দিয়ে করেন, তাদের খণ্ডনও করেন।

**২. সুরা বাকারার ৬৩ নম্বর আয়াত**

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ﴾

এবং আমি তুর পাহাড়কে তোমাদের উপরে ওঠালাম।

এই আয়াতের আলোচনায় আবদুহু পাহাড়কে বনি ইসরাইলের উপরে ওঠানো অস্বীকার করে একে পাহাড়ের কম্পন এবং তার ছায়া তাদের ওপর পড়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন।

**৩. সুরা বাকারার ৭৩ নম্বর আয়াত**

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتٰى﴾

আমি বললাম, তোমরা এর একটি অংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করো। এভাবেই আল্লাহ মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, বনি ইসরাইলে এমন একটা প্রথা ছিল যে, কোনো গোত্রে কাউকে হত্যা করা হলে যখন হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যেত না তখন কেউ

মৃত ব্যক্তির দিকে গোশতের টুকরো নিক্ষেপ করলে তাকে এই হত্যাকাণ্ড থেকে মুক্ত বলে মনে করা হতো। আর যদি কেউ এতে অংশগ্রহণ না করত, তাকে হত্যায় অভিযুক্ত মনে করা হতো।

এই আয়াতে মৃতদের পুনর্জীবনদানকে তিনি কিসাসের বিধান বলে ব্যাখ্যা করে বলেন, কিসাসের ব্যাপারেই তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন—'এতে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।'

### ৪. সুরা বাকারার ৮১ নম্বর আয়াত

﴿بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

হ্যাঁ, যারা পাপ উপার্জন করেছে এবং তাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানেই তারা স্থায়ী হবে।

এই আয়াতের তাফসিরে তিনি অব্যাহতভাবে কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি আখ্যা দেন। সেই সঙ্গে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে তাদের মতকেও কুরআনের বক্তব্যের কাছাকাছি বলে মত দেন।

### ৫. সুরা বাকারার ৮৫ নম্বর আয়াত

﴿اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾

তোমরা কি তবে কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস রাখো আর কিছু অস্বীকার করো?

এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, যদি কোনো মুসলিম কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকে এবং এ কারণে তার মনে অনুশোচনা না জাগে; বরং সে অব্যাহতভাবেই গুনাহ করতে থাকে, তাহলে এমন কালিমাপাঠকারী মুসলিম কাফির হয়ে যায়।

### ৬. সুরা বাকারার ৮৭ নম্বর আয়াত

﴿وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ﴾

আর আমি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁকে সহযোগিতা করলাম।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রুহুল কুদুসকে তিনি 'ওহি' বলে ব্যক্ত করেছেন। অথচ অন্যান্য

মুফাসসিরের মতে, এর অর্থ জিবরিল আ.। এভাবে نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ—'রুহুল আমিন তা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।'—এর রুহুল আমিনের ব্যাখ্যাও তিনি 'ওহি' দিয়ে করেছেন।

**৭. সুরা বাকারার ১০২ নম্বর আয়াত**

﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾

এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের প্রতি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'মালাকাইন' বলতে প্রথমে সাধারণ মানুষই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু লোকেরা তাদেরকে ফেরেশতা মনে করার কারণে এখানে ফেরেশতা বলা হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, রূপকার্থে তাদেরকে ফেরেশতা বলা হয়েছে।

**৮. সুরা বাকারার ২৪৩ নম্বর আয়াত**

﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾

আল্লাহ তাদেরকে বললেন : তোমরা মরে যাও। তারপর তিনি তাদেরকে পুনর্জীবিত করলেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ আবদুহু বলেন, এখানে মৃত্যু দ্বারা শত্রুর সামনে পরাস্ত হওয়া উদ্দেশ্য, আর পুনর্বার জীবিত করা অর্থ স্বাধীনতা দেওয়া এবং সাহায্য করা।

**৯. সুরা আলে ইমরানের ৩৭ নম্বর আয়াত**

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾

যখনই জাকারিয়া মারইয়ামের কক্ষে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন তখনই তাঁর কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, হে মারইয়াম, এসব কোত্থেকে পাও? উত্তরে মারইয়াম বলতেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটির অস্বাভাবিকতা অস্বীকার করে তিনি বলেন, আগেকার মুফাসসিররা কুরআনের তাফসিরে অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহের বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসরাইলিয়াতের আশ্রয় নিয়েছেন, যা মূলত তাফসিরের বিশুদ্ধ পদ্ধতি নয়।

১০. সুরা আলে ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াত

﴿وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

আর আল্লাহর নির্দেশে আমি মৃতদেরকে জীবিত করি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসা আ. কর্তৃক মৃতদেরকে জীবিত করার মুজিজার ব্যাপারে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে নীরব থাকা উচিত। কুরআনের কোথাও এটি প্রমাণিত নয় যে, ইসা আ. মানুষকে জীবন দান করতে পারতেন।

১১. সুরা আলে ইমরানের ৫৫ নম্বর আয়াত

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, হে ইসা, আমি আপনাকে মৃত্যু দেবো এবং আমার কাছে তুলে নেব।

এই আয়াতের তাফসিরে তিনি ইসা আ.-এর পুনরায় অবতরণ অস্বীকার করে এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহের অর্থ ইসা আ.-এর বাস্তব শিক্ষা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে বলে মত ব্যক্ত করেন।

১২. এই সুরারই ১৩-১৫ আয়াতের অধীনে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি বলেন, কোনো আহলে কিতাব যদি তাদের অবশিষ্ট এই ধর্ম প্রকৃত অর্থেই অনুসরণ করে—চাই সে ইসলামগ্রহণ না করুক—আল্লাহর দরবারে সে খোদাভীরু ও সৎকর্মশীল বলে গণ্য হবে।

## পাঁচ. উপসংহার

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহুর নিয়ত ও নিষ্ঠার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে তাঁর কৃত তাফসির ও চিন্তাধারা অধ্যয়ন করলে এটাই অনুমিত হয় যে, যুক্তিবাদ ও মুতাজিলা চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে প্রকট ছিল। মুফতি আবদুহুর উদাহরণ হিসেবে আমরা স্যার সাইয়িদ আহমাদ খানকে—যিনি উপমহাদেশের আধুনিক মুতাজিলা মতবাদের প্রধান ছিলেন—উপস্থাপন করতে পারি, যিনি নিজের নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ নিয়ত সত্ত্বেও ইসলাম এবং কুরআনের বক্তব্য ও শিক্ষায় বিকার ঘটিয়েছিলেন। স্যার সাইয়িদ ও আবদুহুর পারস্পরিক তুলনা করতে গেলে যে পার্থক্য দেখা যায় তা হলো, ধর্মীয় জ্ঞানে আবদুহুর যে গভীরতা ও পাণ্ডিত্য ছিল, স্যার সাইয়িদের তা ছিল না। এ কারণে কুরআন-হাদিসের যেসব জায়গায় স্যার সাইয়িদ স্খলনের শিকার হয়েছেন, সেসব

জায়গায় আবদুহু আহলুস সুন্নাত ও সালাফে সালিহিনের অবস্থানের ওপর দৃঢ়পদ ছিলেন। যেমন : মুসা আ.-এর লাঠির আঘাতে সমুদ্র দুভাগ হওয়ার মুজিজা স্বীকার অথবা অস্বীকার করা। প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে সৃষ্ট চিন্তাগত ভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে স্যার সাইয়িদ এক্ষেত্রে যেখানে কোনো নিয়মের ধার ধারেননি, সেখানে মুফতি আবদুহু অনেক ক্ষেত্রে যুক্তির বিপরীতে প্রমাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতএব তুলনামূলক বিচারে আমরা বলতে পারি, স্যার সাইয়িদের মতো বিচ্যুতি মুফতি আবদুহুর নেই। তবে তাঁর হজ পালন না করার বিষয়টা অলসতা ছাড়া কিছুই নয়। কেউ কেউ তাঁর নামাজ না পড়ার কথাও বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাপদ্ধতি এমন—কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে ছিলেন, নামাজের সময় হলেও তিনি নামাজ পড়েননি। এভাবে পরের ওয়াক্ত চলে আসে...। এ ধরনের ঘটনায় আমরা ভেবে নিতে পারি, হয়তো তিনি দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়েছেন।

তা ছাড়া যাঁর চিন্তাভাবনায় এমন চিন্তার স্বাধীনতা ও উদারতা থাকে, তিনি শরয়ি কোনো অক্ষমতা ছাড়াও দুই নামাজ একত্রিত করতে পারেন না—এমন মনে করার কিছু নেই।





# সাইয়িদ মুহাম্মাদ রশিদ রিজা

## এক. জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন

পুরো নাম মুহাম্মাদ রশিদ ইবনু আলি ইবনু রিজা ইবনু মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন ইবনু সাইয়িদ বাহাউদ্দিন। পিতা এবং মাতা উভয় দিক থেকেই তাঁর বংশধারা আহলুল বায়ত পর্যন্ত পৌঁছায়। সাইয়িদ রশিদ ১২৮২ হিজরির ২৭ জুমাদাল উলা—১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের কালামুন (Al-Qalamoun—القلمون) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। কালামুন ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী শামের ত্রিপোলি থেকে তিন মাইল দূরের একটি এলাকা। প্রাথমিক শিক্ষা ত্রিপোলির রশিদিয়া মাদরাসায় গ্রহণ করেন। এই মাদরাসাটি উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন থাকায় এখানে তুর্কি ভাষায় পাঠদান করা হতো। তারপর ত্রিপোলিতেই মাদরাসা ওয়াতানিয়া ইসলামিয়ায় ভর্তি হন। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ হুসাইন আল জাসর। এখানে আরবি, তুর্কি ও ফরাসি ভাষায় পাঠদান করা হতো। কিছুদিন পর মাদরাসাটি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে মুহাম্মাদ রশিদ রিজা অন্য কোনো মাদরাসায় চলে যান। তবে শায়খ হুসাইন আল জাসরের কাছেও জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। রশিদ রিজার জীবনে দুজন মানুষের চিন্তাধারা ও প্রভাব বেশি ছিল। তাঁদের একজন শায়খ হুসাইন, অপরজন মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু।

রশিদ রিজা ইমাম গাজালির *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* অধ্যয়নের পর তাসাওউফের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ইবাদত ও সাধনায় এতই মগ্ন থাকতেন, অনেক সময় মনে হতো তিনি নিজের মধ্যে নেই; অন্য জগতে বাস করছেন! তাঁর থেকে কিছু আধ্যাত্মিক ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। শুরুর দিকে তিনি শাজিলি এবং পরবর্তী সময়ে নকশবন্দি ধারায় তাসাওউফের চর্চা করেন। একপর্যায়ে তিনি আধ্যাত্মিকতার চূড়ায় আরোহণ করেন এবং সাহিবে কারামাত হিসেবে গণ্য হতে থাকেন।

ড. ইবরাহিম আহমাদ আল আদাওয়ি *রশিদ রিজা : আল-ইমামুল মুজাহিদ* গ্রন্থে তাঁর কিছু কারামাত বর্ণনা করেছেন। শেষ বয়সে এসে তিনি তাসাওউফের প্রথাগত জিকির ইত্যাদিকে বিদআত আখ্যা দেন এবং সালাফি মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এমনকি

এক বইয়ে তাঁর শিক্ষক ও উপদেষ্টা শায়খ হুসাইন আল জাসরেরও সমালোচনা করতে পিছপা হননি।

রশিদ রিজা ছিলেন একজন উদ্দীপ্ত দায়ি ও মুবাল্লিগ। বিভিন্ন মসজিদে দারস দিতেন। ক্যাফে-শপিংমলে গিয়ে মানুষের মধ্যে দাওয়াত দিতেন। নারীদের মধ্যে দীনশিক্ষা প্রচারে বিভিন্ন গ্রামে ফিকহি মাসআলার বৈঠক বসাতেন। কবরপূজা এবং কবর থেকে বরকত গ্রহণের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। এ ছাড়া বরকতপূর্ণ মনে করা হয় এ ধরনের গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দিতেন।

একবার জামালুদ্দিন আফগানি ও মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহুর *আল-উরওয়াতুল উসকা* পত্রিকার কিছু সংখ্যা তাঁর হস্তগত হয়। এগুলো পড়ে তিনি আফগানির প্রতি বেশ প্রভাবিত হন এবং আফগানির মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সংস্পর্শেই থাকেন। ১৩১৪ হিজরিতে জামালুদ্দিন আফগানির মৃত্যুর[১৪] পর তাঁর শিষ্য মুফতি আবদুহুর কাছে মিসরে চলে আসেন।[১৫] তাঁর আবেদনে মুফতি আবদুহু কুরআনের তাফসির শুরু করেন, যা ধারাবাহিকভাবে ১৩২৩ হিজরি পর্যন্ত চলে। দীর্ঘ এই ৯ বছরে তিনি সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নিসার ১২৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তাফসির করেন। মুফতি আবদুহুর মৃত্যুর পর তিনি নিজেই এই তাফসির পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। তবে বেশিদূর এগোতে পারেননি—সুরা ইউসুফের ১০১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তাফসির করতে সক্ষম হন তিনি।

রশিদ রিজা লিখেছেন, তাফসির পূর্ণ করতে গিয়ে তিনি আপন উসতাজের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকহারে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের উল্লেখ এবং আলিমদের মতভিন্নতা বর্ণনার পাশাপাশি শাব্দিক বিশ্লেষণও তিনি উপস্থাপন করেছেন।' তবে তাঁর মৃত্যুর পর সুরা ইউসুফের পর থেকে এই তাফসির পূর্ণ করেন উসতাজ বাহজা বাইতার।

রশিদ রিজা ১৩১৫ হিজরি—১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে *আল-মানার* নামে একটি সাময়িকীও চালু করেন, যার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ হিজরির রবিউস সানি—১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর এই সাময়িকী ইউরোপসহ আরব এবং পুরো মুসলিম বিশ্বে বেশ খ্যাতি লাভ করে। এতে তিনি উসতাজ মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু ও তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করেন। বাহজা বাইতার এই পত্রিকাকে বিদআতের মূলোৎপাটন ও মুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম মাধ্যম মনে করতেন।

১৩৩০ হিজরিতে রশিদ রিজা *মাহাদুদ্ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ* নামে একটি প্রতিষ্ঠান

---

[১৪] ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ আফগানি ইনতিকাল করেন।—*অনুবাদক*।

[১৫] রশিদ রিজা ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতে ইমাম আবদুহুর সান্নিধ্যে যান। এর কিছুদিন পর আবদুহু মিসর ফিরে এলে তিনিও মিসর ফিরে আসেন।—*অনুবাদক*।

চালু করেন। তিন বছরের নির্দিষ্ট কোর্স শেষ করলে এখানে শিক্ষার্থীরা সনদ লাভ করত। এরপর তাদেরকে মুসলিমদের আত্মশুদ্ধির দীক্ষা দেওয়ার ইজাজত দেওয়া হতো। এ ছাড়া কেউ যদি একাধারে তিন বছরের বেশি দীক্ষা গ্রহণ করত, তবে তাকে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হতো। সে সময় *মাহাদুদ্ দাওয়াহ* থেকে অনেক বড় বড় দায়ি গড়ে ওঠেন।

আপন উসতাজের মতো রশিদ রিজাও আল আজহারের সংস্কার ও উন্নতির লক্ষ্যে দু-হাতে লিখে গেছেন। উসতাজের জীবদ্দশায় তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে কোনোকিছু লিখলে অথবা লিখতে চাইলে আবদুহু তাতে বাঁধ সাধতেন। কারণ, রাজনীতির সংস্কারের মাধ্যমে সবকিছুর সংস্কার হবে, এটা তাঁর মতের বিপরীত ছিল। অবশ্য উসতাজের মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীনভাবেই রাজনীতিতে আসেন। উসমানি সাম্রাজ্যের তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন।

১৩৫৪ হিজরির ১৩ জুমাদাল উলা—১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরের কায়রোয় মৃত্যুবরণ করেন। উসতাজ আবদুহুর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

## দুই. রচনাবলি

জীবদ্দশায় শায়খ রশিদ রিজা বিস্তর লেখালিখি করেছেন। *আল-হিকমাতুশ শারইয়া ফি মুহাকামাতিল কাদিরিয়া ওয়ার-রিফাইয়া* তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রথম গ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে *তারিখুল উসতাজিল ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু, আল-ওয়াহইউল মুহাম্মাদি, আল-মানার ওয়াল-আজহার, জিকরুল মাওলিদিন নাবাবি, ইউসরুল ইসলাম, আল-খিলাফাহ, আল-ওয়াহহাবিয়্যিন ওয়াল-হিজাজ, আস-সুন্নাহ ওয়াশ-শিআহ, মানাসিকুল হাজ, তাফসিরুল মানার, আর-রিবা ওয়াল-মুআমালাত ফিল ইসলাম, মুসাওয়াতুর রাজুল বিল-মারআহ, রিসালাতু আবি হামিদ আল-গাজালি, আল-মাকসুরাতুর রশিদিয়া, শুবুহাতুন নাসারা ওয়া হুজাজুল ইসলাম, খুলাসাতুস সিরাতিল মুহাম্মাদিয়া, ইনজিলু বারনাবা, আল-মুসলিমুন ওয়াল কিবত, আকিদাতুস সুলব ওয়াল ফিদা* এবং *ফাতাওয়াস সাইয়িদ রশিদ রিজা* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## তিন. চিন্তাধারা ও মতবাদ

শায়খ রশিদ রিজা তাঁর গ্রন্থসমূহ প্রচারের জন্য একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই ছাপাখানা থেকেই তিনি বিশেষভাবে ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়িম ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রাহ.-এর বিভিন্ন গ্রন্থ

প্রকাশ করেন। এ কারণে বিরোধীরা তাঁকে ওয়াহাবি আখ্যা দেন। তিনি তাঁর *আস-সুন্নাহ ওয়াশ-শিআহ* গ্রন্থে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সংস্কার-আন্দোলনের ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়ের উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করেন। *আল-ওয়াহহাবিয়্যুন ওয়াল-হিজাজ* গ্রন্থেও তিনি এ বিষয়ে কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছেন।

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহুর কয়েকজন শিষ্যের ব্যাপারে রশিদ রিজা বিতর্কের পথ খুলে দিয়েছিলেন। যেমন—মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, শায়খ আবদুল আজিজ জাবিশ, উসতাজ ফরিদ ওয়াজদি প্রমুখ। এঁদেরকে তিনি উসতাজের মানহাজ ও পথ থেকে বিচ্যুত বলে আখ্যায়িত করেন।

শায়খ রশিদ রিজা ফ্রিম্যাসনরি আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, যা তাঁর উসতাজ আবদুহু করেছিলেন। এমনকি ফ্রিম্যাসনরির সদস্যপদ গ্রহণে উসতাজকে বারণও করেছিলেন তিনি। উসমানি খিলাফতের পতনের পর খিলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি *আল-খিলাফাহ আও আল-ইমামাতুল উজমা* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি মুসতাফা কামাল পাশাকে ধর্মত্যাগী আখ্যা দেন।

রশিদ রিজা চিন্তাচেতনায় সুফিবাদের তুলনায় সালাফিবাদে অধিক অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও অনেক সালাফি আলিমের মতে আফগানি ও আবদুহুর কিছু চিন্তাগত প্রভাব তাঁর মধ্যে দৃশ্যমান ছিল। যেমন, মুফতি আবদুহুর মতো তিনিও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে যুক্তি প্রাধান্য পাবে; আর প্রমাণকে যৌক্তিকভাবে তাবিল বা ব্যাখ্যা করতে হবে। নিচে তাঁর কিছু তাফসির উল্লেখ করা হলো :

**১. সুরা আনফালের ৯ নম্বর আয়াত**

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

> স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য চাইছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন যে, আমি তোমাদেরকে ১ হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন, বদরযুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণ বলতে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বা কোনো ফেরেশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমনও নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হৃদয়ে প্রশান্তি ও অবিচলতা দান করেছিলেন।

২. সুরা বাকারার ৬৫ নম্বর আয়াত

﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾

অনন্তর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানরে পরিণত হও।

এই আয়াতের তাফসিরে রশিদ রিজা লিখেছেন, বনি ইসরাইলের নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে আল্লাহ বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন ব্যাপারটা এমন নয়; বরং বানরের সঙ্গে তাদের তুলনা করাই এই আয়াতের উদ্দেশ্য।

হজরত মাহদির ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহকে 'দুর্বল' ও 'বানোয়াট' আখ্যা দিয়ে রশিদ রিজা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আগমন অস্বীকার করেছেন। কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়কে তিনি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। *সহিহ বুখারি*তে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহে সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস চালান তিনি। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা প্রথমত যুক্তির পরিপন্থি, দ্বিতীয়ত খবরে ওয়াহিদ মানের হাদিসে বর্ণিত হওয়ায় এই মুজিজাকে তিনি অস্বীকার করেন। এ ছাড়া জিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যদিও এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই; কিন্তু এর উদ্দেশ্য মানুষের রক্তের সঙ্গে চলে এমন অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়া অথবা অণুজীব হতে পারে।'

৩. সুরা বাকারার ২৭৫ নম্বর আয়াত

﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

আর যে-কেউ সুদে ফিরে যাবে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। এরা চিরকাল সেখানেই থাকবে।

এই আয়াতের তাফসিরে তিনি মুতাজিলাদের মতো বাহ্যিক অর্থেই বলেন, এই বিধান স্পষ্ট হওয়ার পরেও যদি কেউ সুদ খায়, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

*আল-মানার* পত্রিকার ২৮ নম্বর ভলিউমের ১০ম খণ্ডে তিনি ইসা আ.-কে সশরীরে আসমানে তুলে নেওয়া এবং তাঁর পুনঃঅবতরণ অস্বীকার করেন। সঙ্গে এও স্পষ্ট করেন, এই বিশ্বাস মূলত ইসায়িদের বিশ্বাস।

## চার. উপসংহার

শায়খ রশিদ রেজার চিন্তা-ভাবনায় সময়ের সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে যদিও তিনি আবদুহুর বিপরীতে চলেছেন, তবু তাঁর অনেক চিন্তা ও ধারণা সমালোচনার যোগ্য। এ ছাড়া তাঁর বিভিন্ন রচনা, বিশেষত *তাফসিরুল মানার*

এবং *আল-মানার* পত্রিকার সংখ্যাগুলো অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয় যে, তিনি কুরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের কঠিন অনুরাগী ছিলেন। মোটের ওপর আমরা বলতে পারি, তাঁর যেসব কাজ শিরক ও বিদআতের খণ্ডনে সহায়ক হয়েছে, সেগুলো অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। তবে কুরআনের তাফসির করতে গিয়ে তিনি যেসব যুক্তি ও স্বপ্রণীত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, সেগুলো প্রত্যাখ্যাত।





# ড. তাহা হুসাইন

## এক. জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

ড. তাহা হুসাইন ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের মিনিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 'আমিদুল আদাবিল আরাবি' বা 'আরবি সাহিত্যের বরপুত্র' নামে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। *আল-আইয়াম* তাহা হুসাইনের আত্মজীবনীমূলক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

১৩ ভাই-বোনের মধ্যে তাহা হুসাইন সপ্তম। তিন বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। তবে শৈশবেই কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। তারপর আল আজহারে ধর্ম, আরবি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯০৮ সালে ভর্তি হন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা, ইসলামি সভ্যতা, ভূবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

১৯১৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বিখ্যাত আরবি কবি আবুল আলা আল মাআররিকে নিয়ে প্রথম পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ১৯১৭ সালে ফ্রান্সের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিস সরবন[১৬] থেকে বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনু খালদুনকে নিয়ে পিএইচডি করেন দ্বিতীয়বার। ১৯১৮ সালে মিসরে ফিরে আসার পর কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর তিনি মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর কায়রোতে তিনি ইনতিকাল করেন।

## দুই. লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম

ড. তাহা হুসাইনের গবেষণাকর্ম আরবি ভাষা ও সাহিত্য নিয়েই বেশি। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে *আল-আইয়াম*, *ফিশ শি'রিল জাহিলি* ও *আল-আদাবুল জাহিলি* বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে *আল-ফিতনাতুল কুবরা উসমান*, *আল-ফিতনাতুল কুবরা আলি ওয়া বানুহু*, *আলা হামিশিস সিরাহ*, *হাদিসুল*

১৬ Paris-Sorbonne University.

*আরবিআ, মিন হাদিসিশ শি'র ওয়ান-নাসর, মুসতাকবালুস সাকাফাহ ফি মিসর, আশ-শায়খান, মাআল মুতানাব্বি* এবং *জিকরি আবিল আলা* বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

## তিন. চিন্তাধারা ও মতবাদ

১৯২৬ সালে রচিত *ফিশ শি'রিল জাহিলি* গ্রন্থে তাহা হুসাইন দাবি করেন, প্রচলিত জাহিলি সাহিত্য যদিও ইসলামের আবির্ভাবের পরে রচিত হয়েছে, তবু তাকে ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মুসতাফা সাদিক রাফিয়ি, খাজির হুসাইন, শায়খ মুহাম্মাদ খুজারি ও মুহাম্মাদ লুতফি জুমআ প্রমুখ তাঁর এই মতের সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া আল আজহারের কিছু আলিমও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন। তাঁদের কৃত আপত্তিসমূহ গ্রন্থটির নতুন সংস্করণে যুক্ত করা হয়। অভিযোগগুলো নিম্নরূপ :

### ১. প্রথম অভিযোগ

ইবরাহিম ও ইসমাইলের অস্তিত্ব এবং তাঁদের বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণের ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনা না থাকায় তাহা হুসাইন এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাঁর কিছু শিষ্য এর জবাবে বলেন যে, অন্য জায়গায় তিনি এ ঘটনায় তাঁর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছেন।

### ২. দ্বিতীয় অভিযোগ

তাহা হুসাইন সাত কিরাআত অথবা দশ কিরাআত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে মানতে অস্বীকৃতি জানান এবং সাত হরফ বলতে তিনি ভাষাগত ভিন্নতা বুঝতেন। তবে আরেক গ্রন্থে তিনি ব্যাপারটি স্পষ্ট করে সাত কিরাআত অস্বীকার করার প্রচারণা নাকচ করেন। সঙ্গে ইবনু জারির তাবারির বক্তব্য নকল করার পর বলেন, এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত। একে কী করে কিরাআত অস্বীকার বলা হয়?

### ৩. তৃতীয় অভিযোগ

তিনি এই গ্রন্থে রাসুল ﷺ-এর বংশপরম্পরা উল্লেখ করতে গিয়ে শিষ্টাচার রক্ষা করেননি।

### ৪. চতুর্থ অভিযোগ

দীনে ইবরাহিম ও দীনে ইসলাম একই ধারাবাহিকতায় এসেছে এবং ইবরাহিমি দীনই আরবদের আসল ধর্ম, তাহা হুসাইন এটি মানতে নারাজ।

অভিযোগগুলো গভীর বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এসব কথায় বিচ্যুতি থাকলেও এগুলো তাহা হুসাইনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। কারণ, গ্রন্থের মূল

বিষয়ের বাইরে এগুলো সম্পূরক কথা এবং বিতর্কের ফলস্বরূপ এসে গেছে। যাই হোক, এই চারটি বিষয় বিলোপ সাপেক্ষে মিসর সরকার পরে বইটি প্রকাশের অনুমতি দেয়।

তাহা হুসাইনের জাহিলি যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট বক্তব্যসমূহে যদিও বিতর্কের সুযোগ রয়েছে, তা ধর্মীয় বিষয় না হওয়ায় আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। আবার এগুলোকে আমরা বিতর্কের ঊর্ধ্বে মনে করছি, ব্যাপারটা এমনও নয়। তা ছাড়া কুরআন-হাদিসের মতো এর হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন, তাও তো নয়। অবশ্য তাহা হুসাইন যেভাবে জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে জাহিলি যুগের সাহিত্যকে সন্দেহযুক্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন, কেউ এ মতে একমত না হলে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর সমালোচনা করা উচিত। ইতিমধ্যে মিসরের খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদেরা এর চূড়ান্ত জবাবও দিয়েছেন।

এই গ্রন্থের পরে ড. তাহা হুসাইন *আল-আদাবুল জাহিলি* নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি মিসরের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদানপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে ফিকহশাস্ত্রের মতো আরবি সাহিত্যেও প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নির্জীবতার কারণে প্রথম তিন শতকের পরে কোনো অভিনব পরিবর্তনসাধন হয়নি। তাহা হুসাইন বলেন, আরবি সাহিত্য ও এর ইতিহাস পাঠদানের আগে আমাদের যাচাই করে নেওয়া উচিত—আরবি সাহিত্যের নামে আমরা শিক্ষার্থীদের যা পড়াচ্ছি, তা মূলত আরবি সাহিত্য কি না।

আরবি সাহিত্য ও এর ইতিহাসের বাস্তবতা উদ্ধারে তিনি পাশ্চাত্যের গবেষণারীতিকে শ্রেষ্ঠ রীতি আখ্যা দেন। এ নিয়মে কোনো বিষয়ের গবেষণা করতে হলে প্রথমে শূন্যচিত্ত হতে হয় বা অস্তিত্বকে অনস্তিত্ব মনে করে তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। তাঁর মতে বিখ্যাত দার্শনিক রেনে দেকার্তের (René Descartes) গবেষণারীতিও ছিল এমন। তাহা হুসাইন বলেন, জাহিলি যুগের সাহিত্য বলতে যে সাহিত্য আমরা দেখি অথবা আমাদের পড়ানো হয়, তা সন্দেহযুক্ত। কাজেই জাহিলি কবিদের প্রতি এ সাহিত্যকে সম্পৃক্ত করা সংগত নয়। ভিন্নভাবে বলতে গেলে তাঁর মতে জাহিলি যুগের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তার অধিকাংশই কৃত্রিম।

তিনি আরও বলেন, যদি আমাকে জাহিলি যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হয়, তাহলে আমি কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করব; জাহিলি কবি ইমরাউল কায়েস, নাবিগা, আ'শা কায়েস, জুহায়ের, কাস ইবনু সাইদা বা আকসাম ইবনু জাইফি প্রমুখের কবিতার দিকে নয়। কারণ, এসব কবিতা তাদের পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয়।

তাহা হুসাইন আরও বলেন, জাহিলি কবি হিসেবে যাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ইয়ামেনি কাহতানি আরব অথবা আদনানি। আর কাহতানি ও আদনানি এ

দুই গোত্রের ভাষা আরবি ছিল না; বরং এই ভাষাগুলো আরবির তুলনায় হাবশি ভাষার নিকটবর্তী ছিল। কাজেই জাহিলি যুগের সাহিত্য অথবা এ গোত্রসমূহের কবিদের কথা আরবি ভাষার সাহিত্য কীভাবে হয়?

তিনি বলেন, আরবি ভাষার মূল সাহিত্য কুরআন মাজিদ। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কুরাইশের ভাষায়; আর কুরাইশরা আরবের অন্যান্য উপভাষা বিলোপ করেছে। এখন কাউকে জাহিলি যুগের সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হলে তাকে অবশ্যই কুরআনের বক্তব্যের আলোকে সে সময়ের সভ্যতা-সংস্কৃতি অধ্যয়ন করতে হবে।

*মুসতাকবালুস সাকাফাহ ফি মিসর* গ্রন্থে তাহা হুসাইন দাবি করেন, মিসরীয় সভ্যতা শ্বেত সাগরীয় (White Sea—البحر الأبيض) সভ্যতার অংশ; আর আরব উপদ্বীপ ও সুদানের তুলনায় এই সভ্যতার সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে ল্যাটিন সভ্যতার সঙ্গেই বেশি। তাই তিনি মিসরকে ইউরোপের অংশ বানাতে তৎকালীন শাসক খেদিব ইসমাইলের কাছে জোর দাবি জানিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে এই সভ্যতার অনুসরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

তিনি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মিসরে এমন একটি শাসনব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেন, যেখানে ধর্মের কোনো স্থান নেই। মুহাম্মাদ কামাল হুসাইন, উসতাজ সাতি হুসারি, ড. জাকি মুবারাক, ড. মুহাম্মাদ বাহি, ড. মুহাম্মাদ হুসাইন, সাইয়িদ কুতুব প্রমুখ এই গ্রন্থের গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন।

উসতাজ মুহাম্মাদ উমর তাওফিক তাহা হুসাইনের *আশ-শায়খান* গ্রন্থের পর্যালোচনা করেছেন। এ ছাড়া উসতাজ গাজি তাউবা *আলা হামিশিস সিরাহ* গ্রন্থের, শায়খ রফিকুল আজম ও উসতাজ ইবরাহিম আবদুল কাদির মাজিনি *হাদিসুল আরবিআ* গ্রন্থের, শায়খ মাহমুদ শাকির *মাআল মুতানাব্বি* গ্রন্থের এবং উসতাজ মুহাম্মাদ সালিম জুনদি *জিকরি আবিল আলা* গ্রন্থের পর্যালোচনা করেন। এ ছাড়া উসতাজ গাজি তাউবা *আল-ফিতনাতুল কুবরা* গ্রন্থের উভয় খণ্ড এবং *মিন বায়িদ* গ্রন্থের পর্যালোচনা করেছেন।

ইবনু খালদুনকে নিয়ে তাহা হুসাইনের পিএইচডির গবেষণাপত্র পড়ে জাকি মুবারাক একে প্রাচ্যবিদ ক্যাসানোভার (Casanova) চিন্তার চৌর্যবৃত্তি আখ্যা দেন। প্রাচ্যবিদ ম্যাসিগনন (Massignon) বলেন, তাহা হুসাইনের পিএইচডি সন্দর্ভ মূল্যায়নের জন্য পড়তে গিয়ে আমার মনে হলো, 'এসব তো আমাদেরই চিন্তাভাবনা, যা আমাদের কাছেই ফিরে এসেছে; আর যখন আমি ড. জাকি মুবারাকের সমালোচনা পড়েছি, তখন তাহা হুসাইনকে নতুন করে আবিষ্কার করি।'[১৭]

[১৭] আনওয়ার জুনদি কৃত *জাকি মুবারাক* : ১৩২। মাহদি মাহমুদ ইসতাম্বুলির *তাহা হুসাইন ফি মিজানিল উলামা*

এ ছাড়া জাকি মুবারাক তাহা হুসাইনকে শূন্য কলসসদৃশ আখ্যা দিয়ে বলেন, আরবি ভাষা ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই। তিনি আরও যোগ করেন, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণেই তাহা হুসাইন প্রসিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

ড. মুহাম্মাদ আহমাদ গামরাবি *জাহলু তাহা হুসাইন বি মানহাজ দেকার্ত* বা দেকার্তের গবেষণারীতি সম্পর্কে তাহা হুসাইনের অজ্ঞতা নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে তিনি দাবি করেন, তাহা হুসাইন যদিও দেকার্তের গবেষণারীতির অনুকরণের প্রবক্তা; কিন্তু দেকার্তের গবেষণারীতি সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না।

উসতাজ আনওয়ার জুনদি *তাহা হুসাইন ফি আহজানিল ইসতিশরাক* প্রবন্ধে তাঁর কড়া সমালোচনা করেছেন। এতে তিনি অভিযোগ করে বলেন, তাহা হুসাইন তাঁর *আশ-শিবুল জাহিলি* গ্রন্থের মূল ভাব প্রাচ্যবিদ ম্যারগোলিয়াথের (Margoliouth) কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে *মাআল মুতানাব্বি* গ্রন্থে যে দৃষ্টিভঙ্গি তাহা হুসাইন উল্লেখ করেছেন, তা প্রাচ্যবিদ ব্লাশিয়ারের (Régis Blachère)। ইবনু খালদুনের বিষয়ে কৃত পিএইচডির প্রবন্ধে তিনি প্রাচ্যবিদ এমিল ডুরখেইম (Émile Durkheim) থেকে বিভিন্ন তথ্য গ্রহণ করেছেন।

তাহা হুসাইনের সমালোচনারীতি মূলত রুডনারের (Rudner)। *হাদিসুল আরবিআ* গ্রন্থের মূল ভাব নিয়েছেন সেইন্ট-বেভ (Sainte Beuve) থেকে। সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি ন্যালিনো (Nallino) থেকে অনেক তথ্য গ্রহণ করেছেন। এভাবে আরবি ব্যাকরণের বিবর্তনবিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা বারজেস্ট্র্যাসারের (Bergstrasser) সঙ্গে, ভাষাবিজ্ঞানে জুইডি (Guidi), ভাষাতত্ত্বে লিটম্যানের (Littmann) সঙ্গে মেলে। এ ছাড়া তাহা হুসাইন কুরআনের ব্যাপারে ক্যাসানোভার (Casanova) মত নকল করেছেন।

তাহা হুসাইন দাবি করেন, আল আজহারে থাকাকালে তিনি কুরআনের কিছুই বোঝেননি; বরং ফ্রান্সের খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদ ক্যাসানোভার কাছেই তিনি কুরআন বুঝতে সক্ষম হন। ন্যালিনো ও লিটম্যানের অনেক প্রভাব যে তাঁর মধ্যে ছিল, এটা তাঁর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়।

উসতাজ আব্বাস ফাজলি, মাহমুদ মাহদি, ড. ফুয়াদ হাসানাইন আলি, উসতাজ আহমাদ মুহাম্মাদ জামাল, শায়খ হাসান আল বান্না প্রমুখ তাঁর সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া মুহাম্মাদ লুতফি জুমআ, উসতাজ মুহাম্মাদ খাজির হুসাইন, মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজদি, মুহাম্মাদ খুজারি এবং ড. মুহাম্মাদ আহমাদ গামরাবি তাঁর *ফিশ শিরিল জাহিলি* গ্রন্থের

---

*ওয়াল উদাবা* : ৪৫।

পর্যালোচনা করেছেন। এঁদের সবার আলোচনা-সমালোচনা নিয়ে *নাকদু কিতাবিশ শির আল-জাহিলি* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তাঁরা দাবি করেন, তাহা হুসাইন তাঁর গবেষণাকর্মে বিখ্যাত দার্শনিক দেকার্তের অনুকরণের দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আলোচিত বিষয়ে তিনি তাঁর অনুকরণ করেননি। তাঁরা আরও বলেন, তাহা হুসাইন এক বিষয় ধরে নিয়ে তার ওপর আরেকটি অনুমানকে দাঁড় করান। এভাবে অনুমানের ওপর অনুমান দাঁড় করিয়ে আবশ্যক ও অপরিহার্য ফলাফল বের করেন। যেমন : তিনি 'অসম্ভব নয়', 'অসম্ভবের কী আছে', অথবা 'অসুবিধার কী আছে' ইত্যাকার বাক্য দিয়ে কোনো আলোচনা শুরু করেন। শেষে 'এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল' অথবা এমন ধরনের বাক্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের ভাষা তথা আরবিতে জাহিলি কবিদের কবিতা থেকে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর একটি বহুলশ্রুত ঘটনা আছে। ইবনু আব্বাসের এক শিষ্য নাফি ইবনু আজরাক কুরআনের প্রায় ৮০টি জায়গার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস তাঁকে উত্তর বলার সঙ্গে সঙ্গে জাহিলি কবিদের বিভিন্ন কবিতাও শোনান। এই ঘটনাটি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসিরকারগণ বর্ণনা করেছেন। কিছুটা বিশদভাবে জানতে হলে ইমাম সুয়ুতির *আল-ইতকান* দেখা যেতে পারে।

ড. তাহা হুসাইন এই ঘটনায় দ্বিধা প্রকাশ করে বলেন, 'এ কি হতে পারে না, ইবনু আব্বাস ও নাফি ইবনু আজরাকের কাহিনিটি নকল?' এর উত্তর হলো, এমনটা হতে পারে; কিন্তু কোনো বিষয়ের সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে তা এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যায় না, বরং তাকে প্রমাণিত করতে হয়। যদি কোনো ঘটনা মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে ঘটনার বিশ্লেষণ, বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সম্যক অবগতি এবং অন্যান্য সূত্র ভালোভাবে তদন্ত করার আগে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলে তো চলবে না।

ড. তাহা হুসাইন এই গ্রন্থে জাহিলি যুগের সাহিত্যকে কৃত্রিম ও বানোয়াট বলে যেসব অভিযোগ এনেছেন, বিরোধীরাও সেই জাহিলি যুগের সাহিত্য দিয়েই তার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। যেমন তিনি দাবি করেন, জাহিলি যুগের কবিতায় ধর্ম ও চরিত্র-সংশ্লিষ্ট কোনো আলোচনা নেই। এই বক্তব্যের ব্যাপারে তাঁরা সে সময়ের যেসব কবিতায় ধর্মের এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধনের কথা এসেছে সেসব দিয়েই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বাস্তবে এঁদের সমালোচনার ফলে তাহা হুসাইনের এই চিন্তাধারার ভিত্তি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। জাহিলি যুগের কবিতার ক্ষেত্রে তাহা হুসাইন কোথায় কোথায় প্রাচ্যবিদদের মত প্রাধান্য দিয়েছেন, তা সমালোচকেরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

শাকিব আরসালানও *আশ-শিরুল জাহিলি ওয়াল ইসলাম* নামে তাহা হুসাইনের মতামত খণ্ডন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া উসতাজ মুসতাফা সাদিক রাফিয়ি *নাকদুশ*

*শিরুল জাহিলি* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন, ড. তাহা হুসাইন তাঁর অসংলগ্ন গবেষণাকে জ্ঞানকর্ম বলেছেন, প্রাচ্যবিদদের অনুকরণকে ইজতিহাদ জ্ঞান করেছেন এবং তিনি আরবি সাহিত্যের সংস্কারের প্রবক্তা হয়ে গেছেন। ড. মুহাম্মাদ বাহিও এর খণ্ডনে *ফিকরাতু কিতাবিশ শিরিল জাহিলি* নামে একটি বই লিখেছেন।

## চার. উপসংহার

ড. তাহা হুসাইনের ব্যাপারে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, মুক্তচিন্তা এবং স্বাধীন পদ্ধতিতে গবেষণার ব্যাপারে আধুনিকতাবাদী ধারা অনুসরণের অভিযোগ করা হয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে আধুনিকতার ব্যাপারে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই। এটা যেহেতু ধর্মীয় বিষয় নয়, তাই আমরা মনে করি এ ক্ষেত্রে আমাদের বিতর্ক করারও দরকার নেই। তবে এ ব্যাপারে কেউ তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে জ্ঞানমূলক জবাব দিতে কোনো বাধা নেই। মিসরের ভাষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিকরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট জবাব দিয়েছেনও—সঠিক নিয়ম এটিই।

তাঁর মুক্তচিন্তার ব্যাপারেও কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম ও মতের সীমাতিক্রম না করলে এ ক্ষেত্রেও দোষারোপের সুযোগ নেই। কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, তাহা হুসাইন শরয়ি জ্ঞানে অগভীরতা সত্ত্বেও কিছু মাসআলায় ঠুনকো মতামত প্রকাশ করেছেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী মিসরের অনেক আলিম তাঁর অনুসরণও করেছেন। এমন কিছু আলিমের নাম ইতিপূর্বে গত হয়েছে।

গবেষণারীতির ক্ষেত্রে তিনি যে দার্শনিক দেকার্তের অনুসরণ করেছেন, এই রীতিতে গবেষণায় আমরা তাঁর সঙ্গে একমত নই। এই গবেষণারীতি মূলত গ্রিকদের। মুতাজিলারা এদের অনেকটা অনুসরণ করেছে। অধিকন্তু আব্বাসি খিলাফতের সময় এ নিয়ে অনেক গবেষণাও এরা করেছিল। এই গবেষণারীতি অনুযায়ী স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন এমন কেউ যদি স্রষ্টার প্রমাণ করতে চান, তাহলে প্রথমেই স্রষ্টা নিয়ে তার সব রকমের চিন্তাভাবনা বাদ দিতে হবে; শূন্যচিত্ত হতে হবে।

আবার যদি সে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কোনোটাতেই বিশ্বাস না করে, তাহলে এর মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বের নিশ্চয়তায় পৌঁছানোর যেরূপ সম্ভাবনা থাকে; অনস্তিত্বের সন্দেহে পৌঁছানোর আশঙ্কাও সমানভাবে থাকে।

তবে কিছু বিষয় প্রমাণের ক্ষেত্রে যদিও এই গবেষণারীতির অনুকরণ সঠিক; কিন্তু অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি প্রমাণ করতে গেলে বিচ্যুতির আশঙ্কাই বেশি। তা ছাড়া তিনি বাস্তবেই দেকার্তের গবেষণারীতি অনুকরণ করেছেন কি না, তা-ও এক প্রশ্ন।



# তাওফিক আল হাকিম

## এক. জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

তাওফিক হাকিম একজন মিসরীয় সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। জন্ম ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর, আলেকজান্দ্রিয়ায়। মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই, মিসরের রাজধানী কায়রোয়।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক শেষ করে উচ্চতর আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য কায়রোর আইন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে আইন পড়া শেষ হলে যোগ দেন বিচারক হিসেবে। পিতার রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার কারণে এ বছরই আবার তাঁকে একই বিষয়ে পিএইচডি করতে প্যারিসে চলে যেতে হয়। তাঁর প্যারিসে যাওয়ার ব্যাপারে এ-ও বলা হয়, *আউদাতুর রুহ* নাটকে তিনি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার প্রতি নিজের অনুরাগ প্রকাশ করলে সামসময়িক অনেকে তাঁর প্রতি অভিযোগ তোলেন। তাই তাঁর পিতা তাকে নাটকবিমুখ এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করতে ফ্রান্সে পাঠান; কিন্তু প্যারিসে যে তিন বছর তিনি ছিলেন, পড়াশোনার প্রতি তাঁর কোনো মনোযোগ ছিল না। ফরাসি সিনেমা-থিয়েটার নিয়েই পড়ে থাকতেন। এ সময় তিনি ফরাসি, ইউরোপীয় এবং গ্রিক সাহিত্য ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত লোককাহিনি, নাটক ইত্যাদির জ্ঞান, নিয়মনীতি ও সূত্রাবলি খুব কাছ থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে কোনো ডিগ্রি না নিয়েই মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সমাজসংস্কার মন্ত্রণালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্ত হলেও এতে তাঁর মন বসেনি। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিরীক্ষাপর্ষদের প্রধান নির্বাচিত হন। তারপর ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মিউজিক ও নাটক-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর মনোনীত হন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে *দারুল কুতুবিল মিসরিয়ার* পরিচালক হন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে *মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়ার* সদস্যপদ লাভ করে আমৃত্যু এই পদে বহাল থাকেন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সম্মেলনে মিসর সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে আবারও নিজের

কাজে মনোনিবেশ করেন। তারপর মিসরের প্রসিদ্ধ পত্রিকা *আল-আহরামের* উপদেষ্টা মনোনীত হন এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে এই পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হন।

তাওফিক আল হাকিম ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *আসহাবুল কাহাফ* নাটকের মাধ্যমে বেশ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর নাটকে মিসরের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। তাওফিক ছিলেন আধুনিক আরবি সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তি তাহা হুসাইন, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, আহমাদ আমিন, সালামা মুসা, আহমাদ শাওকি, হাফিজ ইবরাহিম প্রমুখের সামসময়িক। তিনি আনুমানিক প্রায় ৯০ বছর আয়ু পেয়েছিলেন।

তাওফিক হাকিমের সমালোচকেরা তাঁর পিতা-মাতাকেও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু করেছেন। তাঁদের মতে পিতা-মাতা তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা না দেওয়ায় ধর্মীয় দিক থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বে অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেছে।

*সিজনুল উমর* গ্রন্থে তাওফিক লেখেন, তাঁর মায়ের এক বোন ছিল। তাঁর এই খালা আর তাঁর মায়ের সবসময় ঝগড়া লেগেই থাকত। দুজনের মধ্যে তিনি কখনো সদ্ভাব দেখেননি। তিনি আরও লেখেন, তাঁর মা সবসময় নিজের মতে অটল থাকতেন এবং তিনি ছিলেন উগ্র প্রকৃতির। এ ছাড়া মা তাঁকে সবসময় বলতেন, তিনি নাকি তাঁর বাবার চেয়েও বেশি মেধাবী।

তাওফিক হাকিম বলেন, কখনো কোনো দৃঢ় শপথ করতে হলে আমার মা প্রসিদ্ধ সুফি ও দরবেশ আবু ইয়াজিদ বাসতামির নামে করতেন। সন্তানদেরও এটাই শেখাতেন। তিনি আরও বলেন, যদি আমার মা রাসুল ﷺ-এর জীবনের শপথ করতেন, তবে তা ভঙ্গ করার আশঙ্কা থাকত; কিন্তু আবু ইয়াজিদ বাসতামির নামে শপথ করলে তা ভঙ্গ করার আশঙ্কা থাকত না, অবশ্যই পূরণ করতেন।

তাওফিক হাকিম তাঁর আত্মজীবনী *সিজনুল উমরে* এসব আলোচনা করেছেন। *জাহরাতুল উমর* নামেও তাঁর আরেকটি আত্মজীবনী রয়েছে।

কিছু সমালোচকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তাওফিক হাকিম তাঁর মায়ের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে আজীবন এই ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণেই তিনি *উসফুর মিনাশ শারক* গ্রন্থের উৎসর্গে জায়নাবকে রক্ষাকারিণী বলেন। *সিজনুল উমর* গ্রন্থে তাওফিক হাকিমের কিছু ঘটনা দেখে মনে হয়, তাঁর মা সন্তানের তুলনায় নিজেকে এবং নিজের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিতেন।

মায়ের ধর্মীয় অবস্থান বুঝাতে গিয়ে তিনি লেখেন, নামাজ-রোজা পালন করলেও ধর্মের বিষয়ে তিনি কিছুটা বিপরীত ও সাংঘর্ষিক অবস্থানে ছিলেন। তাই জান্নাত-

জাহান্নামের অস্তিত্বের বিষয়ে দার্শনিক আলাপও তুলতেন। পিতার ব্যাপারে তাওফিক বলেন, তিনি তাঁর যৌবনে মদপান করতেন, কিন্তু মা বিষয়টা জানার পর তা ছেড়ে দেন।

## দুই. চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশ

তাওফিক হাকিমের চিন্তাচেতনার ক্রমবিকাশে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

১. তাঁর চিন্তাধারা পরিবর্তনে বেশি অবদান লোককাহিনির। তাঁর কথামতে শৈশবে মায়ের কাছে আবু জায়েদ হিলালি ও আলিফ লায়লার কাহিনি বেশি শুনেছেন। কিছুটা বড় হওয়ার পর তিনি আরবিতে অনূদিত ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করেন। শৈশবে এসব কাহিনি পড়ার আগ্রহ ছিল তুমুল। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও অনেক সময় খাটের নিচে লণ্ঠন জ্বেলে এসব বই পড়তেন।

২. উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনার সময় তাওফিক আরবি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন। এ সময় তিনি বিখ্যাত মুতাজিলি আরবি সাহিত্যিক জাহিজ ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকের বইপত্র অধ্যয়ন করেন।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর সম্পর্ক হয় সিনেমা ও নাটকের সঙ্গে। অবশ্য উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনার সময়ই সিনেমার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল। সেই আগ্রহ থেকেই পরবর্তীকালে তিনি মিসরের সবচেয়ে বড় নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এ ছাড়া কায়রোতে থাকাকালে গায়ক ও নাট্যাভিনেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়। ফ্রান্সে আইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য যাওয়ার পর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ইউরোপীয় ও ফরাসি সংস্কৃতির সঙ্গে। সেখানে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) আরবিতে অনূদিত বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তারপর অভিধানের সহায়তায় ফরাসি ভাষায়ই ফরাসি সাহিত্য পাঠ করতে শুরু করেন। চিন্তাগত উন্নতিতে ফরাসি সভ্যতা-সংস্কৃতির অবদানই তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠেও তিনি বেশ প্রভাবিত হন। নিজের বক্তব্য মতে, তিনি নিজের রচনায় কুরআন, তাওরাত ও ইনজিল প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর নির্মিত প্রসিদ্ধ নাটক *সুলায়মান আল-হাকিমে*র ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এটি নির্মাণে আমি মৌলিকভাবে কুরআন, তাওরাত ও আলিফ লায়লার সাহায্য নিয়েছি।'

## তিন. ধোঁয়াশাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

তাওফিক হাকিমের বিজ্ঞ সমালোচকেরা তাঁকে একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের সন্দেহপূর্ণ ও ধোঁয়াটে ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। খোদ তাওফিক হাকিম লিখেছেন,

'বাহ্যিকভাবে আমি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করলেও আমার ভেতরে কিন্তু উপাস্য, ভিন্নতর বিশ্বাস এবং উন্নত আদর্শ রয়েছে। আমার যত দুশ্চিন্তা এই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের জন্যই।'

এই বৈপরীত্য তাওফিক হাকিমের ধর্মীয় জীবনেও লক্ষ করা যায়। নিজে যেমনটি বলেছেন, যুবক বয়সে তিনি বাবার ভয়ে সাহরি খেতেন ঠিকই; কিন্তু পরে কাউকে না জানিয়ে রোজা ভেঙে ফেলতেন। সমবয়সি মেয়েদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, হস্তমৈথুন, অবৈধ সম্পর্ক এবং মদপানের কিছু ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

*জাহরাতুল উমর* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, জার্মানিতে তিন মাস থাকাকালে তিনি এক নর্তকীর সঙ্গে একই খাটে থেকেছেন। সমালোচকেরা বলেন, গুনাহ যদিও সবারই হয়; কিন্তু তাওফিক হাকিম ছিলেন 'মুজাহির'। যে পাপ করে তা গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করে এবং কোনো অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রকাশ করে না, হাদিসের পরিভাষায় তাকে 'মুজাহির' বলে। এদেরকে হাদিসে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আল্লাহ এমন পাপীকে ক্ষমা করেন না।

## চার. লিখিত গ্রন্থ ও সাহিত্যকর্ম

তাওফিক হাকিমের বেশির ভাগ কাজই মিসরীয় নাটক ও গল্প নিয়ে। তাঁকে মিসরের সবচেয়ে বড় নাট্যকার ও গল্পকার মনে করা হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ নাটকসমূহের মধ্যে *আহলুল কাহাফ, শাহরাজাদ, মুশকিলাতুল হুকম, বিজমালিয়্যুন, সুলায়মান হাকিম, আল-মালিক উয়াদিব, আল-আইদি আন-নাইমা, আস-সাফাকাহ* এবং *লুবাতুল মাওত* উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাসের মধ্যে *আউদাতুর রুহ, উসফুর মিনাশ শারক, হিমারুল হাকিম, আর-রিবাতুল মুকাদ্দাস* এবং *আশআব* তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।

ইসলামি ভাবধারায় লিখিত তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে *আত-তাআদুলিয়া, আত-তাআদুলিয়া মাআল ইসলাম, আরিনিয়াল্লাহ, তাহতা শামসিল ফিকর* এবং *আল-আহাদিস আল-আরবাআ* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু আলিম এসব গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, তাওফিক হাকিমের চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ এবং ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এসব ছাড়াও তিনি *মুখতারু তাফসিরিল কুরতুবি* নামে *তাফসিরে কুরতুবির* এক সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।

## পাঁচ. চিন্তাধারা ও মতবাদ

কিছু চিন্তাধারা ও মতামতের কারণে তাওফিক হাকিমের প্রতি আধুনিকতাপ্রীতি ও পাশ্চাত্য অনুকরণের অভিযোগ করা হয়। তাঁর প্রতি অভিযোগের একটা হলো, তিনি *আসহাবুল কাহাফ* ও *সুলায়মান হাকিম*সহ কিছু নাটকে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনি ও ঘটনাবলির বদলে বাইবেলের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আগেকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাহিনি ও ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল, বানোয়াট, পরিত্যাজ্য বর্ণনাকে সমানভাবে গ্রহণ করেছেন; এতে কোনো অসুবিধা মনে করেননি।

দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, তিনি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এর প্রভাব তাঁর বিভিন্ন নাটকে বিশেষত *আসহাবুল কাহাফ* ও *আউদাতুর রুহ* নাটক দুটিতে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। কিছু সালাফি আলিম তাঁর রচনা ও বিভিন্ন নাটকে ওয়াহদাতুল উজুদ মতাদর্শ প্রচারের অভিযোগ তুলেছেন।

তাওফিক হাকিমের প্রতি আরও একটা অভিযোগ হলো, শেষ বয়সে তিনি মিসরীয় পত্রিকা *আল-আহরামে* 'আমি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে' শিরোনামে একটা কাল্পনিক কথোপকথন প্রকাশ করতে শুরু করেন। এতে অবশ্যই তিনি আল্লাহর সঙ্গে শিষ্টাচারহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত। এই আলাপচারিতায় তিনি প্রথমে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন, আবার তিনিই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজের কাল্পনিক ও নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত উত্তর প্রদান করেন। আলিমদের বক্তব্য হলো, কেউ দুআয় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলতে পারে; কিন্তু নিজের কথা ও উত্তরকেই আল্লাহর বক্তব্য আখ্যা দিয়ে কথোপকথন আকারে তা প্রকাশ করা আল্লাহ তাআলার প্রতি অপবাদ দেওয়ারই নামান্তর। যেহেতু তাওফিক হাকিম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উত্তর দিয়েছেন, তা কিছুতেই আল্লাহর নয়, তাই এর সম্পর্কও আল্লাহর প্রতি করা যাবে না।

তাওফিক হাকিমের ব্যাপারে এটাও বলা হয় যে, তাঁর মতে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকেরা সৃষ্টিজীব নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণার ফলে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেবেন। আর জান্নাতে প্রবেশের জন্য কালিমাতুশ শাহাদাহ পাঠ ও এর স্বীকৃতিদান আবশ্যক নয়। এ ছাড়া তাঁর ব্যাপারে আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকারের আপত্তিও অনেকে করেছেন।

তাওফিক হাকিম প্রায়ই বলতেন, আরব ও ইয়াহুদিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়ানো উচিত। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ফ্রান্সে সদর দপ্তর করে 'আরব-ইসরাইল সংঘ' নামে একটি সংগঠনও করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর মতে, ধর্মের সূচনা হয়েছে মানুষের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে; আর সাধারণ মানুষ এই ভয় দূর করতে দুষ্ট আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে। ফলে গণকের ধর্ম আবিষ্কৃত হয়। তারপরে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা মানুষকে রাসুল ও আসমানি কিতাব প্রভৃতি পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন।

তাওফিক হাকিমের মতে সব ধর্মই মূলে এক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তাই স্ব স্ব স্থানে প্রত্যেক ধর্মই সঠিক। এই মতাদর্শের ভিত্তিতে তিনি সকল ঐশীধর্মের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির ডাক দেন।

ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের সমতার প্রবক্তা ছিলেন তাওফিক। তিনি ইসলামি শরিয়তের আধুনিক রূপায়ণের দাবি করতেন। ফেরেশতা আর জিনদের ব্যাপারেও অদ্ভুত কিছু মন্তব্য করেছেন তিনি। ড. আলি সাইয়িদ আহমাদ সাইয়িদ *ফিকরু তাওফিক আল-হাকিম ফি মিজানিল ইসলাম* গ্রন্থে তাওফিক হাকিমের এসব চিন্তাধারার বিশদ পর্যালোচনা করেছেন।

## ছয়. উপসংহার

তাওফিক আল হাকিমের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে বোঝা যায়, দীনের ব্যাপারে তাঁর জানাশোনা ও জ্ঞান একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং নেহাত অগভীর। তাই কোনোক্রমেই ইসলামি চিন্তাধারা ও মতাদর্শের মতো সূক্ষ্ম এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে তিনি নিজের মতামত ও চিন্তাধারা প্রকাশের অধিকার রাখেন না। শুধু আরবি ভাষা ও সাহিত্য পর্যন্ত তাঁর কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ থাকলে আলিমদের সম্ভবত তাঁর সমালোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। এসব লোকদের সমালোচনা আলিমরা তখনই করেন, যখন এঁরা নিজেদের রাজনীতি, সাহিত্য বা সামাজিক ও পার্থিব জীবনযাপনের পাশাপাশি উম্মাহর পথপ্রদর্শকও হতে চান। যখন ইসলামি চিন্তাধারার মতো সূক্ষ্ম ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতাদর্শ পরিবর্তনের মাধ্যম হন, তখনই মূলত এঁদের সমালোচনা করা হয়।





# ড. ইউসুফ কারজাবি

## এক. জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

ড. ইউসুফ আল কারজাবি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর মিসরের সাফাত তুরাব অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। দু-বছর বয়সে পিতৃহারা হলে চাচার কাছে লালিতপালিত হন। ১০ বছরে উপনীত হওয়ার আগেই কুরআনুল কারিম হিফজ সম্পন্ন করেন, রপ্ত করেন তাজবিদের জ্ঞানও। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন আল আজহারের অধীন *মাহাদুল উলুমিল ইসলামিয়া* থেকে। তারপর আল আজহারের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে *মাহাদ আদ-দিরাসাত আল-আলিয়াহ* থেকে উচ্চতর আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ডিপ্লোমা করেন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে উসুলুদ্দিন অনুষদ থেকে এমএ সম্পন্ন করেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে একই অনুষদ থেকে *আজ-জাকাহ ওয়া আসারুহা ফি হাল্লিল মাশাকিল আল-ইজতিমাইয়া* তথা 'জাকাত এবং সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে এর অবদান' শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।[১৮]

## দুই. পরিবার

ড. কারজাবি দুটি বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর নাম ইসআদ আবদুল জাওয়াদ। তিনি মিসরি। এই স্ত্রীর ঘরে তাঁর তিন ছেলে যথাক্রমে আবদুর রাহমান, উসামা ও মুহাম্মাদ; আর চার মেয়ে যথাক্রমে ইলহাম, সিহাম, আলা ও আসমা। এঁদের মধ্যে মেয়ে ড. ইলহাম কারজাবি ব্রিটেনের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটমিক ফিজিক্সে ডক্টরেট করেছেন। দ্বিতীয় মেয়ে ড. সিহাম কারজাবি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফটোকেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করেন।

প্রথম ছেলে আবদুর রাহমান ইউসুফ মিসরের খ্যাতনামা কবি। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মাকাসিদুশ শারিয়া বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন। রাজনীতিতেও তিনি

[১৮] ড. ইউসুফ কারজাবি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় ইনতিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। —*সম্পাদক*।

যথেষ্ট সরব। দ্বিতীয় ছেলে উসামা ইউসুফও আমেরিকা থেকে ডক্টরেট করেছেন। তিনি মিসরে কাতারের উপ-রাষ্ট্রদূত হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছেন। তৃতীয় ছেলে মুহাম্মাদ ইউসুফ আবদুল্লাহ কাতার গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মকর্তা। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম আয়েশা, তিনি মরোক্কান বংশোদ্ভূত। ইউসুফ কারজাবি তাঁকে আশির দশকের মাঝামাঝিতে বিয়ে করেন।

## তিন. বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের দায়িত্ব

শায়খ কারজাবি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফিকহ অ্যাকাডেমি, গবেষণা পরিষদ এবং শিক্ষাবোর্ডের প্রধান ও সদস্য ছিলেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাতারে হিজরত করে সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ অ্যান্ড শারিয়া ফ্যাকাল্টির ভিত্তি স্থাপন করেন। পাশাপাশি এই অনুষদের প্রথম ডিন নির্বাচিত হন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। এ বছরই কাতারে মারকাজু বুহুসিস সুন্নাহ ওয়াস সিরাতিন নাবাবিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন এবং আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন।

এ ছাড়া তিনি ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে বসবাসরত মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আয়ারল্যান্ডের ইউরোপিয়ান ফিকহি বোর্ডের প্রধান এবং মিসরের আন্তর্জাতিক ফিকহ অ্যাকাডেমি মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়ার সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ.-ও একসময় এর সদস্য ছিলেন। শায়খ কারজাবি মক্কার *রাবিতাতু আলামিল ইসলামি*র অধীনস্থ *মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি*রও সদস্য এবং কাতারের কাতার ব্যাংক ও বাহরাইনের ফায়সাল ইসলামি ব্যাংকের শরয়ি উপদেষ্টা-পরিষদের প্রধান ছিলেন।

ইউসুফ কারজাবি সুইজারল্যান্ডের আত-তাকওয়া ব্যাংকের অন্যতম শেয়ারহোল্ডার ও শরিয়া উপদেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দেয় এবং নিরাপত্তাপরিষদ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আল কায়দার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ করে। তবে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট এই আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

কারজাবি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের অন্যতম ট্রাস্টি। শায়খ আবুল হাসান আলি নদবিও একসময় এই বিভাগের প্রধান ছিলেন। এ ছাড়া আফ্রিকায় ইসলামের দাওয়াত স্বাধীনভাবে প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত *মুনাজ্জামাতুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া*র ট্রাস্টি ছিলেন। কুয়েতে প্রতিষ্ঠিত জাকাতের আন্তর্জাতিক

সংস্থা *আল-হাইয়াতুশ শারইয়া আল-আলামিয়া লিজ-জাকাহর* উপ-প্রধান ছিলেন। তিনি দুবাইয়ের ইসলামি ব্যাংকের শরিয়া উপদেষ্টা এবং কাতার ইসলামি ব্যাংক, কাতার ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকের শরয়ি উপদেষ্টা-পরিষদের প্রধান ছিলেন। এ ছাড়া মিসরের ফায়সাল ইসলামি ব্যাংকের নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং মিসর ইসলামি অর্থনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন।

The Message (১৯৭৬)-এর মতো শত মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক ইসলামি চলচ্চিত্র Prophet Muhammad-এরও তিনি শরয়ি উপদেষ্টা ছিলেন।

## চার. মুসলিম বিশ্বে কারজাবির প্রভাব

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আলিমদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী, কারজাবি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। *আল-জাজিরা* টেলিভিশন থেকে প্রচারিত তাঁর 'আশ-শারিয়াতু ওয়াল-হায়াত' অনুষ্ঠানটি আরববিশ্বে অত্যন্ত পরিচিত একটি টিভি অনুষ্ঠান ছিল। এক জরিপ অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি। ইংরেজি ভাষায় ফাতওয়ার প্রসিদ্ধ ওয়েবসাইট *ইসলাম অনলাইন*[১১]-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ২০০৮ সালে *ফরেন পলিসি* নামের একটি ম্যাগাজিনে বর্তমান বিশ্বের অত্যন্ত গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ২০ জন বিদ্বানের মধ্যে তাঁকে তৃতীয় আখ্যা দেওয়া হয়।

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে রাসুল ﷺ-এর প্রতি ধৃষ্টতাপ্রদর্শনকারী ডেনমার্কের *ইয়োল্যান্ডস বোস্টন* পত্রিকার সম্পাদক ফ্ল্যামিং রোস আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম-দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কাতারের রাজধানী দোহায় এলে কারজাবি কাতার সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'সরকার কী করে তাকে কাতারে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে?' সরকার তখন এই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করে যে, তার সমালোচনার ব্যাপারে তাদের অবগতি ছিল না। শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি তাঁর *ওয়াসাইলুল ইলাম* গ্রন্থে মুসলিম বিশ্বে শায়খ কারজাবির প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সে সঙ্গে তিনি কারজাবির নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসাও করেন।

## পাঁচ. আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও কারজাবি

ড্রিম চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারজাবি বলেন, ইমাম হাসান আল বান্নার সঙ্গে আমি তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, 'এক সময় আমাকে

---

[১১] ইসলাম অনলাইনের ওয়েবসাইট—https://islamonline.net

ইখওয়ানের নেতৃত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু একটি জামাআতের নেতৃত্ব গ্রহণ না করে সমগ্র উম্মাহর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হওয়াই ছিল আমার অধিক পছন্দের। আমি ইখওয়ানকে পছন্দ করি, একে সিরাতে মুসতাকিমের অধিক নিকটবর্তী দল মনে করি।'

১৯৭৬ সালে কারজাবিকে দ্বিতীয়বারের মতো ইখওয়ানের নেতৃত্ব গ্রহণের কথা বলা হলেও তিনি গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে বাদশাহ ফারুকের শাসনামলে কারজাবিকে ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর জামাল আবদুন নাসিরের সময়েও তিন বার তিনি কারান্তরীণ হন—১৯৫৪-তে দুবার এবং ১৯৬৩-তে একবার।

*ইখওয়ানুল মুসলিমুন : দাওয়াত, দীক্ষা এবং সংগ্রামের সত্তর বছর* নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ইখওয়ানের সূচনাকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সংগঠনটির ৭০ বছরের কার্যক্রমের বিশদ আলোচনা করেছেন।

## ছয়. দাওয়াত ও আন্দোলন

শায়খ কারজাবির ভাষ্যমতে, তিনি ১৫ বছর বয়সে দাওয়াত ও আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু করেন। বিভিন্ন জায়গায় কবিতাও আবৃত্তি করতেন। *নাফাহাত ওয়া লাফাহাত* গ্রন্থে সেসব কবিতা সংকলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে কিছু কবিতা উল্লেখ করছি, যেগুলো তিনি কারান্তরীণ থাকাকালে সহকর্মীদের সঙ্গে আবৃত্তি করেছিলেন। প্রায় তিন শতাধিক শ্লোক সম্বলিত *মালহামাতুল ইবতিলা* নামক প্রসিদ্ধ একটি কাসিদার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হলো। পঙ্ক্তিগুলোয় কারজাবির ইমানি জজবা, চিন্তার পরিপক্বতা ও বৈপ্লবিক চেতনা খুব ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে :

*আল্লাহর শপথ, অত্যাচার আর নিপীড়ন কখনো*
*এই দাওয়াতকে ব্যর্থ করতে পারবে না।*
*ইতিহাস আমার শপথের সাক্ষী, যদি আমার হাতে শিকল পরাও,*
*বুকে কষাঘাত করো, অথবা কাঁধে তরবারির আঁচড় কাটো;*
*আমার চেতনা, ইমান ও দৃঢ় বিশ্বাস কিছুতেই হারাবে না।*
*আমার নুর আমার হৃদয়ে এবং আমার হৃদয় আমার রবের হাতে;*
*আর আমার রবই আমার রক্ষাকারী এবং সহায়তাকারী।*
*আমার আকিদা আর বিশ্বাস নিয়েই আমি আজীবন বেঁচে থাকব*
*দীনের জাগরণে সহাস্যবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।*

## সাত. ইসরাইল ও আমেরিকা বিষয়ে কারজাবি

ইসরাইল ও ইসরাইলি ইয়াহুদিদের ব্যাপারে শায়খ কারজাবির অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জুলাই কাতারে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি'র ১৪তম অধিবেশনে শায়খ কারজাবি ইসরাইলি সেনাবাহিনী ও নাগরিক উভয়ের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা বৈধ বলে ফাতওয়া দেন। তিনি বলেন, ইসরাইলি নারী ও শিশুদেরও ব্যাপকভাবে হত্যা করা বৈধ। কারণ, তারা একদিকে 'হারবি কাফির' এবং অপরদিকে সেনাবাহিনীর সামরিক প্রতিবেশী বলে বিবেচিত। ইসরাইলি শিশুদের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হলো, ইসরাইলি প্রশাসনের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে অবশ্যই এরা একদিন 'হারবি কাফির' হবে। তাই আত্মঘাতী আক্রমণে শিশু নিহত হলেও কোনো সমস্যা নেই, তা বৈধ। অবশ্য যেসব ইয়াহুদি তাওরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তারা এর বাইরে।

উল্লেখ্য, আত্মঘাতী হামলা-সংক্রান্ত এই ফাতওয়া তিনি ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের ক্ষেত্রেই দিয়েছেন। বিপরীতে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ কাতারে বোমা বিস্ফোরণের পর তিনি এক ফাতওয়া জারি করে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক হত্যার নিন্দা করেন।

২০০৪ সালের ১৪ই জানুয়ারি *ইসলাম অনলাইন ওয়েবসাইটে* প্রদত্ত এক ফাতওয়ায় তিনি বলেন, মার্কিন ও ইসরাইলি পণ্য বয়কট করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। এসব পণ্য ক্রয়ে আমাদের দেওয়া অর্থ আমাদের ভাইদের বুকেই গুলি হয়ে ফিরবে। তিনি আরও বলেন, মার্কিন অথবা ইসরাইলি পণ্যের প্রচার করাও মুসলিমদের জন্য শরিয়ামতে বৈধ নয়।

ড. কারজাবি বলেন, আমেরিকা বর্তমানে দ্বিতীয় ইসরাইল; আর ইসরাইলকে আমেরিকার আর্থিক সহায়তা জায়নবাদকে আর্থিক সহায়তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কারজাবি প্রশ্ন তুলে বলেন, মার্কিন গাড়ি উপলভ্য থাকার সময় যদি একই মানের জাপানি গাড়ি বিদ্যমান থাকে, তখন মার্কিন গাড়ি কেনা কী করে বৈধ হয়? তিনি মার্কিন ও ইসরাইলি পণ্য ক্রয়কে কবিরা গুনাহ আখ্যা দেন। এ-ও বলেন, ইসরাইলের কথিত জায়নবাদ মুসলিমরা কোনোক্রমেই সমর্থন করতে পারে না।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন কাতারে এলে কারজাবি বলেন, অ্যারিয়েল শ্যারনকে কাতারে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। এই জালিম খুনির সঙ্গে যে হাত মেলায়, আমি বলি—সে যেন ৭০ বার হাত ধোয়।

ইসরাইলের ব্যাপারে এমন কঠোর অবস্থানের কারণে কারজাবির ইসরাইলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকাও তাঁর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ইংল্যান্ড তাঁর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে।

শায়খ কারজাবি ইসলামি রাষ্ট্রে জিম্মিদের অধিকারের কথা স্বীকার করে বলেন, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান অথবা মূর্তিপূজকদের সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করতে ইসলাম নিষেধ করেনি। তবে মুসলিমদের সঙ্গে তারা যেন যুদ্ধে না জড়ায়।

## আট. কারজাবি ও ইরাকযুদ্ধ

ইরাকে মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে শায়খ কারজাবিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এই জিহাদ বৈধ; বরং মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ইরাকি ও প্রতিবেশী মুসলিমদের জন্য ফরজে আইন।

ইরাকে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের বিরুদ্ধেও এ জিহাদ হবে কি না, জানতে চাইলে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, ইরাকে মার্কিন নাগরিক কোথায়? অর্থাৎ ইরাকে থাকা প্রতিজন মার্কিনই হারবি কাফির; আর তারা যুদ্ধ করতেই এখানে এসেছে।

এই ফাতওয়ার বিশ্লেষণে *আশ-শারকুল আউসাত* পত্রিকায় বলা হয়, কারজাবির মতে মার্কিন নাগরিক হত্যা করা বৈধ; আর কিতাল তাঁর মতে ফরজে আইন। পত্রিকায় এই সংবাদ প্রচারের পর তিনি দ্বিতীয়বার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেন, মার্কিন নাগরিক হত্যা করা বৈধ এ বক্তব্য তিনি দেননি; বরং ইরাকে কোথায় মার্কিন নাগরিক আছে, সে প্রশ্ন তিনি করেছেন।

যাই হোক, তাঁর ফাতওয়া অনুযায়ী হারবি তথা মুসলিমদের রিবুদ্ধে যুদ্ধরত মার্কিন নাগরিক হত্যা করা বৈধ। এবার কোন মার্কিন নাগরিক হারবি আর কোন নাগরিক হারবি নয়, সে বিষয়ে ভিন্নমত হতে পারে। অবশ্য তিনি এটাও বলে দিয়েছেন যে, ইরাকে বসবাসরত সব মার্কিন নাগরিকই হারবি তথা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলে গণ্য হবে।

অনুরূপ কিতাল ফরজে আইন হওয়ার বিষয়ে প্রদত্ত ফাতওয়ার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কিতালের শাব্দিক অর্থ নয়, বরং মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সব ধরনের প্রতিরোধকেই তিনি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজে আইন বলে বুঝিয়েছেন।

সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু জিবরিন প্রদত্ত 'মুসলিমদের পক্ষে ইরানি শিয়াদের ও হিজবুল্লাহর সদস্যদের জন্য দুআ অথবা এদেরকে সহায়তা করা বৈধ নয়' শীর্ষক ফাতওয়ার জবাবে কারজাবি ইসরাইলের বিরুদ্ধে শিয়া ধর্মাবলম্বী হিজবুল্লাহকে সমর্থন ও সহায়তা করা বৈধ মর্মে ফাতওয়া প্রদান করেন। তিনি বলেন, কাফির ও জালিম ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে কালিমা পাঠকারী ও বিদআতি শিয়াদেরকে সহায়তা কেবল বৈধই নয়, যুক্তির দাবিও বটে।

আফগানিস্তানে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি অপসারণের সময় প্রথমদিকে তিনি তালেবানের সমালোচনা করলে তাঁর ব্যাপারে 'মূর্তিপূজক' হওয়ার আপত্তি তোলা হয়। পরবর্তী সময়ে তালেবানের কোনো এক প্রতিনিধি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে দ্বিতীয়বার পর্যালোচনাপূর্বক তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন।

সামসময়িক জিহাদ নিয়ে শায়খ কারজাবির এক ফাতওয়ায় আলিমরা তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে কারজাবি বলেন, মার্কিন সেনাদলে কর্মরত মুসলিমদের জন্য রাষ্ট্রের তিরস্কার থেকে বাঁচতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে আফগানিস্তানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ। অবশ্য পরে খ্যাতিমান আলিম ও দায়ি সালাহুদ্দিন সুলতান জানিয়েছেন যে, কারজাবি তাঁর এ মত পরে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

গাজায় চলমান যুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আব্বাসের মদদ প্রমাণিত হলে কারজাবি তাঁকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার কথা বলেন। এ ঘটনায় ফিলিস্তিনের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ইমামরা তাঁর তীব্র নিন্দা জানান।

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রায় ২,৫০০ উদারমনা মুসলিম শায়খ কারজাবির বিরুদ্ধে এক সিদ্ধান্ত পাশ করতে গিয়ে তাঁকে 'শায়খুল মাউত' আখ্যা দেন। এ ছাড়া তাঁর প্রতি মৌলবাদ ও অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তোলেন।

## নয়. লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম

শায়খ কারজাবি জীবনের প্রায় সকল অনুষঙ্গ নিয়ে লিখেছেন—আকিদা, বিভিন্ন মতবাদ, ইবাদত, লেনদেন, জীবনযাপন, রাজনীতি এবং জীবন পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা, সবকিছুই। তাঁর কিছু বই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শায়খুল আজহার মাহমুদ শালতুতের অনুরোধে তিনি *আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল ইসলাম* গ্রন্থ রচনা করেন। বলা হয়, মুসলিম বিশ্বে এর মতো গ্রন্থ দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। উসতাজ মুহাম্মাদ মুবারাক গ্রন্থটিকে এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আখ্যা দেন। শায়খ তানতাবি মক্কায় তাঁর ছাত্রদের এটি নিয়মিত পড়াতেন। আল্লামা আলবানি এই গ্রন্থের হাদিসসমূহের তাখরিজ ও তাহকিক করেছেন। স্রেফ আরবি ভাষাতেই এই গ্রন্থের ৪০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ইংরেজি, জার্মান, উর্দু, তুর্কি, মালয়েশিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, চাইনিজ, স্প্যানিশ, সোয়াহিলি ভাষাসহ গ্রন্থটি আরও কিছু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[২০] এ গ্রন্থের কিছু বক্তব্য নিয়ে আলিমরা সমালোচনাও করেছেন। *আল-ইলাম ফি নাকদি কিতাবিল হালাল ওয়াল হারাম* নামে সৌদি আরবের বরেণ্য আলিম শায়খ সালিহ আল ফাওজান আলাদা করে একটি সমালোচনামূলক বইও লিখেছেন।

[২০] ইতিমধ্যে বইটির একাধিক বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

শায়খ কারজাবির *ফিকহুজ জাকাত* গ্রন্থকেও জাকাতের পুরনো ও নতুন মাসআলাসমূহের এক বিশ্বকোষ বলা হয়। মাওলানা মওদুদি রাহ. এই গ্রন্থকে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আখ্যা দেন।

শায়খ কারজাবির অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে *ফাওয়ায়িদুল বুনুক হিয়ার-রিবা আল-হারাম, আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনজিবাত ওয়াত তাসাউব, ফিকহুজ জাকাহ, মালামিহুল মুজতামাইল ইসলামি আল্লাজি নানশুদুহু, আল-ইমান ওয়াল-হায়াহ, আন-নিয়্যাহ ওয়াল-ইখলাস, আল-ইসলাম ওয়াল-আলমানিয়া ওয়াজহান লিওয়াজহিন, আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া হুমুমুল ওয়াতানিল আরাবিয়িল ইসলামি, ফি ফিকহিল আওলাবিয়াত, আওলাবিয়াতুল হারাকাতিল ইসলামিয়া ফি মারহালাতিল কাদিমাহ, আল-হায়াতুর রাব্বানিয়া ওয়াল-ইলম, আত-তাওয়াক্কুল, মাদখাল লি মারিফাতিল ইসলাম, মিন আজলি সাহওয়াতিন রশিদাহ তুজাদ্দিদুদ দিন ওয়া তানহাজ বিদ-দুনইয়া, গাইরুল মুসলিমিন ফিল-মুজতামাইল ইসলামি, ফিকহুস সিয়াম, আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া বাইনাল জুহুদ ওয়াত তাতাররুফ, তারিখুনা আল-মুফতারা আলাইহ, আল-ইসলাম ওয়াল ফান্ন, আদ-দিন ওয়াস সিয়াসাহ, মাআ আয়িম্মাতিত তাজদিদ ওয়া রুওয়াউহুম ফিল ফিকরি ওয়াল ইসলাহ, নাহনু ওয়াল-গারব, ফিকহুল লাহব ওয়াত-তারউইহ, আল-কুদস কাজিয়্যাতু কুল্লি মুসলিম, বাইয়িনাতুল হাল্লিল ইসলামি ওয়া শুবুহাতুল আলমানিয়্যিন ওয়াল মুতাগাররিবিন, জাহিরাতুল গুলুও ফিত-তাকফির, আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া বাইনাল ইখতিলাফিল মাশরু ওয়াত তাফাররুকিল মাজমুম, হাকিকাতুত তাওহিদ, শারিয়াতুল ইসলাম সালিহাহ লিকুল্লি জামান ওয়া মাকান* এবং *মাদখাল লি দিরাসাতিস সুন্নাতিন নাবাবিয়া* ইত্যাদি।

## দশ. ফাতওয়া ও মতামত

২০০৮ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত এক কনফারেন্সে শায়খ কারজাবি গ্রিনওয়াচের পরিবর্তে মক্কা মুকাররামার সময়কে বিশ্বের মান সময় নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ভৌগোলিক বিবেচনায় মক্কা হলো বিশ্বের কেন্দ্র; অথচ বর্তমানে সব দেশের সময়ের ভিত্তি গ্রিনওয়াচ।

কারজাবি ধূমপানকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ উল্লেখ করে একে হারাম বলেছেন। এর অবৈধতার প্রধান কারণ হিসেবে সম্পদ বিনষ্টকরণ এবং শারীরিক ক্ষতিসাধনের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধূমপান তথা সিগারেট সেবনে শারীরিক লাভ না ক্ষতি হবে, এটা বলা কোনো মুফতি অথবা ফকিহের কাজ নয়; বরং চিকিৎসক ও

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ধূমপান যে শারীরিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর এবং অসংখ্য রোগের কারণ, এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। তাই এটি হারাম। সুতরাং 'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না' কুরআনের এ আয়াত থেকে ধূমপান হারাম প্রমাণিত। আবার, 'তোমরা অপব্যয় করো না' অনুসারেও ধূমপান অবৈধ সাব্যস্ত হয়। কারণ, কুরআন অপব্যয়কে যখন অবৈধ আখ্যা দিয়েছে, ধূমপান তো সম্পদ অপচয়ের একটা পদ্ধতি; কাজেই এটা হারাম। আবার 'নিজের ক্ষতি করো না, অন্যেরও ক্ষতি করো না'—হাদিস উল্লেখ করেও কারজাবি ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন।

ইসলামি ব্যাংকিং সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে কারজাবি বলেন, ইসলামি ব্যাংকিংয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনার চেয়েও প্রায়োগিক কার্যক্রমে মনোযোগী হওয়া শুধু প্রশংসনীয় পদক্ষেপই নয়, সময়ের দাবিও। তিনি বলেন, আগে একটা সময় ছিল যখন ব্যাংকগুলোর সুদ ছাড়া চলতে পারা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে ব্যাংকিংয়ে সুদের অবৈধতা ও অপকৃষ্টতা খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হয়। ফলে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনা সামনে আসতে থাকে। অবশেষে সময়ের তৃতীয় পর্যায়ে এসে প্রায়োগিকভাবে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখন তৃতীয় পর্যায়ে আছি এটা বলা যায় না; আবার কোনো ইসলামি ব্যাংকও এ দাবি করতে পারে না যে, তারা শতভাগ ইসলাম ও শরিয়তের ওপর রয়েছে।

কারজাবির মতে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের চতুর্থ পর্যায় এখনো আসেনি, তবে এ পর্যায়ে ব্যাংকগুলো শরিয়তের সমূহ মূলনীতি যথাসাধ্য রক্ষা করে চলবে। অতএব, এ বিবেচনায় বিদ্যমান ইসলামি ব্যাংকিং বাস্তব ইসলামি ব্যাংকিংয়ে রূপান্তরিত হওয়া নিঃসন্দেহে ইতিবাচক উন্নতির একটি ধাপ। তাই এই পরিবর্তনের দিকে এখন আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা চাই।

বিমা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে কারজাবি বলেন, অধিকসংখ্যক ফকিহ জীবনবিমা ও ব্যবসায় বিমা হারাম আখ্যা দেন। আমার মতেও এটি হারাম ও অবৈধ।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দার্শনিক, জ্ঞানী, রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি সড়কে, ঘরে অথবা সাধারণ স্থানসমূহে স্থাপন করা হারাম। যদি এই ভাস্কর্য এমন কোনো ব্যক্তির হয় যাঁর সঙ্গে বিশেষ কোনো আকিদা অথবা সম্মানের বিষয় সম্পৃক্ত থাকে; তাহলে এর অবৈধতা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তবে শিশুদের খেলনা ও পুতুল এ বিধানের বাইরে।

পাশ্চাত্য ও ইউরোপ তথা অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের বসবাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

আমার মতে এই বাসস্থান নির্বাচন কিছু পূর্বশর্তের ভিত্তিতে জায়িজ। কারণ সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য এসব রাষ্ট্রে বসবাস যদি হারাম হতো, তাহলে ইসলামপ্রচার হতো কীভাবে? তিনি বলেন, যাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে পাশ্চাত্যের কিংবা অন্য কোনো এলাকার এমন কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করেন যেখানে স্বাধীনভাবে ও নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করতে পারেন না, তাঁদের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করা ওয়াজিব।

কিতাবি (মূলানুগ ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান) নারীদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে কারজাবি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মতে কিতাবি নারীদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ। অবশ্য অল্পসংখ্যক হানাফি আলিম এ ক্ষেত্রে হারবি ও গায়রে হারবির পার্থক্য করেছেন। শায়খ কারজাবি এই পার্থক্যে আরেকটু যোগ করে বলেন, হারবি নারী ইয়াহুদি অথবা খ্রিষ্টান যাই হোক, তার সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে সে সচ্চরিত্রা কি না, সেটাও বিবেচ্য নয়। বিপরীতে অ-হারবি নারী সচ্চরিত্রা হলে তাকে বিয়ে করা জায়িজ। এ ছাড়া তিনি ইসরাইলি ইয়াহুদি নারীদের সঙ্গে বিয়েকে বিনা বাক্যে হারাম বলেছেন। কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে ইসরাইলিরা হারবি কাফির।

আমেরিকায় আমিনা ওয়াদুদ কর্তৃক পুরুষদের নামাজের ইমামতির বিষয়ে ড. কারজাবি বলেন, উম্মাহর ১৪০০ বছরে প্রথমবার এই নারী এমন দুঃসাহস করেছে—সে পুরুষদের নামাজের ইমামতি করেছে এবং জুমুআর নামাজ পড়িয়েছে। তিনি বলেন, ফরজ ও জুমুআর নামাজের ইমামতি শুধু পুরুষেরাই করতে পারে। হ্যাঁ, তারাবির সালাত ইত্যাদিতে কোথাও যদি শুধু নারীরাই থাকে, সেখানে নারীর ইমামতিতে অসুবিধা নেই। কারজাবি আরও বলেন, কোনো মহিলার জন্য ফরজ নামাজের ইমামতি করা বৈধ নয়, এই মর্মে আট মাজহাবের ঐকমত্য রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে কারজাবি মহিলাদের হাত, পা এবং চেহারাকে সতরের বহির্ভূত বলেন। তাঁর ভাষ্যমতে মহিলাদের চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই মহিলারা নিজেদের চেহারা খোলা রাখতে পারে, তাদের জন্য এটি জায়িজ। তিনি আরও যোগ করেন, যদি কেউ আকস্মিক কোনো নারীর হাত, পা অথবা চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তা জায়িজ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি উত্তেজনা ও কামভাব জাগ্রত হয়, তাহলে এ দৃষ্টিপাত জায়িজ নয়। তিনি বলেন, ইসলামে যে দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা লাগাতার অথবা বার বার দৃষ্টিপাত। অন্য কথায়, একদৃষ্টে অথবা কামোদ্দীপনা নিয়ে তাকিয়ে থাকা নিষিদ্ধ বা হারাম। যেহেতু লাগাতার অথবা বার বার তাকানো ফিতনার কারণ হয়, তাই হারাম। এ ধরনের দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন :

نظرة فابتسامة فسلام : فكلام فموعد فلقاء

*প্রথমে দৃষ্টিপাত, তারপর মৃদু হাসির আদান-প্রদান, তারপর সালাম-দুআ।*
*এরপর কথাবার্তা, তারপর দিনক্ষণ নির্ধারণ এবং শেষমেশ সাক্ষাত।*

আর একান্তে সাক্ষাতের পরে কী হয়, তা আলোচনার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া পরিবারের অবগতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো মেয়েবন্ধু অথবা প্রেমিকের সঙ্গো বিয়ে করে নিলে বৈধ হবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা সঠিক নিয়মবিরুদ্ধ। যে বিয়েতে মেয়ের সন্তুষ্টির পাশাপাশি অভিভাবকেরও সন্তুষ্টি থাকে, ইসলামে তা সুন্দর বিয়ে। প্রতিটি বিয়েতেই উভয় ধরনের সন্তুষ্টি শরিয়তে কাম্য। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ে ও পরিবার সবারই সন্তুষ্টি থাকা চাই। পরিবারের অনুমতি ছাড়া কোনো মেয়ে কারও সঙ্গো বিয়ে করতে চাইলে কারজাবি এই বিয়ে রুখে দেন। নিজের অভিভাবকের সন্তুষ্টি ছাড়া মেয়েদের এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপকে তিনি অর্থহীন বলেন।

জিহাদ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পশ্চিমা উপনিবেশের উচ্ছিষ্ট হিসেবে টিকে থাকা বিদেশি শাসকদের উৎখাত ও তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রথম প্রকারের জিহাদ; আর কাশমির, ইরাক ও চেচনিয়া প্রভৃতি অধিকৃত অঞ্চলসমূহে চলমান সংগ্রাম দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদ। এসব স্থানে অমুসলিম শাসকদের থেকে মুসলিমদের ভূমি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা প্রত্যেকের ধর্মীয় দায়িত্ব। 'অর্থনৈতিক জিহাদ' নামে কারজাবি জিহাদের আরেকটি প্রকারও করেছেন, যার অর্থ মার্কিন ও ইসরাইলি পণ্য বয়কট করা। তাঁর মতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মার্কিন ও ইসরাইলি পণ্য ব্যবহার করা হারাম এবং কবিরা গুনাহ।

ব্যাংকের সুদ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যাংকের সুদ হারাম। এগুলো নিজের জন্য ব্যবহার করা যেমন হারাম, ব্যাংকে রেখে দেওয়াও হারাম। কারণ এটা অসৎ কাজে সহায়তা এবং সুদি ব্যাংকিং শক্তিশালীকরণের মাধ্যম হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অমুসলিম রাষ্ট্রের সুদি ব্যাংকে টাকা রাখার গুনাহ তুলনামূলক বেশি। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের অনেক ব্যাংক মুসলিমদের পরিত্যক্ত সুদের লভ্যাংশ খ্রিষ্টান মিশনারিদের কাছে সরবরাহ করে এবং মুসলিমদের পরিত্যক্ত এই সুদই মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর কাজে ব্যয় হয়। তিনি বলেন, ব্যাংকের মূলধনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সুদ মুসলিমদের জন্য দরিদ্র, ইয়াতিম, মিসকিন এবং বিভিন্ন ইসলামি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দাওয়াতি কার্যক্রম অথবা ইসলামি বই-পুস্তক ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসারসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা উচিত। এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উপার্জনকারীর বিবেচনায় এই সম্পদ অপবিত্র ও হারাম হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে তা হারাম নয়। অর্থাৎ এক প্রকারের জিনিস মৌলিকভাবেই হারাম—যেমন : মদ ও শূকর ইত্যাদি। আবার আরেক শ্রেণির জিনিস মৌলিকভাবে হারাম না হলেও বাহ্যিক কোনো

কারণে তা হারাম হয়। যেমন, সুদের টাকা।

অতএব, যখন এই কারণ অবশিষ্ট থাকবে না, তখন এই বিধানও থাকবে না। তাই সুদি সম্পদ তার উপার্জনকারীর বিবেচনায় যদিও হারাম হয়; কিন্তু এর অধিকার পরিবর্তনে হলে তা আগের বৈধতায় ফিরে যায়।

শায়খ কারজাবির মতে সুদি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের চারটি সম্ভাব্য অবস্থা রয়েছে : প্রথমত, সুদের লভ্যাংশ নিজের জন্য ব্যবহার করা, এটা হারাম। দ্বিতীয়ত, এই লাভ ব্যাংকেই রেখে দেওয়া, এটাও হারাম। তৃতীয়ত, এই সম্পদ আগুন জ্বালিয়ে ফেলা, এটাও জায়িজ নেই। কেননা এতে সম্পদ নষ্ট হয়। চতুর্থত, এই সম্পদ কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা—এটিই কারজাবি পছন্দ করেন।

অনেক আলিম এর পঞ্চম আরেকটি পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাংকের সুদি সম্পদ এমন কোথাও ব্যয় করা উচিত, যেখানে আগে থেকেই হারাম সম্পদ ব্যয় হচ্ছে। যেমন, কারও সন্তান অপহৃত হলো। দস্যুরা তার মুক্তিপণে ২০ লাখ টাকা দাবি করছে—এরা যেহেতু অবৈধ টাকার জন্যই বসে আছে, তাই মুক্তিপণ হিসেবে সুদের টাকা এদেরকে দেওয়া যেতে পারে। শায়খ কারজাবির মতকেই বিশ্লেষণ করে কিছু আলিম সতর্কতামূলক বৈধতার আরেকটি উপায় হিসেবে বলেন—এই সম্পদ দরিদ্র, ইয়াতিম ও মিসকিনদের খাবার অথবা পোশাকে ব্যবহার না করে অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা শ্রেয়। যেমন কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া, সাইকেল বা উপার্জনের জন্য ভ্যানগাড়ি কিনে দেওয়া অথবা এই টাকায় কোনো গাড়ি ভাড়া করে তাকে চালাতে দেওয়া তুলনামূলক উত্তম। অনুরূপভাবে দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে এই সম্পদ দিয়ে অস্ত্র ইত্যাদি খরিদ করে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা বিভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক বা সিডি প্রভৃতি প্রকাশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে চলা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনেরও মোকাবিলা করা যায়।

কারজাবি কাফিরদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণের বৈধতার পক্ষে। তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো সব ইয়াহুদি বা খ্রিষ্টানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুরা মায়িদার ৫১ নম্বর আয়াত :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ﴾

হে ইমানদারগণ, তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

এই আয়াত উল্লেখ করে কারজাবি বলেন, 'এটি ব্যাপক অর্থে বলা হয়নি। ফলে সকল কাফির বা মুশরিক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'এ ধরনের আয়াতগুলো

মূলত এমন কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।'

এরপর সুরা মুমতাহিনার ৮ নম্বর আয়াতও তিনি নিজের বক্তব্য সমর্থনে উল্লেখ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ায়নি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করে নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।

কারজাবি গণতন্ত্র সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 'স্বৈরতন্ত্র এবং তাগুতি শাসনের তুলনায় গণতন্ত্র ভালো।'

সিগারেট খাওয়া বিষয়ে তিনি বলেন, 'সিগারেট খাওয়ার ফলে যদি ক্ষতি হওয়া প্রমাণিত থাকে, তাহলে তা খাওয়া হারাম। বিশেষত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কোনো ডাক্তার যদি কাউকে নিষেধ করেন, তবে তার জন্য তা হারাম।'

আর ছবির ক্ষেত্রে তিনি তিনটি প্রকার উল্লেখ করেন :

১. হারাম। যেমন মূর্তি বা প্রতিকৃতি তৈরি করা।

২. মাকরুহে তানজিহি। যেমন : কাগজ, কাঠ বা দেয়ালে চিত্রাঙ্কন।

৩. বৈধ। এ হলো ফটোগ্রাফি।

গানবাজনা বিষয়ে তিনি বলেন, 'গানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়-মন প্রশান্ত হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উচ্ছ্বসিত হয়। এতে অশ্লীলতা ও গুনাহের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে এমন কিছু না থাকলে ইসলাম তার বৈধতা দেয়। কামভাব উত্তেজক নয় এমন বাজনা যুক্ত হলেও কোনো অসুবিধা নেই। আনন্দ ও খুশির উপলক্ষ্যসমূহে বিনোদন ও প্রশান্তিলাভের জন্য ইসলাম একে মুসতাহাব করেছে। যেমন ইদের দিন, বিয়ের দিন বা হারানো ব্যক্তি ফিরে আসার দিন। এ ছাড়াও ওয়ালিমা, আকিকা বা সন্তান জন্মের পরে।'

কারজাবি আরও বলেন, 'যেসব গানে অশ্লীলতা, পাপ অথবা অন্যায়ের প্রতি প্ররোচনা থাকে, এ ধরনের গান হারাম হওয়ার বিষয়ে আলিমরা একমত। গান তো মূলত কথাই। সুতরাং এর কথা সুন্দর হলে তা হালাল, আর কথা অশ্লীল হলে হারাম। তাতে তাল-লয়-সুর মিললে অসুবিধা কী? অপরদিকে ইদ, বিয়ে বা হারানো ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনে অথবা অন্যান্য উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে যেসব গান স্বাভাবিক বাদ্যযন্ত্রসহ এবং গুনাহের

প্ররোচনামুক্ত হয়, এসব গানের বৈধতার ক্ষেত্রেও আলিমরা একমত। তবে গায়ক আজনবি নারী হতে পারবে না।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেক গানই হালাল নয়। তাকে অবশ্যই ইসলামের শিষ্টাচার এবং শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।'

প্রায় একই ধরনের ফাতওয়া মিসরের সাবেক মুফতি ড. আলি জুমআ এবং শায়খ মুতাওয়াল্লি শারাবি প্রদান করেছেন। ইমাম আবু হামিদ গাজালি এবং মাওলানা জাফরশাহ নদবির মতও এটাই।

শিয়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে ড. কারজাবি ইসনা আশারিয়া অথবা ইমামিয়া সম্প্রদায়কে বিদআতি আখ্যায়িত করে মুক্তিপ্রাপ্ত দল থেকে বহিষ্কৃত বলেন। তবে এদের কাফির আখ্যা দেওয়ার প্রবক্তা নন তিনি। তাঁর মতে, 'শিয়াদের পণ্ডিত ও বিদ্বানশ্রেণি কুরআনকে পরিপূর্ণ কিতাব জ্ঞান করে এবং কালিমা স্বীকার করে, তাই তারা কাফির নয়।' অর্থাৎ কারজাবি শিয়াদের বিদআতি বললেও সামগ্রিকভাবে কাফির ফাতওয়া দিতে রাজি নন। অবশ্য শিয়াদের বিদআতি আখ্যায়িত করায় ইরানি আলিমরা তাঁর কড়া সমালোচনা করেন। তাঁরা উপহাস করে বলেন, 'অথচ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানও শায়খ কারজাবিই!'

শায়খ কারজাবি আকিদার ক্ষেত্রে আশআরি মতাদর্শের প্রতি অনুরাগী থাকলেও কিছু বিষয়ে এই ধারার সমালোচনাও করেছেন।

২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে কারজাবি ওষুধ ও পানাহার-সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদিতে ৫০ শতাংশ অ্যালকোহল ব্যবহার বৈধ বলে রায় দেন। তাঁর মতে, 'অ্যালকোহল এ ক্ষেত্রে উপাদান (Ingredients) হিসেবে নয়; বরং গাঁজন (Fermentation) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।' এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা, শায়খ সালিহ আল উসাইমিনসহ সৌদি আরবের কাউন্সিল অব সিনিয়র স্কলার্সের অবস্থানও এটিই।

ফেরেশতা, জিন, আরশ, কুরসি, কবরের শাস্তি, পুলসিরাত, হাউজে কাউসার, ইসা আ.-এর অবতরণ, দাজ্জালের আবির্ভাব, মাহদির আত্মপ্রকাশ, মুজিজা, কারামত এবং কিয়ামতের অন্যান্য নিদর্শনের ক্ষেত্রেও কারজাবি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতোই ইমান রাখতেন। কোনো কিতাব দেখে অথবা রেখা টেনে কল্যাণ নির্ণয় করা তাঁর মতে হারাম। কবরপূজা, তাবিজ ব্যবহার, আত্মা উপস্থিতকরণ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ, মানত অথবা উৎসর্গকরণেরও নিন্দা করতেন তিনি।

তিনি দার্শনিক, মুতাজিলি, চরমপন্থি সুফি, ইমামি শিয়া এবং খারিজিদেরও সমালোচনা করতেন। হুলুল, ইত্তিহাদ এবং বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসপূর্ণ তাসাওউফ কারজাবি সমর্থন করতেন না। তবে বিশুদ্ধ মানহাজ অনুসারে

সুন্নি তাসাওউফের—যাঁদের পূর্বসুরি হাসান বসরি, ফুজায়েল ইবনু ইয়াজ, ইবরাহিম ইবনু আদহাম, জুনায়েদ বাগদাদি রাহ. প্রমুখ—তিনি প্রবক্তা ছিলেন। ড. কারজাবি ফজিলতপূর্ণ আমলের জয়িফ হাদিসসমূহ পাঠ করার পক্ষে। হাদিস ও সুন্নাহর প্রামাণিকতার শক্ত প্রবক্তা এবং জোর দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুন্নাহকে দুভাগে বিভক্ত করেন—বিধানযোগ্য বা শরিয়ত হওয়ার উপযুক্ত সুন্নাহ এবং অবিধানযোগ্য বা শরিয়ত হওয়ার অনুপযুক্ত সুন্নাহ। বিধান-সংক্রান্ত কিছু হাদিসকে আবার রাসুল ﷺ-এর যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঘোড়ায় জাকাত আবশ্যক না হওয়ার বর্ণনায় তিনি বলেন, এ বিধান রাসুল ﷺ-এর সময়ের সঙ্গেই নির্দিষ্ট ছিল। তাই এখন ঘোড়ারও জাকাত দিতে হবে।

ইউসুফ কারজাবি গণতন্ত্রের প্রবক্তা হলেও পশ্চিমা গণতন্ত্রের তিনি বরাবরই সমালোচক ছিলেন। পশ্চিমা গণতন্ত্রকে ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করার যেসব শর্ত তিনি উল্লেখ করেন, সেসব বাস্তবায়ন করলে অবশেষে তা ইসলামের শুরাব্যবস্থাতেই পড়ে। যদিও তিনি একে গণতন্ত্রই বলতেন।

কিছু আলিম শায়খ কারজাবিকে গণতন্ত্রের প্রবক্তা বলে আপত্তি তুললে আরেক শ্রেণির আলিম এর জবাবে বলেন, শায়খ কারজাবি গণতন্ত্রকে ইসলামসিদ্ধ করতে যেসব পূর্বশর্ত যোগ করেছেন, তার সঙ্গে ইসলামের শুরাব্যবস্থার পার্থক্য শুধু নামেই।

নিরুপায় হলে অথবা ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে পুরুষের পক্ষে নারীর সঙ্গে হাত মেলানোকে তিনি বৈধ মনে করেন। বিদ্যমান সময়ে বিমানে ভ্রমণের নিরাপত্তা থাকার কারণে মহিলাদের জন্য মাহরাম ছাড়া হজ অথবা উমরা জায়িজ বলে ফাতওয়া দেন। এই ফাতওয়াকে তিনি একজন নারী ইয়ামেনের সানআ থেকে একাকী ও নির্ভয়ে মদিনায় ভ্রমণের প্রসিদ্ধ বর্ণনার ওপর দাঁড় করিয়েছেন।

*সহিহ বুখারির* এক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও বলেন, রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীরা মাহরাম ছাড়াই হজ অথবা উমরা করতেন। অথচ সাহাবিরাও এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। তাই সফরের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে মেয়েরা মাহরাম ছাড়া একাকী হজ অথবা উমরা করতে পারেন। মোটামুটি একই ধরনের ফাতওয়া মালিকি এবং শাফিয়ি মাজহাবেও পাওয়া যায়।

আল্লামা কারজাবি কল্যাণকর জ্ঞানার্জন ও ভালো কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান ছয় শর্তের ভিত্তিতে জায়িজ আখ্যা দেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অথবা তীব্র ক্রোধের কারণে বোধশক্তিহীন অবস্থার তালাকের পক্ষে নন তিনি। আবার একসঙ্গে তিন তালাকের ক্ষেত্রেও তিনি এক তালাক গণ্য করেন। এ সংক্রান্ত অধিকাংশ মাসআলায় তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

## এগারো. কারজাবির সমালোচক

শায়খ কারজাবির সমালোচকদের মধ্যে কয়েক শ্রেণির মানুষ রয়েছেন। প্রথমত সালাফিশ্রেণির আলিম, তাঁরা কারজাবির আশআরি আকিদার প্রতি ঝোঁক, শিয়াদের কাফির মনে না করা, হিজাবের বিষয়ে শিথিলতা এবং ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সহজতা ও উদারতা অবলম্বনের অভিযোগ করেন। শায়খ সুলায়মান ইবনু সালিহ আল খাররাশি কারজাবির খণ্ডনে *আল-কারজাবি ফিল মিজান* নামে একটি বই লিখেছেন। বইটি পড়ে মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারজাবির প্রতি এতে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। অধিকন্তু তাঁর বক্তব্যসমূহ এদিক-ওদিক করে এমন বিপরীতমুখী ব্যাখ্যা ও অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে, যা সম্ভবত কারজাবিরও উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে শায়খ সুলায়মানের সমালোচনা ঠিক আছে। যেমন তিনি বলেছেন, কারজাবি জান্নাতের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও মানুষের ওপর জিন সওয়ার হওয়া, মানুষের জবানে জিনের কথা বলা অথবা মানুষের ওপর জিনের চড়াও হওয়া অস্বীকার করতেন। অথচ বিশুদ্ধ বর্ণনা ও অভিজ্ঞতায় এসব প্রমাণিত।

জিহাদি সংগঠনের সদস্য এবং মার্কিন সেনাবাহিনীতে থাকা মুসলিমদের জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ করা জায়িজ বলে প্রদত্ত ফাতওয়ায় শায়খ কারজাবির সমালোচনা করা হয়। বস্তুত বিশদভাবে ফাতওয়াটি অধ্যয়নের পর এটিকে গ্রহণযোগ্য কোনো ফাতওয়া মনে হয় না। আর অগ্রহণযোগ্য কয়েকটি প্রমাণের এমন ফাতওয়া মানারই-বা কী দরকার?

যদি শায়খ কারজাবির এই মত থেকে প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত থাকে, তাহলে এই মত প্রত্যাবর্তনযোগ্যই ছিল; আর প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত না থাকলে এই ফাতওয়ার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

চরমপন্থি সুফিবাদ, কবরপূজা, আল্লাহ ছাড়া কারও উদ্দেশ্যে মানত অথবা কোনোকিছু উৎসর্গ করার বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রদানের কারণে অনেকেই তাঁকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাসাওউফের নামে চলা শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ফাতওয়া ও সমালোচনার সঙ্গে আমরা একমত। ইরানি শিয়া আলিমরা শায়খ কারজাবি কর্তৃক ইমামিয়া সম্প্রদায়কে বিদআতি এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলবহির্ভূত আখ্যায়িত করায় তাঁর সমালোচনা করেন।

আবার মুসলিম সমাজের সেকুলারশ্রেণি জিহাদ ও আন্দোলন-সংক্রান্ত ফাতওয়ার কারণে তাঁকে কঠোর ও মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে। পশ্চিমা চিন্তাবিদ, জায়নবাদ, ইসরাইল ও আমেরিকা বিষয়ে তাঁর মন্তব্যের কারণেও এরা তাঁর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে থাকে।

## বারো. আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা

শায়খ কারজাবি বিভিন্ন সময় তাঁর ধর্মীয়, গবেষণামূলক, সাংস্কৃতিক ও দাওয়াহমূলক কাজের কারণে অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কার হলো :

- ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, ইসলামি অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 'ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পুরস্কার' লাভ করেন।
- ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে, ইসলামি জ্ঞান ও গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 'বাদশাহ ফায়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' পান।
- ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে, ইসলামি আইনশাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'হাসান আল বালকিয়া পুরস্কার' লাভ করেন।
- ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, সাংস্কৃতিক ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের জন্য 'সুলতান আল ওয়াইস' পুরস্কারে ভূষিত হন।
- ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে, তিনি 'দুবাই আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন পুরস্কার' পান।
- ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে, ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কাতার সরকার তাঁকে এক বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করে।
- ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে মালয়েশিয়া সরকার তাঁকে 'আল-হিজরাতুন নাবাবিয়া পুরস্কার' প্রদান করে।
- ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর জর্দান সরকারের পক্ষ থেকে তিনি বিশেষ এক পুরস্কার লাভ করেন।

## তেরো. উপসংহার

শায়খ কারজাবির ফাতওয়া, বিভিন্ন গ্রন্থ ও ধর্মীয় অবদানসমূহের দিকে তাকালে অনুমিত হয়, নিজের জ্ঞানসাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি নিঃসন্দেহে মুজতাহিদ স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। যদিও তিনি কখনো চাননি তাঁর সঙ্গে কোনো মাসআলায় আলিমদের মতভিন্নতা হোক। এমনকি নিজেকে তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বেও মনে করেননি। আলিমরা তাঁর কিছু ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন। আমরা মনে করি এই সমালোচনা স্বাভাবিক। যেমনটা ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম মালিক প্রমুখদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ইমাম ইবনু হাজম তাকলিদ ও মুকাল্লিদদের সমালোচনা করেছেন, তদ্রুপ

তাকলিদপন্থিরাও জাহিরিদের সমালোচনা করেন। অথবা মুহাদ্দিসরা যেমন আহলুর রায় বা প্রমাণের বিপরীতে স্বমতের অনুসরণকারীদের সমালোচনা করেন, তেমনি তাঁরাও মুহাদ্দিসদের সমালোচনা করেন। এ ধরনের সমালোচনা যদি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব, ভিন্নমতের প্রতি ঘৃণা এবং কারও ব্যক্তিত্ব হরণের উদ্দেশ্যে না হয় বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য হয়, তাহলে শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও তা-ই।

কারও ব্যাপারে সমালোচনার অর্থ তিনি বিতর্কিত হয়ে গেছেন এমন কিন্তু নয়। কোনো আলিম কর্তৃক অন্য কোনো আলিমের সমালোচনাকে তাঁর বিতর্কিত হওয়ার প্রমাণ মনে করা হলে ১৪০০ বছরে অবিতর্কিত কোনো আলিম বা যার মতামতে অন্য আলিমদের ভিন্নমত নেই এমন কাউকে মুসলিম বিশ্বে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

শায়খ কারজাবির গবেষণামূলক কাজ ও ফিকহের ক্ষেত্রে অসংখ্য অবদান, দাওয়াত ও আন্দোলন এবং শিক্ষার প্রসারে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, আমরা প্রশংসার সঙ্গে তা মূল্যায়ন করি। অন্যদিকে তাঁর ব্যতিক্রমী মতামতসমূহের ইতিবাচক দিকের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাশীল। ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো তিনি শিথিলতা আবার কখনো কঠোরতার আশ্রয় নিয়েছেন বলে তাঁকে 'আধুনিকতাবাদী' বা 'মৌলবাদী' বলার সুযোগ নেই; বরং তিনি সবসময়ই মধ্যপন্থায় অটল থাকতে চাইতেন। তবে কোন কোন মাসয়ালায় তিনি মধ্যপন্থায় অটল থাকেননি, সেটি ভিন্ন আলোচনা।

ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কারজাবি সহজ মতকেই প্রাধান্য দিতেন। সেই সঙ্গে নিজের পক্ষ সমর্থনও করতেন। নুসুস বা কুরআন-হাদিসের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত একাধিক মত থেকে সহজ মতে ফাতওয়া প্রদান করা হলে শরিয়তের উদ্দেশ্যও তা-ই। যেমন রাসুল ﷺ থেকে সহিহ বর্ণনায় প্রমাণিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দুটি জিনিসের স্বাধীনতা দেওয়া হলে এবং উভয়টি জায়িজ হলে তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন; কিন্তু ফিকহের ক্ষেত্রে এভাবে সহজতা খোঁজা হলে তা নিন্দনীয় বটে। ফকিহদের বিভিন্ন মতামত থেকে সহজ মতটি শুধু নিজের সহজতার কারণেই গ্রহণ করা কারও জন্য নিয়মসিদ্ধ নয়। তবে যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলিম যদি এই একাধিক মতের তুলনামূলক অধ্যয়ন করে কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো সহজ মতের ফাতওয়া দেন, তবে তার ওপর আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই। এই ভিন্নমত নির্দিষ্ট কোনো মাজহাবের বিশেষ কোনো মাসআলায় হলে হানাফি ফকিহরা তাকে 'ইজতিহাদ ফিল মাজহাব' বলেন; আর যদি একাধিক মাজহাবের বিভিন্ন মতে হয়, তাহলে তা 'ইজতিহাদ ফিল-মাজাহিব আল-ইসলামিয়া'।

কারজাবি দ্বিতীয়টিকে 'আল-ইজতিহাদ আল-ইনতিফায়ি' বলেছেন। তাঁর কিছু ফাতওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সময় নুসুসের পরিবর্তে ফকিহদের বিভিন্ন মতের মধ্যেও তিনি সহজ মতটিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। অথচ এই প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নস অথবা শরিয়তের প্রমাণ বিদ্যমান নেই। ইজতিহাদের এই পদ্ধতি সঠিক নয়। অবশ্য এই পন্থা তিনি নির্দিষ্ট কিছু ফাতওয়ার ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেছেন।

অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে হাত মেলানো, গানবাজনার বৈধতা, মেয়েদের সতর ও হিজাব এবং নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে শায়খ কারজাবির অবস্থান সঠিক নয়। তাঁর বিচক্ষণতা ও যুক্তি যদিও ছিল; কিন্তু সালাফি আলিমদের মতো তিনি অধিক পরিমাণে নস উল্লেখ করতেন না। ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ড. কারজাবির এ এক অসচেতনতা হতে পারে—তিনি অনেক ক্ষেত্রে 'নস' উপেক্ষা করেও হুকুম প্রদান করতেন। আবার কখনো অধিকসংখ্যক নস উপেক্ষা করে শুধু দু-একটি নসের ভিত্তিতেও ফাতওয়া প্রদান করেছেন।





# ড. ওয়াহবা আল জুহায়লি

## এক. জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

ড. ওয়াহবা আল জুহায়লি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকের এক প্রত্যন্ত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন নিজ গ্রামেই। মাধ্যমিক শিক্ষা দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া অনুষদ থেকে ১৯৫৬ সালে তিনি বিএ সম্পন্ন করেন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে শরিয়া ইন্সটিটিউটের অধীনে ডিপ্লোমা (বিএ সমমান) করেন। ১৯৬৩-তে তিনি 'আসারুল হারব ফিল ফিকহিল ইসলামি : দিরাসা মুকারানা' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৬৩ সালে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন ড. ওয়াহবা আজ-জুহায়লি, পাঠদান করেন বিভিন্ন বিষয়ে। এরপর লিবিয়ার বেনগাজি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে শিক্ষকতা করেন। এ ছাড়া সুদানের খারতুম বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। কিছুকাল দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

শায়খ ওয়াহবা তাঁর *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু* গ্রন্থের শেষে লেখেন, 'কিছু মানুষ আমাকে হানাফি মাজহাবের অনুসারী মনে করে, এই ধারণা সঠিক নয়। আমি শাফিয়ি মাজহাব অনুসরণ করি।' শাফিয়ি হলেও তিনি নিজ মাজহাবের প্রতি কট্টর ছিলেন না। আকিদার ক্ষেত্রে আশআরি ধারার প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

পারিবারিক জীবনে জুহায়লি বিবাহিত এবং পাঁচ সন্তানের জনক ছিলেন। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮ আগস্ট শনিবার সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

## দুই. বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব ও সদস্যপদ

শায়খ জুহায়লি একাধারে জর্দানের আল-মাজমাউল মালিকি লি বুহুসিল হাজারাতিল

ইসলামিয়া, জিদ্দার মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি ও মক্কার আল-মাজমাউল ফিকহিল ইসলামির সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি ভারত, ফিকহ অ্যাকাডেমি সুদান ও আমেরিকার সদস্য ছিলেন। বাহরাইনের ইসলামি অর্থনৈতিক কোম্পানি শারিকাহ আল-মুজারাবা ওয়াল মুকাসসা আল-ইসলামিয়ার শরিয়া উপদেষ্টা এবং শামের উচ্চতর ফাতওয়া পরিষদ মাজলিসুল ইফতা আল-আ'লার সদস্য ছিলেন। শামের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন গবেষণা পরিষদ লাজনাহ আল-বুহুস ওয়াশ শুউন আল-ইসলামিয়ার সদস্য এবং ইসলামি অর্থনীতি বাস্তবায়ন সংস্থা লাজনাতুদ দিরাসাতিশ শারইয়া লিল মুআসসাসাতিল মালিয়া ওয়াল ইসলামিয়ার প্রধান ছিলেন।

## তিন. রচনা ও গবেষণাকর্ম

শায়খ জুহায়লি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৫০০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বেশকিছু রচনা প্রসিদ্ধি লাভ করে। তুলনামূলক ফিকহে রচিত *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু* এ বিষয়ে একটি মৌলিক উৎসগ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। পাকিস্তান ও সুদানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থটির কিছু অংশ পাঠ্যতালিকাভুক্ত। এক অর্থে গ্রন্থটিকে ফিকহ বিশ্বকোষও বলা যায়। ১১ খণ্ডের বিরাট এ গ্রন্থটি প্রায় ২২ বার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এখান থেকেই এর গ্রহণযোগ্যতা আঁচ করা যায়। এ ছাড়া বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

তুলনামূলক ফিকহে আরও অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে; কিন্তু এই গ্রন্থটির বর্ণনাভঙ্গি, বিন্যাস, সহজবোধ্য ভাষা, আধুনিক ও সামসময়িক মাসআলাসমূহের উল্লেখ এবং একাধিক মতের মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন এবং মৌলিক সূত্র ও উৎস উল্লেখের কারণে অনন্য। এ ছাড়া ড. ওয়াহবার প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে *আত-তাফসিরুল মুনির* অন্যতম। ১২ খণ্ডের এই গ্রন্থটি অন্তত সাত বার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। তাঁর পরিচিত রচনার আরেকটি হলো *উসুলুল ফিকহ আল-ইসলামি*। তুলনামূলক উসুলুল ফিকহ বিষয়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত, পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ১২ বার। সৌদি আরবের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত।

ড. জুহায়লির অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো *আসারুল হারব ফিল ফিকহিল ইসলামি*, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু*, *আল-ওয়াসায়া ওয়াল-ওয়াকফ ফিল ফিকহিল ইসলামি*, *আত-তামউইল ওয়া সুকুল আওরাকিল মালিয়া*, *খিতাবাতুজ জিমান*, *বায়উল আসহাম*, *বায়উত তাকসিত*, *আল-উসুস ওয়াল-মাসাদিরিল ইজতিহাদিয়াতুল মুশতারিকাহ বাইনাস সুন্নাতি ওয়াশ শিআতি*, *আসবাবু ইখতিলাফি ওয়াজাহাতিন নাজর*, *আল-ইজতিহাদুল*

*হাদিস মুনতালাকাতুহ ওয়া ইত্তিজাহাতুহ, আহকামুত তাআমুল মাআল মাসারিফিল ইসলামিয়া, আজ-জারায়ি ফিস-সিয়াসাতিশ শারইয়া ওয়াল-ফিকহিল ইসলামি, আল-উরফ ওয়াল-আদাহ, আল-মাজহাব আশ-শাফিয়ি ওয়া মাজহাবুহুল ওয়াসিত বাইনাল মাজাহিবিল ইসলামিয়া, মানাহিজুল ইজতিহাদ ফিল মাজাহিবিল মুখতালিফাহ, তাজদিদুল ফিকহিল ইসলামি, আল-ফিকহুল মালিকি আল-ইউসর, তাগাইয়ুরুল ইজতিহাদ, তাতবিকুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়া, আল-আলাকাতুদ দাওলিয়া ফিল ইসলাম, আর-রুখাসুশ শারইয়া, উসুলুত তাকরিব বাইনাল মাজাহিবিল ইসলামিয়া, ইজতিহাদুত তাবিয়িন, আল-বায়িস আলাল-উকুদ ফিল ফিকহিল ইসলামি, আকদুত তা'মিন, আল-কিরাআআতুল মুতাওয়াতিরা ওয়া আসারুহা ফির রাসমিল কুরআনি, আত-তাফসিরুল মুনির ফিল-আকিদাহ ওয়াল-আহকামিশ শারইয়া, উসুলু মুকারানাতিল আদইয়ান, আল-বিদাউল মুনকারা, আল-ইমান বিল কাজা ওয়াল-কাদর, আস-সুন্নাতুন নাবাবিয়া হাকিকাতুহা ওয়া মাকানাতুহা ইনদাল মুসলিমিন, ফিকহুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া, আল-খাসায়িসুল কুবরা লি হুকুকিল ইনসান ফিল ইসলাম ওয়া দাআইমুদ দিমুকরাতিয়াতিল ইসলামিয়া, আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া গাইরুল মুসলিমিন, আল-মাহজ ওয়াল-ওয়াসিলাহ ওয়াল-হাদাফ, আল-ইসলাম ওয়া তাহাদ্দিয়াতুল আসর, আল-মুহাররামাত ওয়া আসারুহা আস-সাইয়িয়া ফিল মুজতামা, আদ-দাওয়াহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ, আল-উসরাতুল মুসলিমাহ ফিল আলামিল আসর, আস-সাকাফাহ ওয়াল-ফিকর, আল-কিয়ামুল ইসলামিয়া ওয়াল কিয়ামুল ইকতিসাদিয়া* এবং *তাআদ্দুদ আজ-জাওজাত : আল-মাবদা ওয়ান নাজরিয়া ওয়াত তাতবিক* প্রভৃতি।

## চার. ফাতওয়া ও মতামত

শায়খ ওয়াহবা জুহায়লিকে সুদি ব্যাংকে চাকরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'সাধারণ অবস্থায় এই চাকরি হারাম। তবে কেউ এতে বাধ্য হলে এবং তার মৌলিক প্রয়োজন যদি পূরণ না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য চাকরি খুঁজতে থাকার শর্তে সাময়িকভাবে এ চাকরি বৈধ। অন্য চাকরি পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

নির্দিষ্ট কোনো ফিকহি মাজহাব অনুসরণের বিষয়ে জুহায়লিকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'মূল কথা হলো, একটি সাধারণ মানুষের মাজহাব; যুগের মুফতি সাহেব যে মাজহাব অনুসরণ করেন। সুতরাং নীতি ও কল্যাণের দাবি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য সময়ের মুফতি সাহেবের তাকলিদ আবশ্যক। তবে এভাবে নির্দিষ্ট কোনো মাজহাবের অনুসরণ শরিয়ামতে আবশ্যক নয়।'

*আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু* গ্রন্থের ভূমিকায় 'তালফিক বাইনাল মাজাহিব' বা বিভিন্ন ফিকহি মাজহাবে কোনো মাসআলায় এক মাজহাব আবার অন্য মাসআলায় আরেক মাজহাবের অনুসরণের বিষয়ে জুহায়লি বলেন, 'প্রয়োজন ও অপরিহার্যতার কারণে এমনটা করা মালিকি মাজহাবমতে এবং কিছু হানাফি আলিমদের মতে জায়িজ।' জুহায়লিও একে জায়িজ মনে করেন; আর এই 'তালফিক' সহজতা খোঁজার জন্য হলে তা যে নিন্দনীয়, তিনি নিজেও সেটা স্বীকার করেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি আরও লিখেছেন, শিয়াদের সঙ্গে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধ আকিদা ও ফিকহের নয়; বরং এই বিরোধ ক্ষমতা ও রাজনীতির। তিনি এটাও দাবি করেন, 'শিয়াদের সঙ্গে আহলুস সুন্নাতের ভিন্নমত প্রসিদ্ধ কিছু মাসআলার মধ্যে মাত্র ১৭ জায়গায়।'

এই বিভক্তির অর্থ যদি হয় আগেকার শিয়া মতাবলম্বী এবং আহলুস সুন্নাহর মধ্যে বিভেদ করা, তাহলে এ ধরনের ভিন্নমত মতাদর্শীয় নয়; বরং এতে রাজনীতিই বড় কারণ বলে মনে হয়। এ কারণেই ইমাম বুখারি রাহ. তাঁর যুগের শিয়া মতাদর্শী বর্ণনাকারীদের থেকেও অনেক বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তবে সত্য কথা হলো, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যেও অনেক অমূলক ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অনেক বিদআত ও প্রথা ধর্মের নামে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই বিষয়ে দালিলিক ও বিস্তারিত জানতে ইরানের প্রসিদ্ধ শিয়া আলিম ও মুজতাহিদ ড. মুসা আল মুসাবির রচিত *আশ-শিআহ ওয়াত তাসহিহ* গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। তাই সাম্প্রতিককালের শিয়া মতাবলম্বী ও আহলুস সুন্নাতের মধ্যে মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে বিরোধ যেমন আছে, ঠিক তেমনি ফিকহের ক্ষেত্রেও শত শত মৌলিক ভিন্নমত রয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে শায়খ ওয়াহবা মেয়েদের পুরো শরীর এবং চেহারা ও হাতকে সতর গণ্য করে বলেন, অপরিচিত পুরুষের সামনে মেয়েদের জন্য এসব অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক।

সুদি ব্যাংকের লাভকে তিনি সুদ উল্লেখ করে স্পষ্ট হারাম আখ্যা দেন। বিপরীতে সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংকের লভ্যাংশ এবং এ ধরনের ব্যাংকে লেনদেন করা জায়িজ হওয়ার পক্ষে মত দেন।

শায়খ জুহায়লি তাঁর এক ফাতওয়ায় ইজাব-কবুল, অভিভাবক, সাক্ষী এবং প্রচারের শর্তে 'জাওয়াজুল মিসয়ার'-কে জায়িজ আখ্যায়িত করেন। পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কোনো মেয়েকে ভরণপোষণ ও বাসস্থানের অধিকার না দেওয়ার শর্তে যে বিয়ে হয়, তাকে জাওয়াজুল মিসয়ার বলে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের ভরণপোষণ অথবা

বাসস্থানের দাবি স্বামীর কাছে করতে পারে না। হয়তো সে নিজেই এসব বহন করবে অথবা তার পিতৃপরিবার বহন করবে। শাফিয়ি ও হাম্বলি কিছু আলিমের মতে এ ধরনের বিয়ে বৈধ হলেও অনেক আলিম এ ধরনের বিয়েকে অন্যায় ও স্ত্রীর ওপর অত্যাচার আখ্যা দিয়ে নাজায়িজ বলেছেন। তবে বৈধতার প্রবক্তারা বলেন, ইজাব-কবুল, অবিভাবক, সাক্ষী এবং বিয়ের ঘোষণা প্রভৃতি পূর্বাপর সমূহ শর্ত যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে, কাজেই এই বিয়েও বৈধ।

আবার কিছু আলিম সাধারণভাবে এই বিয়ের অনুমতি দেন না; কিন্তু প্রয়োজন অথবা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে তাঁরাও এর বৈধতার কথা বলেন। যেমন কোনো নারীর বিয়ের সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই অথবা কোনো নারীর হিফাজতের জন্য কোনো পুরুষের প্রয়োজন; অথবা কারও অবৈধ সম্পর্কে জড়ানোর আশঙ্কা হলে এবং স্বামীর যদি আর্থিক সক্ষমতা না থাকে, তাহলে এ ধরনের বিয়ে বৈধ। আমাদের উপমহাদেশে বিয়ের ক্ষেত্রে ঘরজামাই বানানোর শর্ত যুক্তকরণও এ ধরনের বিয়ের অন্তর্ভুক্ত।

দাড়ির ব্যাপারে ড. জুহায়লির মত হলো, শাফিয়ি, হাম্বলি ও মালিকি মাজহাবমতে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম হলেও শাফিয়ি মাজহাবমতে তা 'মাকরুহ তানজিহি'। তবে জুহায়লি শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারী হওয়ায় তিনি দাড়ির ক্ষেত্রে শাফিয়ি মতেরই প্রাধান্য দেন। দাড়ি ছাঁটার ক্ষেত্রে তিনি এক মুঠোর চেয়েও ছোট করার পক্ষে, তবে একেবারে মুণ্ডন করাকে 'মাকরুহ' বলেন।

## পাঁচ. উপসংহার

ড. জুহায়লির বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, ইসলামি জ্ঞানে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁর কিছু বক্তব্য অথবা চিন্তাধারায় ভিন্নমত পোষণের সুযোগ রয়েছে এবং এগুলোর সমালোচনাও হতে পারে। তাই বলে তাঁর প্রতি আধুনিকতাবাদের অভিযোগ তোলা ঠিক নয়। কারও কারও দৃষ্টিতে তাঁর হাতে গোনা কিছু মত ব্যতিক্রমী মনে হলেও মতপ্রকাশে তিনি বিভিন্ন মাজহাবের শাখাগত নীতিমালার সঙ্গে বরাবরই সম্পৃক্ত থাকার এবং সালাফে সালিহিনের মানহাজ ও পন্থায় অটল থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ইসলামি ফিকহের ঐতিহাসিক ভান্ডার উপেক্ষা করে আধুনিকতাবাদীদের মতো ইসলামের আধুনিক রূপান্তর তাঁর পন্থা ছিল না। *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু* জুহায়লির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# তুরস্কে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন

- মুসতাফা কামাল পাশা



# মুসতাফা কামাল পাশা

## এক. জন্ম ও বংশ

মুসতাফা কামাল পাশা। মূল নাম মুসতাফা। কোনো কোনো বর্ণনামতে তার গৃহশিক্ষক গণিতে বিশেষ দক্ষতা দেখে তাকে 'কামাল' উপাধি দিয়েছিলেন। আবার কিছু জীবনীকারের মতে বিখ্যাত তুর্কি কবি নামিক কামাল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে সে নিজের নামের সঙ্গে 'কামাল' যুক্ত করে।

তুর্কি ভাষায় 'পাশা' শব্দটি মিলিটারি অথবা সোল অফিসার, যেমন জেনারেল অথবা গভর্নরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কামালও মিলিটারি এবং জেনারেল হওয়ার কারণেই এই অভিধা পায়। এ ছাড়া তাকে আতাতুর্কও বলা হয়। এর অর্থ, তুর্কি জাতির পিতা।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন গ্রিসের স্যালোনিকায় (Salonica) কামাল পাশার জন্ম। পিতার নাম আলি রিজা আফেন্দি, মায়ের নাম জুবায়দা হানিম। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রাহ.-এর ভাষ্যমতে মুসতাফা কামাল অজ্ঞাত বংশের। অর্থাৎ জুবায়দা হানিম তার মা হলেও পিতা অথবা দাদা কে ছিলেন তা অজ্ঞাত। কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফালিহ রিফকিকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, পাশা একদিন উপহাস করে বলছিল যে, আলি রিজা আফেন্দি তার পিতা নয়।

কিছু জীবনীকারের মতে মুসতাফা কামাল আতাতুর্কের পিতা ছিলেন হুসাইন আগানামি নামের এক ব্যক্তি, যিনি মূলত বুলগেরিয়ান, সার্বিয়ান অথবা রোমান ছিলেন। ফাতহি বাশির বালআবি তাঁর 'আর-রাজুলুস সানাম' প্রবন্ধে কামাল পাশার বংশ সন্দেহপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

## দুই. শিক্ষাজীবন

ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে মা তাকে গ্রামের মাদরাসায় পাঠালেও এতে তার মন বসেনি। পরে মায়ের ইচ্ছাতেই স্যালোনিকায় শামসি আফেন্দি স্কুলে ভর্তি হয়। পিতা আলি রিজা আফেন্দি কিছুদিন সরকারি চাকরি করেন, পরে এই চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে যোগ

দেন। কামালের সাত বছর বয়সে আলি রিজা মারা যান। পরে ব্যাবসার হাল তাকে ধরতে বলা হলেও সে তা উপেক্ষা করে। অধিকন্তু পরিবারের অজ্ঞাতসারে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জুনিয়র মিলিটারি হাইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেয়। এরপর ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মিলিটারি স্কুল পাশ করার পর ভর্তি হয় ইসতাম্বুলের ওয়্যার কলেজে এবং ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক সম্পন্ন করে। তারপর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে মিলিটারি স্টাফ কলেজ থেকেও স্নাতক সম্পন্ন করে।

## তিন. সেনাবাহিনীর চাকরি

স্নাতক সম্পন্ন করার পর দামেশকে উসমানি সালতানাতের সেনাবাহিনীতে স্টাফ ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগদান করে কামাল পাশা। এখানে থাকাকালে সে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রবক্তা তার্কিশ ন্যাশনাল মুভমেন্টের কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে। কামাল যদিও খিলাফতেরই বেতনভোগী এক সেনাকর্মকর্তা ছিল, তথাপি খিলাফত নির্মূলের লক্ষ্যে সেনাবিপ্লব ঘটানোর সবক সে এই দল থেকেই পায় এবং এই চিন্তা তার আশেপাশে ছড়াতে থাকে।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীতে সিনিয়র ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি হয় কামালের। এই সুযোগে সে শুরু করে সিনিয়র নেতাদের সমালোচনা। ফলে পরের বছর তাকে পূর্ব রুমেলিয়ায় (Rumelia) রেলওয়ের ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে আলবেনিয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো লেফটেন্যান্ট হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে দায়িত্ব পায় যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়ায় ইতালির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে[২১] অংশ নেয়।

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় তাকে মিলিটারি অ্যাটাচি[২২] হিসেবে পাঠানো হয়। এরপর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তার পদোন্নতি হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে সেকেন্ড আর্মির কোর কমান্ডার নির্ধারণ করা হয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে ইস্তফা দেয় কামাল পাশা। এরপর ওই বছরেরই মে মাসে উসমানি সালতানাত রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়োনা জারি করে।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল কামাল পাশা গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট সে এর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব নেয়। এরপর

---

[২১] তুবরুকযুদ্ধ (Battle of Tobruk) ১৯১১-১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ। —অনুবাদক।

[২২] Attaché : কোনো রাষ্ট্রদূতের অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তি; অ্যাটাচি বা আতাশে। —অনুবাদক।

গ্রিকদের অধিকৃত কয়েকটি তুর্কি এলাকা মুক্ত করে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের তরা মার্চ খিলাফতের কেন্দ্র ধ্বংসের মাধ্যমে পাশার গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করে। খিলাফত উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র; কিন্তু এই গণতন্ত্রের অবস্থা ছিল এমন, খোদ কামাল আতাতুর্কই লাগাতার তিন বার দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং আমৃত্যু এই পদে বহাল থাকে।

## চার. যুদ্ধ ও সংগ্রাম

কামাল পাশা ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্যালিপলির (Gallipoli) যুদ্ধে বুলগেরিয়াকে পরাস্ত করে। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে দার্দানেলিস (Dardanelles) যুদ্ধেও ইংল্যান্ডকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়।[২৩] এ কারণে তাকে কর্নেল থেকে জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ককেশাসের (Caucasus) যুদ্ধে রাশিয়ায় উসমানি সাম্রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চল স্বাধীন করে পাশা। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মে কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী এক অঞ্চলে স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য শিবির স্থাপন করে। উসমানি খলিফা ও সুলতানদের থেকে স্বাধীন হওয়াই ছিল এই শিবির স্থাপনের লক্ষ্য। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইজমিরের (Izmir) যুদ্ধে গ্রিকদের পরাস্ত করে সালতানাতের আরও কয়েকটি অঞ্চল স্বাধীন করে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলির এক বৈঠকে তাকে এর প্রধান ঘোষণা করে কমান্ডার ইন চিফ পদ দেওয়া হয়।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মুসতাফা আতাতুর্ক ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্যদেরকে তুরস্ক ছাড়তে বাধ্য করে।[২৪] ফলে জনসাধারণের মধ্যে তার অসাধারণ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি খ্যাতিমান আরবি কবি আহমাদ শাওকি তার প্রশংসায় একটি কবিতাও রচনা করেন। অবশ্য পরে কামালের 'কামালাত' প্রকাশ পেতে শুরু করলে এবং খিলাফত নির্মূলের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হলে আহমাদ শাওকি তার নিন্দা করে আরেকটি কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন,

*হিন্দুস্থান বোধহীন, মিসর বিষণ্ন*
*তোমার জন্য অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদছে।*
*শাম প্রশ্ন করছে, ইরাক এবং পারস্যও জিজ্ঞেস করছে*
*কোনো অসভ্য কি দুনিয়া থেকে খিলাফত নির্মূল করেছে?*

---

[২৩] যদিও এগুলো প্রহসন বলে অনেক ইতিহাসবিদ প্রমাণ করেছেন। —সম্পাদক।

[২৪] এটাও একটা প্রহসন এবং তা সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের মাধ্যমে পারস্পরিক লিয়াজোঁর ভিত্তিতে হয়েছিল। —সম্পাদক।

## পাঁচ. চিন্তাধারা ও মতবাদ

কামাল আতাতুর্ক ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি পার্লামেন্ট উদ্বোধনের সময় বলে, 'আমরা এখন বিংশ শতাব্দীতে অবস্থান করছি, এমন কোনো গ্রন্থ অনুসরণের প্রয়োজন এখন আর নেই, যার বিষয়বস্তু 'ত্বিন ও জায়তুন'। প্রাচ্যবিদ আর্মস্ট্রং লিখেছেন, মুসতাফা কামাল তার বন্ধুদের সঙ্গে এ কথা অনেকবার বলেছিল, 'তুরস্ক থেকে সে ইসলামের ভিত্তি নির্মূল করতে চায়।'

উসতাজ আনওয়ার জুনদির ভাষ্যমতে, কামাল পাশা মুজাহিদ বা সংস্কারক কোনোটাই ছিল না; বরং ব্রিটিশদের সেবাদাস ও জায়নবাদী ইয়াহুদিদের চর ছিল। ফাতহি বাশির বালআবি তাকে দোনমে ইয়াহুদি উল্লেখ করে এর প্রমাণে কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। দোনমে ইয়াহুদি বলতে বোঝায়, যারা মূলে ইয়াহুদি হলেও নিজেদের মুসলিম বলে প্রকাশ করে। এদের লক্ষ্য থাকে ইসলামের ক্ষতিসাধন করা। ১৭০০ শতাব্দীতে দোনমে শব্দটি উসমানি খলিফারা সেসব ইয়াহুদির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন, যারা খিলাফতের অধীন স্যালোনিকায় বসবাস এবং নিজেদের মুসলিম বলে প্রকাশ করত। মুসতাফা কামালের জন্মও এই অঞ্চলে।[২৫]

ফাতহি বাশির বালআবি তাঁর প্রবন্ধে মুসতাফা কামালের প্রতি এই আপত্তি তোলেন, নারী ও মদের আসক্তি এবং বড় হওয়ার উন্মাদনা ছিল তার মধ্যে প্রবল। প্রবন্ধটিতে তিনি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

## ছয়. ইসলামবিরোধী সংবিধান প্রণয়ন

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ মার্চ তুরস্কের ফৌজদারি আইন ইতালীয় ফৌজদারি আইনে পরিবর্তন করা হয়। ৪ অক্টোবর ইসলামি বিচারালয়সমূহ বন্ধ করে সুইজারল্যান্ডের অনুকরণে দেওয়ানি আইন চালু করা হয়। এই আইন অনুসারে নারীরা উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদে পুরুষের সমান ভাগ পায়। তালাক দেওয়ারও অধিকার দেওয়া হয় নারীদের। তবে এই তালাক আদালতেই দিতে হবে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে এক আইনের মাধ্যমে ইংরেজি হ্যাট পরার প্রথা চালু করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের জন্য একে করা হয় বাধ্যতামূলক।

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কের সংবিধান থেকে দেশটি 'ইসলামি রাষ্ট্র' এ কথা অপসারণ করা হয়। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি ভাষায় আরবি হরফে লিখিত বইপত্রের প্রচার-প্রসার নিষিদ্ধ করা হয়। তার বদলে চালু করা হয় ল্যাটিন হরফ। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজনীতিতে নারীদেরকে পুরুষের সমানাধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্ট নির্বাচনে

---

[২৫] atajew.com ওয়েবসাইটে তার ইয়াহুদি হওয়ার কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়। এ ছাড়া জার্মান আইন অনুযায়ী ব্যাবসানীতি প্রণয়ন করা হয়।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ধর্ম মন্ত্রণালয় বিলোপ করা হয়। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন মসজিদসমূহ বন্ধ করা হয়। ১৯৩১-৩২ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয়। ৩ শতাধিক সরকারি খতিব নির্বাচন করে তাদেরকে জুমুআয় বক্তব্য দেওয়ার জন্য চাষাবাদ, কারিগরি ও রাজনীতি ইত্যাদি কিছু বিষয় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। ইসতাম্বুলের দুটি বড় মসজিদ—আয়া সোফিয়াকে জাদুঘর এবং মাসজিদ আল ফাতিহকে রাষ্ট্রীয় গুদাম বানানো হয়। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জুমুআর দিনের রাষ্ট্রীয় ছুটি নিষিদ্ধ করে রবিবার ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসতাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া অনুষদ পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আরবি ও ফারসি পুরোদস্তুর বিলোপ করা হয়। মুসলিমদের ইদুল আজহা ও ইদুল ফিতরকে অর্থহীন সাব্যস্ত করা হয়।

কামাল পাশার নির্দেশে আরবি আজানের পরিবর্তে তুর্কি ভাষায় আজানের প্রচলন করা হয়। প্রথম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সহশিক্ষা আবশ্যক করা হয়। সাধারণ স্থানসমূহে নারীদের হিজাব ও পর্দার বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়। নতুন-পুরনো সব স্কুল ও মাদরাসার জন্য মার্কিন শিক্ষাবিদ এনে প্রণয়ন করা হয় আধুনিক শিক্ষাক্রম এবং একে বাধ্যতামূলক করা হয়।

শাকিব আরসালান বলেন, মুসতাফা কামালের শাসন শুধু ফরাসি অথবা ব্রিটিশ শাসনের মতো নয়; বরং তার চেয়ে আরও দু হাত অগ্রসর ছিল। কারণ, ফ্রান্স অথবা ব্রিটেনে ধর্ম বা মতাদর্শভিত্তিক বিভাজন থাকলেও কখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে বাইবেলের লেখ্যরীতি পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি; অথবা চার্চকে অর্থহীন আখ্যা দেওয়া হয়নি। অথচ রাশিয়া যেমন ধর্মের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিল, মুসতাফা কামালের সরকার তার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

প্রাচীন সুফিবাদ বন্ধ করে এর চর্চায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কিছু খানকা জাদুঘরে রূপান্তরিত করে কামাল পাশার সরকার। এসব খানকায় ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতা দেওয়া হয়। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করে 'State Art and Sculpture Museum'।

পশ্চিমা অপেরা-ব্যালে মিউজিকের প্রচলন করা হয়। হিজরি বর্ষপঞ্জির বদলে খ্রিষ্টীয়-বর্ষপঞ্জি চালু করা হয়। একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মুসতাফা কামালের এসব কর্মকাণ্ডকে পরবর্তীকালে কামালবাদ (Kemalism) বা আতাতুর্কবাদ (Ataturkism) আখ্যা দেওয়া হয়।

## সাত. মৃত্যু

হৃদরোগ ও মেরুদণ্ডের ব্যথাজনিত কারণে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর কামাল পাশা মারা যায়। কিছু জীবনীকারের মতে তার এই অসুস্থতা অধিক মদপানের কারণেই ছিল। তুরস্কের আঙ্কারায় তাকে সমাহিত করা হয়। ফাতহি বালআবির বর্ণনা অনুযায়ী কামাল মৃত্যুর আগে তার জানাজার নামাজ না পড়ার আদেশ দিয়ে যায়।

## আট. সারকথা

উপর্যুক্ত আলোচনায় মুসতাফা কামাল পাশার স্বৈরতন্ত্র, ইসলামবিরোধিতা ও ধর্মহীনতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। যারা কামাল পাশাকে নিজেদের আদর্শ ও অনুসরণীয় মনে করে, তাদের দেখে আমাদের বিস্ময় জাগে। এদের মতো লোকদের ব্যাপারে কুরআনের নিচের আয়াতগুলো পাঠ করাই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন :

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ﴾

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনোই গ্রাহ্য হবে না। আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন। কী করে আল্লাহ সে সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেবেন, যারা ইমান আনার পর ও রাসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর আবারও কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করে? জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা পথপ্রদর্শন করেন না। এদের কর্মফল হলো—তাদের ওপর মহান আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত। [সুরা আলে ইমরান : ৮৫-৮৭]



তৃতীয় অধ্যায়

# হিন্দুস্থানে আধুনিকতাবাদ আন্দোলন

- স্যার সাইয়্যিদ আহমাদ খান
- গোলাম আহমাদ পারভেজ
- প্রফেসর ড. তাহির আল কাদরি
- মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান
- জাবেদ আহমাদ গামিদি



# স্যার সাইয়িদ আহমাদ খান

## এক. জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন

স্যার সাইয়িদ আহমাদ খান ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তাঁর পূর্বপুরুষেরা আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশ থেকে দিল্লি এসেছিলেন। অন্য মতে, সাইয়িদ আহমাদের পূর্বপুরুষেরা আরব থেকে এসেছিলেন। এঁরা মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নানা ছিলেন দ্বিতীয় আকবর শাহের মন্ত্রী। কিছুদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূতও ছিলেন। পিতা মুহাম্মাদ মুত্তাকিও ছিলেন দ্বিতীয় আকবর শাহের বিশেষ উপদেষ্টা।

সাইয়িদ আহমাদ খান উর্দু ও ফারসি ভাষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন স্থানীয় গ্রাম ও শহরে। পিতার সঙ্গে শৈশব থেকেই তিনি আকবর শাহের দরবারে যেতেন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ তাঁকে 'আরিফে জঙ্গ' ও 'জাওয়াদুদ দাওলাহ' উপাধি দেন। এ সময় বাহাদুরশাহ জাফরের দরবারে তিনি চাকরির সুযোগ পেলেও তা গ্রহণ করেননি। মোগল সাম্রাজ্যের অব্যাহত পরাজয় ও অধঃপতন দেখে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরিকেই প্রাধান্য দেন। এরপর আগ্রায় এক বিচারালয়ে 'ক্লার্ক' হিসেবে যোগদানের পর ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে 'মুনশি' পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মুরাদাবাদ আদালতের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন তিনি। এখানে থাকাবস্থায়ই তাঁর গবেষণাকর্মের সূচনা করেন। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড সফর করেন। সফর থেকে ফিরে এসেই কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর আলিগড়ে স্থায়ী নিবাস গড়েন।

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সাইয়িদ আহমাদ ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এডুকেশন কমিশন এবং ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সিএসআই উপাধি পান। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (University of Edinburgh) থেকে এলএলডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মার্চ সাইয়িদ আহমাদ খান মৃত্যুবরণ করেন। জীবনীকারগণ তাঁর জীবনকাল তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন :

## দুই. জীবনের প্রথম ভাগ

সাইয়িদ আহমাদ খানের জীবনের প্রথম ভাগ তাঁর জন্ম থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ে তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যবাদের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যদিও আধুনিকতার কিছুটা ঝোঁক এবং অনুরাগ তখনো তাঁর মধ্যে ছিল। এই সময় তিনি ফারসি ভাষায় *জামে জম* নামে মোগল বাদশাহদের সংক্ষিপ্ত এক ইতিহাসগ্রন্থ সংকলন করেন। এ ছাড়া মাজহাব, চরিত্র এবং তাসাওউফ-সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থও রচনা করেন। *রাহে সুন্নাত ওয়া বিদআত* নামে এক গ্রন্থে তাকলিদের বিরোধিতা করেন। শিয়াদের খণ্ডনে *তুহফায়ে হাসান* নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ঐতিহ্যগত পির-মুরিদির বিরুদ্ধে *কালিমাতুল হাক্ক* নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আবু হামিদ গাজালির *কিমিয়ায়ে সাআদাত* গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদও অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থসমূহে সাইয়িদ আহমাদ খানকে ইমাম গাজালি, সাইয়িদ আহমাদ বেরেলবি এবং শাহ আবদুল আজিজ প্রমুখ কর্তৃক প্রভাবিত হতে দেখা যায়। এ ছাড়া গণিত বিষয়েও কিছু পুস্তিকা রচনা করেন তিনি।

সাইয়িদ আহমাদ খান কৃত এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে *আসার আস-সানাদিদ* অন্যতম। এতে তিনি দিল্লির প্রাচীন নির্মাণ ও স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি পরবর্তী সময়ে ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। এ ছাড়া আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরি* গ্রন্থের বিশ্লেষণ ও প্রচার তাঁর জীবনের প্রথম ভাগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্ম। মির্জা আসাদুল্লাহ গালিবকে এই গ্রন্থের অভিমত লিখতে বললে তিনি একটি ফারসি কবিতা লিখে দেন। পাশাপাশি সাইয়িদ আহমাদকে ইঙ্গিতে অতীতের মতো সময় অপচয় না করারও উপদেশ দেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতাযুদ্ধে স্যার সাইয়িদ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের একজন বিশ্বস্ত অনুচর। কয়েকজন ইংরেজকে তিনি নিজের কাছে আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। অবশ্য যুদ্ধ শেষে ইংরেজ সরকারের কড়া সমালোচনা করে *আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ* নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

## তিন. দ্বিতীয় ভাগ

১৮৫৭ থেকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ভাগ ধরা হয়। এই ভাগে তাঁর মধ্যে উন্নত জীবনযাপন এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই সময়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলোর মধ্যে *আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ* একটি শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম।[২৬] এই গ্রন্থে যারা স্বাধীনতাযুদ্ধকে মুসলিমদের

[২৬] একদিকে বলা হচ্ছে আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ গ্রন্থটি সাইয়িদ আহমাদ ইংরেজ সরকারের সমালোচনায়

পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্র আখ্যায়িত করেছিল, স্যার সাইয়িদ তাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে বলেন, 'স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল ইংরেজ সরকার কর্তৃক মুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ; এতে অন্য কোনো মুসলিম দেশের ষড়যন্ত্র ছিল না।'

মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করতে স্যার সাইয়িদকে 'ধর্মীয় একাত্মতা'র নীতি গলাধঃকরণ করানো হয়। এরই ফলে তিনি *তাহকিকে লফজে নাসারা* বা নাসারা শব্দের বিশ্লেষণ এবং *রিসালা-ই আহকামে তআমে আহলুল কিতাব* বা সাধারণ আহলে কিতাবের বিধান নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। এ ছাড়া *তাবয়িনুল কালাম* নামে বাইবেলের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করলেও বিভিন্ন কারণে তা সমাপ্ত হয়নি। এসব ছাড়াও তিনি *সাইন্টিফিক সোসাইটি* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন, যা পরে *আলিগড় ইন্সটিটিউট গ্যাজেট* নামে প্রকাশিত হতো।

## চার. তৃতীয় ভাগ

১৮৬৯ থেকে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে স্যার সাইয়িদের জীবনের তৃতীয় বা শেষ ভাগ ধরা হয়। এই ভাগে তাঁর মধ্যে পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ লক্ষ করা যায়। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ড যান। এই সময়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাকর্মের মধ্যে *খুতুবাতে আহমাদিয়া* একটি। এটি রচনার কারণ ছিল প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম ম্যুরের (Sir William Muir) *দ্য লাইফ অব মুহাম্মাদ* গ্রন্থ। উইলিয়াম তার এই গ্রন্থে রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে জঘন্য অপবাদ আরোপের পাশাপাশি নানা বিষয়ে নবিজির সমালোচনা করে। তার জবাবেই স্যার সাইয়িদ ইংল্যান্ডে থাকাকালে এটি রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রথমে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হলেও পরে এটি ইংরেজিতেও অনূদিত হয়।

জীবনীকারেরা লিখেছেন, এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে সাইয়িদ আহমাদ খান নিজের ঘরবাড়িসহ সব আসবাব বিক্রি করে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে তিনি প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে রাসুল ﷺ-এর জীবনের সব যুদ্ধকে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন। এ ছাড়া এই সময়টাতে তিনি তাঁর কালজয়ী তাফসির লেখার কাজও শুরু করছিলেন। এতে তিনি ফিতরাত বা প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দর্শন প্রকাশ

---

লিখেছেন। অপরদিকে বলা হচ্ছে, তখন সরকারের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল! এখানে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এর সমাধান হচ্ছে, সুসম্পর্ক মূলত যুদ্ধের সূচনায় অর্থাৎ, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে ছিল, তখন তিনি তাদের অনুগত ছিলেন। যে কারণে ইংরেজদের আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে না-হতেই সেই সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়; আর এ সময়ই তিনি *আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ* রচনা করেন। —অনুবাদক

করেন। তবে কাজটি তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি, ১৭ পারা পূর্ণ করার পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলোচিত এই তাফসিরে তিনি উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের আধুনিক সব ব্যাখ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে কুরআনকে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখাবার চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি কুরআনের আয়াতকে বিজ্ঞানের নানা মূলনীতি ও যুক্তি অনুযায়ী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এতটাই তাবিল বা দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন, যার ফলে বিরোধীদের কাছে তিনি 'প্রকৃতিবাদী' আর তাঁর এই চিন্তাধারা 'প্রকৃতিবাদ' বিশেষণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি কুফরের ফাতওয়াও জারি করা হয়।

এই সময় তিনি *তাহজিবুল আখলাক* নামে একটি সাময়িকী চালু করেন। পরবর্তীকালে এতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ এ নামেই আলাদা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। স্যার সাইয়িদের অনুসারীরা এই সময়কে তাঁর গবেষণার বিপ্লবকাল মনে করেন।

লন্ডনে ইংরেজদের শিক্ষাপদ্ধতি ও সমাজব্যবস্থা দেখে তিনি বেশ প্রভাবিত হন। সম্ভবত সে কারণেই লন্ডন থেকে ফেরার পর 'হিন্দুস্থানি মুসলিমদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মুসলিম ও হিন্দু বিদ্বৎসমাজের প্রতি আবেদন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রচার করেন। এরপর 'মুসলিম শিক্ষা উন্নয়ন প্রস্তাবনা কমিটি' নামে বোর্ড গঠন করে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ের নকশা প্রস্তুত করেন। পাশাপাশি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাঁদা উত্তোলনের জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করেন। অবশেষে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি 'মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ আলিগড়' নামে রূপান্তরিত হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিমদের জন্য শুধু ইংরেজি শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না; বরং একটি রাজনৈতিক বিপ্লবও ছিল। আকবর ইলাহাবাদিসহ অনেক মুসলিম পণ্ডিত সাইয়িদ আহমাদের এই কর্মপদ্ধতি এবং ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের কড়া সমালোচনা করেছেন।

শুরুর দিকে সাইয়িদ আহমাদ খান হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সমর্থক থাকলেও পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মোকাবিলায় প্যাট্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি পরিষদ গঠন করেন। হিন্দি-উর্দু বিতর্কে বরাবরই তিনি ছিলেন উর্দুর শক্ত সমর্থক। তা ছাড়া হিন্দুস্থানের মুসলিমদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক অধিকারের প্রবক্তাও ছিলেন তিনি।

সাইয়িদ আহমাদ খানের বিশেষ ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে মাওলানা শিবলি, নাওয়াব হাসান

মালিক, নওয়াব ওয়াকার মালিক, আলতাফ হুসাইন হালি, মাওলানা নাজির হুসাইনের মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিরা ছিলেন।

সবকিছুর পরে স্যার সাইয়িদ আহমাদ খান ছিলেন শক্তিশালী একজন মুসলিম রাজনীতিক। তিনি মনে করতেন, উন্নত ও প্রগতিশীল ইংরেজদের থেকে স্বল্পোন্নত ও অনগ্রসর মুসলিমদের স্বাধীনতালাভ অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি মুসলিমদেরকে ইংরেজদের আনুগত্য, তাঁদের ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান শেখা এবং সংস্কৃতি গ্রহণের পরামর্শ দিতেন।

## পাঁচ. স্যার সাইয়িদের আকিদা-বিশ্বাস

সাইয়িদ আহমাদ খান *তাফসিরুল কুরআন* নামে কুরআনের প্রায় ১৭ পারার তাফসির রচনা করেন। গ্রন্থটির শুরুতে ২০ পৃষ্ঠাজুড়ে তিনি তাফসিরকরণের ১৫টি মূলনীতি উদ্ধৃত করেছেন। এই মূলনীতিগুলোর কিছু সঠিক হলেও অনেক মূলনীতি স্পষ্টভাবেই ভুল। এসব মূলনীতির সারসংক্ষেপ আমরা তাঁর ভাষাতেই তুলে ধরছি :

১. এ কথা স্বীকৃত যে, সৃষ্টিজগতের সকল অস্তিত্বের নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।

২. এটাও স্বীকৃত যে, তিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবি পাঠিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ সত্য ও শেষ নবি।

৩. কুরআন মাজিদ ঐশীবাণী, এটাও স্বীকৃত।

৪. কুরআন মাজিদ শব্দসহ রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে বা ওহিরূপে এসেছে। সাধারণ আলিমদের মতে কুরআন মাজিদ ফেরেশতা জিবরিলের মাধ্যমে শব্দসহ রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হলো নবুওয়াতের মালাকা 'রুহুল আমিন' রাসুলের হৃদয়ে ইলকা করেছেন। অবশ্য কেবল মূল বিষয়ই নবিজির হৃদয়ে ইলকা করা হতো; আর তিনি নিজের ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন—এমনটা সঠিক নয়।

৫. কুরআন পরিপূর্ণ সত্য, কোনো ভুল অথবা বাস্তবতাবিরোধী বক্তব্য এতে নেই।

৬. কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সুবুতি ও সালবি উভয় শ্রেণির সব সিফাতই সত্য ও সঠিক। তবে এসবের মাহিয়াত বা প্রকৃত রূপ ও গূঢ় রহস্যের উপলব্ধি মানুষের বোধের বাইরে।

৭. আল্লাহ তাআলার সিফাত বা গুণাবলি পৃথক পৃথক অস্তিত্ব ও সত্তা, এগুলো তাঁর

অস্তিত্বের মতোই অবিনশ্বর ও লয়হীন; আর অস্তিত্বের দাবি গুণাবলির প্রকাশ।

৮. আল্লাহ তাআলার সকল সিফাত সাধারণ অর্থেই অসীম; সীমাবদ্ধ নয়।

৯. কুরআনে অতিপ্রাকৃত (Super Natural) কোনো বক্তব্য নেই। তবে আমাদের অনেকেই এ কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কুরআনের কিছু মুজিজা বা অলৌকিক বিষয়কে তাঁরা অতিপ্রাকৃত আখ্যা দিয়ে বলতে চান, কুরআনে অতিপ্রাকৃত মুজিজা রয়েছে। আমরা তাঁদের মতামত বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে বলি—'কুরআনের যে আয়াত আপনি উপস্থাপন করে তাকে মুজিজা ও অতিপ্রাকৃত হওয়ার প্রমাণ পেশ করছেন, তার ভিন্ন কোনো অর্থ থাকার সম্ভাবনা কি নেই? আরবদের ভাষা ও কথা অনুযায়ী তার ভিন্ন ব্যাখ্যাও তো হতে পারে; অথবা বাগ্‌ধারা, নির্দিষ্ট ব্যবহার, রূপক অর্থ প্রভৃতির বিবেচনায় ভিন্ন কোনো অর্থও তো দাঁড়াতে পারে এ আয়াতের। আর এমন না হলে আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে, আমাদের এই মূলনীতি ভুল ও অবাস্তব। তবু আমরা বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, কুরআনে অতিপ্রাকৃত কোনো মুজিজা নেই।

১০. কুরআন মাজিদ যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছে, তা পরিপূর্ণই বিদ্যমান। এর একটা হরফ কমেনি অথবা বাড়েনি।

১১. এক আয়াতের সঙ্গে আরেক আয়াতের সংশ্লিষ্টতা যুক্তিযুক্ত ও বিন্যস্ত।

১২. কুরআন মাজিদে 'নাসিখ' ও 'মানসুখ' তথা এক আয়াতের মাধ্যমে আরেক আয়াত রহিত হয়েছে এমন নেই।

১৩. কুরআন মাজিদ একসঙ্গেই পূর্ণ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়নি; বরং ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে।

১৪. পৃথিবীর প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তু ও সৃষ্টির বিষয়ে আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলেছেন, সবই কোনো-না-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেছেন। তাঁর বক্তব্য সৃষ্টি অথবা অস্তিত্বশীলের বিপরীত কিংবা সৃষ্টি অথবা অস্তিত্বশীল তাঁর বক্তব্যের বিরোধী হতে পারে না। কোথাও কোথাও আমরা বক্তব্যকে 'ওয়ার্ড অব গড' এবং তাঁর কর্মকে 'ওয়ার্ক অব গড' বলে ব্যক্ত করেছি। সঙ্গে এটাও বলেছি যে, 'ওয়ার্ড অব গড' এবং 'ওয়ার্ক অব গড' অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কখনো যদি 'ওয়ার্ড' কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই 'ওয়ার্ক'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা 'ওয়ার্ড অব গড'ই নয়।

১৫. এটাও স্বীকার করতে হবে, কুরআন মাজিদ শব্দের বিবেচনায় মূলত আল্লাহ

তাআলারই কালাম; কিন্তু তা আরবিতে কোনো মানুষের মুখে পঠিত হলে কেউ অধিকতর শুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলার মতোই ধরে নিতে হবে। মানুষের কথাবার্তায় ব্যবহৃত রূপকার্থ, উপমা, দৃষ্টান্ত বা যৌক্তিক ও বিশ্লেষণমূলক বা সম্বোধন ও আপত্তিমূলক বক্তব্যের মতোই বিবেচিত হবে।[২৭]

স্যার সাইয়িদ আহমাদ খানের তাফসিরের মূলনীতিগুলোর নবম মূলনীতিটি সবচেয়ে ভ্রষ্টতাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন। এই নীতি অনুযায়ী কুরআনের কোনো বক্তব্য অথবা ঘটনা অতিপ্রাকৃত নয়। এই 'অতিপ্রাকৃত নীতি'র প্রমাণে তিনি শেষ মূলনীতির সহায়তায় ইসলামের সর্বসম্মত আকিদা-বিশ্বাসের বিপরীতে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের এমন দুর্লভ ব্যবহারের কথা দিয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আসলেই অগ্রহণযোগ্য। এই মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি কুরআন মাজিদে নবি ও রাসুলদের মুজিজাসমূহের আশ্চর্যজনক ও বিরল সব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। যেমন নবি মুসা আ.-এর ঘটনায় লাঠির আঘাতে সমুদ্রের ভাগ হওয়া এবং সমুদ্রের পানি প্রাচীরের মতো দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাখ্যা করেছেন 'জোয়ার ও ভাটা' দিয়ে।

বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনায় গরু জবাই করে গোশতের একটা টুকরো তার প্রতি নিক্ষেপ করলে সে পুনর্জীবিত হয়—এর ব্যাখ্যায় স্যার সাইয়িদ বলেন, মৃতকে জীবিত করার অর্থ অজ্ঞাত হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া গেছে।

বনি ইসরাইলকে আজাব হিসেবে বানরে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে তিনি বলেন, এর অর্থ বনি ইসরাইলের জন্য বানরের মতো লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়া বোঝানো হয়েছে।

নবি উজাইরের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এটি মূলত স্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে নিজের মৃত গাধার হাড্ডি একত্রিত হওয়া এবং তাকে গাধার রূপধারণ করতে দেখেছেন।

ইসা আ.-এর আসমানে আরোহণের ব্যাপারে তিনি বলেন, তিনি অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছেন তবে শূলে নয়; বরং স্বাভাবিকভাবেই। আসমানে আরোহণ ও পুনরায় প্রত্যাবর্তনের যে বিশ্বাস মুসলিমরা পোষণ করেন, তা মূলত খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস।

এভাবে নবি ইসা আ. কর্তৃক পাখির মূর্তিতে ফুঁক দিলে তা উড়ন্ত পাখি হওয়ার মুজিজা অস্বীকার করে তিনি বলেন, কুরআনের কোথাও এটা বলা হয়নি যে, পাখির মূর্তিতে ফুঁক দিলে তা উড়ে যেত; বরং ইসা আ.-এর কাছে এক পুতুল ছিল—শিশুরা যেমন মাটি দিয়ে পুতুল বানায়—তিনি এটি হাতে করে ওড়াতেন।

ইসা আ.-এর মৃত মানুষ জীবিত করার মুজিজাকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা তাঁকে অস্বীকার করত, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

---

[২৭] *তাফসিরুল কুরআন* : ১/১৯-৩৬।

মুসা আ.-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার মুজিজার ব্যাপারে তিনি বলেন, বাস্তবে লাঠিটি যদিও আপন রূপেই ছিল; কিন্তু উপস্থিত লোকদের কল্পনায় তা সাপের রূপ ধারণ করে। অপরদিকে জাদুকরদের লাঠি এবং রশিও বাস্তবে সাপ হয়নি। অর্থাৎ মুসা ও জাদুকরদের লাঠি এবং রশি একই রকম ছিল।

বদরের ময়দানে ১ হাজার ফেরেশতার অবতরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইরত মুমিনদের হৃদয়ে হাজার গুণ দৃঢ়তা ও অবিচলতা দান করেন।

নবি ইসা আ.-এর পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণের মুজিজা তিনি অস্বীকার করেন। এমনকি ইবরাহিম আ.-কে আগুনে নিক্ষেপকেও তিনি 'ধারণাপ্রসূত' বলে মন্তব্য করেন। এ ছাড়া মাছের পেটে নবি ইউনুস আ.-এর থাকার কথা অস্বীকার করে বলেন, বাস্তবে মাছ তাঁকে মুখে ঢোকালেও পরে ছেড়ে দেয়।

কুরআনে বর্ণিত 'মালায়িকা'কে তিনি 'কুওয়ায়ে মালাকুত' বা 'প্রভুত্বের ক্ষমতা' বলে ব্যাখ্যা করেন। জিবরিলের অর্থ করেছেন 'আল্লাহর কুদরত' বা 'আল্লাহর কুওয়াত' বলে। শয়তানের ব্যাখ্যা করেছেন মানুষ শয়তান। জিন সম্প্রদায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, এরা বিশেষ শ্রেণির কিছু জন্তু অথবা নির্বোধ দস্যু প্রকৃতির লোক। মানুষ ও প্রাণীর আত্মাকে তিনি একই ধরনের জীবাত্মা বলে মনে করেন। এ ছাড়া তিনি জাদুকে বিশেষ চুম্বকশক্তি উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে মানুষকে সম্মোহিত (Hypnotize) করা হয়।

পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে স্যার সাইয়িদ আহমাদের আকিদা হলো, মানুষের শরীর থেকে যখন আত্মা বেরিয়ে যায়, তারপরে তা দুনিয়ার শরীর অথবা নতুন কোনো শরীরের সঙ্গে জীবিত হবে না; বরং আত্মাই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে একটি শরীরের অধিকারী। এই শরীর নিয়েই তা পরকালে উপস্থিত হবে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে তিনি আখিরাতে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের কথাই বলতে চান; শারীরিক জীবন নয়।

জান্নাতের নিয়ামত আর জাহান্নামের শাস্তির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হলো, এগুলো শান্তি ও দুঃখ বর্ণনার বিশেষ ভঙ্গি মাত্র। জান্নাত অর্থ কোনো বস্তুগত স্থান নয়, যেখানে নারী থাকবে অথবা বিরাট বিরাট প্রাসাদ থাকবে; বরং এক বিশেষ আত্মিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকেই জান্নাত বলে প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে জাহান্নাম অর্থও কোনো বস্তুগত স্থান নয়; বরং এর অর্থ বিশেষ প্রকারের অস্থিরতা ও যন্ত্রণা।

এ ছাড়া রাসুল ﷺ-এর মিরাজের ঘটনাকে তিনি স্বপ্নে বায়তুল মাকদিস এবং আকাশে পরিভ্রমণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সুরা মায়িদার তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা ১২ ধরনের জিনিস খাওয়া হারাম করেছেন, পঞ্চম প্রকারের ব্যাপারে তিনি নিঃশর্তে বলেছেন, 'কোনো হালাল প্রাণী গলা

টিপে হত্যা করা হলে তা খাওয়া হারাম'—অথচ সাইয়িদ আহমাদ খান এর তাফসিরে বলেন, 'এ ধরনের বৈধ প্রাণী কোনো আহলে কিতাব যদি গলা টিপে হত্যা করে, তাহলে সেটা হালাল।'

## ছয়. উপসংহার

স্যার সাইয়িদ আহমাদ খানকে তাঁর চিন্তাধারা ও মতাদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পাক-ভারত উপমহাদেশে আধুনিক মুতাজিলা মতবাদের প্রধান বলা চলে। প্রাচীন মুতাজিলারা দীনের এত অপব্যাখ্যা করেনি, যতটুকু তিনি করেছেন। প্রাচীন মুতাজিলাদের উদ্দেশ্য ছিল গ্রিক দর্শনকে ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস ও ইমান-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; অথচ আধুনিক মুতাজিলা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পশ্চিমা চিন্তাধারা ও দর্শনের সঙ্গে ইসলামের শুধু একাত্মতা প্রমাণ করাই নয়; বরং এক ধাপ এগিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গেও ইসলামকে সুসমঞ্জস করে তোলা।

বস্তুত স্যার সাইয়িদ আহমাদ খানের তাফসির অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমী মতামত, বিচ্যুতি ও কুফরি বক্তব্যে ভরা। এ ছাড়া তিনি ইসলামের সর্বসম্মত আকিদা-বিশ্বাস, ইমান-সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াদি এবং কুরআন-হাদিসের বক্তব্যকে ব্যতিক্রমী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে অকপটে ও অব্যাহতরূপে উপহাস করেছেন। এ কারণে যখন তাঁর প্রতি অভিযোগ করে বলা হয়েছিল যে, দূর অতীতের মুতাজিলারাও গ্রিক দার্শনিক চিন্তাধারা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে নস বা কুরআন-হাদিসের বাণীকে ব্যাখ্যা করেছে, পরে যখন সেই দর্শনের ভুল ধরা পড়ল, তখন তাদের কৃত সেই ব্যাখ্যাগুলোও ভুল প্রমাণিত হলো। তাই অদূর ভবিষ্যতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের এরূপ উন্নতি সাধন হতে পারে, যখন তা বর্তমানের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে—যে পদ্ধতিতে আপনি তাফসির রচনা করেছেন—ভুল প্রমাণিত করে, তখন আপনি কী করবেন? স্যার সাইয়িদ এর উত্তরে বলেন, 'আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান যদি ভবিষ্যতে এমন উন্নতি সাধন করে, যা থেকে বর্তমানের প্রমাণিত বিষয়াদি ভুল বলে প্রমাণিত হয় এবং সে সময়ের বিজ্ঞান বাস্তবমুখী মনে হয়, তখন আমরা কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করব এবং বুঝে নেব যে, কুরআনের যে অর্থ আমরা আগে করেছি, তা আমাদের ভুলেরই ফলাফল। কেননা, আল কুরআন সব ধরনের ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত।'[২৮]



[২৮] তাফসিরুল কুরআন : ১/২০।



# গোলাম আহমাদ পারভেজ

## এক. জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন

গোলাম আহমাদ পারভেজের জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই পাঞ্জাবের বাটালা শহরের গুরুদাসপুরে। তার দাদা হাকিম মৌলবি রহিম বখশ ছিলেন আলিম এবং চিশতিয়া নিজামিয়া ধারার দরবেশ। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে পারভেজ ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে চাকরি নেয়। এ সময় ড. ইকবালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে বলেও জানা যায়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সে *তুলুয়ে ইসলাম* নামে একটি মাসিক পত্রিকা চালু করে।

শুরুর দিকে সে মাওলানা মওদুদির সাথিদের একজন ছিল। বলা হয় সে-ই ড. ইকবাল ও চৌধুরী নিয়াজ আলি খানের কাছে পাঠানকোটের ইসলামি গবেষণাসংস্থা দারুল ইসলামের জন্য মওদুদির নাম পেশ করেছিল; কিন্তু পরে পারভেজ হাদিস অস্বীকার করলে মাওলানা মওদুদির সঙ্গে তার তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। গোলাম আহমাদের মতামত খণ্ডন করে মাওলানা মওদুদি *সুন্নাত কি আইনি হাইসিয়াত* বা *সুন্নাতের আইনগত অবস্থান* নামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বিবেকবুদ্ধি, যুক্তি এবং প্রমাণের সাহায্যে গোলাম আহমাদের ভ্রান্ত অভিমত সমূলে উৎপাটিত করেন।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় পারভেজ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে। এরপর করাচিতে সে কুরআনের দারস শুরু করে। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে লাহোরে চলে আসে। এ বছরই ফেব্রুয়ারিতে সে মারা যায়।

পারিবারিক জীবনে বিবাহিত হলেও পারভেজের কোনো সন্তান ছিল না। তবে তার তুলুয়ে ইসলাম ট্রাস্ট, কুরআনিক রিসার্চ সেন্টার, কুরআনিক এডুকেশন সোসাইটি এবং পারভেজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি ইত্যাদির কার্যক্রম এখনো চলমান। পারভেজের এক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব এই ছিল যে, সে ছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতা-আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তা ছাড়া একসময় কায়িদে আজম মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহর বিশেষ উপদেষ্টাও ছিল। তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের কারণে তার চিন্তাধারা পাকিস্তানের শাসকশ্রেণিকেও প্রভাবিত করে।

## দুই. লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম

গোলাম পারভেজ বিভিন্ন বিষয়ে বইপুস্তক লিখেছে। এসব রচনায় নিজের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ সে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্যে *মাআরিফুল কুরআন, মাফহুমুল কুরআন, মাতালিবুল কুরআন, লুগাতুল কুরআন, তাবউয়িবুল কুরআন, নিজামে রুবুবিয়াত, তাসাওউফ কি হাকিকাত, সালিমকে নাম, তাহিরাকে নাম, কুরআনি ফ্যায়সালে, শাহকারে রিসালাত, বারকে তুর, জুয়ে নুর, জাহানে ফারদা, ইবলিস ওয়া আদম, মাকামে হাদিস, মাজাহিবে আলম কি আসমানি কিতাবেঁ, আসবাবে জাওয়ালে উম্মত, মিরাজে ইনসানিয়াত, ইনসান কিয়া সোচা, ইসলাম কিয়া হ্যায়, শুলায়ে মাসতুর* এবং *কিতাবুত তাকদির* উল্লেখযোগ্য।

## তিন. চিন্তাধারা ও মতবাদ

গোলাম পারভেজ কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অস্বীকার করে। সে ছিল স্রেফ আরবি ভাষার সাহায্যেই সঠিকভাবে কুরআন অনুধাবনের প্রবক্তা। এই মতের পক্ষে সে নতুন কিছু মতবাদ এবং চিন্তাধারারও জন্ম দেয়।

পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদিস অস্বীকারকারী প্রথম ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ চাকড়ালবি। এরপর মৌলবি আহমাদ উদ্দিন অমৃতসরি এই চিন্তাধারাকে আরও পুষ্ট করে। তারপর হাফিজ আসলাম জয়রাজপুরি এই চিন্তাকে আরও বিন্যস্ত ও সজ্জিত করে। এভাবে গোলাম আহমাদ পারভেজ হাদিস ও সুন্নাহ অস্বীকারের চিন্তাধারাকে একটি নিয়মতান্ত্রিক মতাদর্শে রূপ দিতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া মৌলবি মুহিব্বুল হক আজিমাবাদি, তামান্না ইমাদি, নিয়াজ ফতেহপুরি, আল্লামা মাশরিকি প্রমুখ ব্যক্তিরাও হাদিস অস্বীকারের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

নিচে গোলাম পারভেজের আল্লাহ, রাসুল, আখিরাত, ফেরেশতা ও কুরআনের ওপর ইমান কেমন ছিল, তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো :

## চার. আল্লাহর প্রতি ইমান

গোলাম আহমাদ পারভেজের ধারণা, কুরআনে যেখানেই 'আল্লাহ' শব্দ এসেছে, তা এসেছে আল্লাহর সত্তা বুঝাতে নয়; বরং এর দ্বারা 'আল্লাহর বিধান' অথবা 'প্রভুত্বের বিধান' উদ্দেশ্য; একইভাবে যেসব স্থানে আল্লাহ তাআলার কোনো সিফাত বা গুণের কথা এসেছে, তা-ও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপ্রদত্ত বিধানেরই সিফাত বা গুণ। এক স্থানে সে বলে—সালিম, একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় বুঝে নিলে কুরআন অনুধাবনে তোমার

অসংখ্য সমস্যার নিরসন হয়ে যাবে। কুরআনের যেসব স্থানে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, 'আল্লাহ'র স্থানে তুমি যদি 'আল্লাহর বিধান' অথবা 'নির্দেশ' অর্থ করো, তবে সমস্যা দূর হয়ে যাবে।[২৯]

আরেক জায়গায় পারভেজ তার প্রভুত্বের বিধান বিষয়ক দর্শন অথবা মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, আমরা এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাই। সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগেই এটা বুঝে নেওয়া উচিত—সুরা তাওবার ১১১ ও ১১২ নম্বর আয়াতে 'আল্লাহ' বলে সেই সমাজ বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য গঠিত হয়।

অনুরূপ সুরা হুদের ৬ নম্বর আয়াতের তাফসিরে গোলাম পারভেজ লেখে, এ আয়াতের 'আল্লাহ' শব্দ থেকে আমরা সেই সমাজ বুঝি, যা তাঁর বিধান বাস্তবায়নের উপযুক্ত।[৩০] এই প্রভুত্ববিধান দ্বারা পারভেজ কার্ল মার্ক্সের দর্শনই বুঝিয়েছে। এই দর্শনে সে ছিল চূড়ান্ত রকমের প্রভাবিত। সহজ কথায় বলতে গেলে গোলাম আহমাদের মতে কুরআনে যেখানেই 'আল্লাহ' শব্দ এসেছে তার অর্থ সেই সমাজ, যা তার উদ্ভাবিত প্রভুত্ববিধান বা মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরেক জায়গায় সে লিখেছে, মানুষের উদ্ভাবিত ধর্মমতের প্রভুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং এদের দাবিদাওয়ায় আস্থা রাখার মাধ্যমে সেই বিশ্বাস ও নির্ভাবনা কিছুতেই হয় না, যা আবিষ্কারের ভাবনা থেকে তাদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করে। এই প্রভুদের ব্যাপারেই কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, এর ধারণা আধুনিক পুঁজিবাদীরা উদ্ভাবন করেছে; কিন্তু প্রভুত্ব-দর্শনের একটি অর্থ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা কুরআনের প্রতিটি হরফ ও চিত্রে প্রোজ্জ্বল। এই চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে এসব স্থানে প্রভু বলতে কার্যত সেই মতাদর্শ অথবা সমাজ উদ্দেশ্য, যা তার বিধানাবলি বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্যই গঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই মতাদর্শ অথবা সমাজ প্রভুর সব দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, যে দায়িত্বগুলো বাস্তবিক অর্থেই প্রভুর ছিল, অথবা প্রভু নিজের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন।[৩১]

পারভেজের মতে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল একত্রে এসেছে, তার অর্থ 'ইসলামি শাসনব্যবস্থা'। এই মূলনীতির ভিত্তিতে সে 'মারকাজে মিল্লাত' নামে নিজের নতুন আরেকটি পরিভাষা প্রণয়ন করে। এই পরিভাষা অনুযায়ী কুরআনের যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের আলোচনা এসেছে, তার অর্থ প্রভুত্বের শাসন তথা

---

[২৯] *সালিমকে নাম খুতুত*: ১/১৭৩।

[৩০] *নিজামে রুবুবিয়াত*: ১৫৮।

[৩১] *সালিম কে নাম খুতুত*: ১/২২৯।

মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের আনুগত্য।

আরেক জায়গায় সে বলে, 'সরকারের নির্বাহী কার্যক্রমের জন্য একটি কেন্দ্র থাকতে হবে; আর এই কেন্দ্রের অধীনে থাকবে কর্মকর্তারা। কুরআনে এ জন্য আল্লাহ ও রাসুল পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সেই প্রভুত্ববিধান, যা আল্লাহ দিয়েছেন; আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের অর্থ কেন্দ্রীয় হুকুমত বা সরকারের আনুগত্য।'[৩২]

আরেক জায়গায় পারভেজ বলে, 'রাসুল ﷺ-এর পরে তাঁর খলিফা রাসুলের স্থলাভিষিক্ত হন। কাজেই এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য বলতে আধুনিক কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্যই উদ্দেশ্য।[৩৩]

## পাঁচ. রিসালাতের ইমান

গোলাম পারভেজের আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমানের আলোচনার সার হলো, পৃথকভাবে ব্যবহৃত হলে 'আল্লাহ' অথবা 'রব' বলতে উদ্দেশ্য 'প্রভুত্বের শাসন' অথবা মার্ক্সবাদী সমাজ; আর 'আল্লাহ' অথবা 'রব' যদি রাসুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এর অর্থ হবে সেই সমাজের প্রশাসনিক সরকার বা সেন্ট্রাল অথোরিটি এবং তার অধীন কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীলরা।

এবার রিসালাতের প্রতি পারভেজের আকিদা নিয়ে যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে এর অর্থও তার সেই কেন্দ্রীয় সরকার বা সেন্ট্রাল অথোরিটিই। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুল—এ দুটি শব্দ মিলে একটি পরিভাষার জন্ম হয়েছে, যার অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার। আর রাসুলের আনুগত্যের অর্থ এই সেন্ট্রাল অথোরিটির আনুগত্য।

সুরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

> হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো, তবে আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।

এই আয়াতের তাফসিরে পারভেজ লিখেছে, 'এই পবিত্র আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট। এতে আল্লাহ ও রাসুল বলতে মারকাজে মিল্লাত—ভিন্ন অর্থে সেন্ট্রাল অথোরিটি এবং 'উলুল আমর' বলতে অধীন কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীলদের বোঝানো হয়েছে।'[৩৪]

---

[৩২] *কুরআনি ফ্যায়সালে* : ২।
[৩৩] *মিরাজে ইনসানিয়্যাত* : ৩৫৭।
[৩৪] প্রাগুক্ত : ৩২২।

পারভেজের মতে কুরআন মাজিদের 'আল্লাহ' অথবা 'রব' বলতে সেই সমাজ উদ্দেশ্য, যা প্রভুত্বের শাসনব্যবস্থা তথা মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের অর্থ এই কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য এবং উলুল আমরের আনুগত্যের অর্থ সরকারের অধীন কর্মকর্তাদের আনুগত্য।

এ ছাড়া সে আদম আ.-এর ঘটনাকে মানুষের ঘটনা আখ্যায়িত করে আদমের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করে। অর্থাৎ, তার ভাষ্যমতে কুরআনের যেখানেই আদম শব্দ এসেছে, তার কোথাও নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা একশ্রেণির প্রাণী ছিল, যাদের মানুষ বানাতে আল্লাহ তাআলা বানর থেকে নির্বাচন করেছিলেন। এমনকি আদম আ.-এর নবুওয়াতও অস্বীকার করে পারভেজ। কারণ, তার মতে আদম মূলত কোনো মানুষের নাম নয়; বরং বিবর্তনের ধারায় মানুষ বানাতে বানর থেকে মনোনীত একপ্রকার প্রাণীমাত্র।

## ছয়. আখিরাতের প্রতি ইমান

আখিরাতের ক্ষেত্রে পারভেজের আকিদা হলো, জান্নাত অথবা জাহান্নাম পরকালীন কোনো জীবন বা ভালো-মন্দ কোনো স্থানের নাম নয়; বরং মানুষের ওপর অবতীর্ণ কিছু অবস্থাই জান্নাত অথবা জাহান্নাম। জাহান্নাম বিষয়ে সে এক জায়গায় লেখে, 'জাহান্নাম মানুষের আত্মিক একটি অবস্থার নাম; কিন্তু কুরআন থেকে অনুমিত হয় যে, এটা অনুভবযোগ্য নয়। শুধু বাস্তবতাকেই বোধগম্য উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায়। জাহান্নাম তার উলটো।'[৩৫]

একইভাবে জান্নাতের ব্যাপারে সে বলে, 'জাহান্নামের মতো পরকালের জান্নাতও কোনো স্থানের নাম নয়, বরং সেটাও একটা অবস্থার নাম।'[৩৬]

আরেক জায়গায় জান্নাতের নিয়ামতের আলোচনায় নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে উল্লেখ করে, 'জান্নাতের সুখ-শান্তি, সৌন্দর্য এবং আনন্দ প্রভৃতি এই দুনিয়াতেই অর্জিত হয়। মৃত্যুর পরে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত রূপকার্থে।'[৩৭]

হাশর এবং কিয়ামত অস্বীকার করে পারভেজ বলে, 'এই ধারণা মোটেও সঠিক নয় যে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে কোনো ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে অথবা হাশরের মাঠে মৃতদের একত্রিত করা হবে।'[৩৮]

---

[৩৫] *জাহানে ফরদা* : ২৩৫।

[৩৬] প্রাগুক্ত : ২৭০।

[৩৭] *নিজামে রুবুবিয়াত* : ৮৬।

[৩৮] *জাহানে ফরদা* : ১৮০।

একই গ্রন্থের আরেক জায়গায় কিয়ামত-দিবসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে বলে, 'ইয়াওমুল কিয়ামা বা কিয়ামতের দিন বলতে মূলত সেই বৈপ্লবিক সময় উদ্দেশ্য, কুরআনের পক্ষ থেকে মানুষ দুনিয়াতে যে সময়ের মুখোমুখি হয়।[৩৯]

আরেক জায়গায় কুরআনে কিয়ামত অর্থে ব্যবহৃত 'আস-সাআহ' (الساعة) শব্দের ব্যাখ্যায় সে বলে, 'সাআহ' অর্থ আসলে সত্য ও মিথ্যার সেই চূড়ান্ত লড়াই, যাতে মিথ্যার সব শক্তি ও ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয়ে যায়।'[৪০]

## সাত. ফেরেশতার প্রতি ইমান

ফেরেশতাদের বিষয়ে তার মত হলো, 'এঁরা আল্লাহ তাআলার পৃথক কোনো সৃষ্টি নন; বরং মানুষদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও আত্মিক ক্ষমতার নামই 'মালায়িকা'।'[৪১]

আরেক স্থানে সে লিখেছে, 'মালায়িকা তথা সৃষ্টিজগতের যে শক্তি থেকে রিজিকের ব্যবস্থা হয়, তারা মানুষের অনুগত।'[৪২]

*ইকবাল আওর কুরআন* গ্রন্থে পারভেজ বলে, 'ফেরেশতা অথবা মালায়িকা সৃষ্টিজগতের সেই শক্তি, যা আল্লাহ তাআলার কার্যক্রম যথাযথভাবে পূরণ করতে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সামনে আসে।'[৪৩]

কুরআনে উল্লিখিত 'জিন' বলতে পারভেজ বুঝিয়েছে গ্রাম্য ও বন্য প্রকৃতির মানুষ। ফেরেশতা ও জিনের ব্যাপারে প্রায় এমন মত পোষণ করতেন স্যার সাইয়িদ আহমাদও। তাকদিরের ব্যাপারে পারভেজ বলে, অগ্নিপূজকরা এই বিশ্বাস ইসলামে ঢুকিয়েছে।

## আট. কুরআনের প্রতি ইমান

কুরআনকে পারভেজ মনে করে উদ্ভাবিত ওহি। এমনকি হাদিস ও সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের তাফসির করতে সে রাজি নয়। তার বক্তব্য মতে, কুরআনে সবকিছুর মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। এবার এসব মূলনীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে আমাদের বিস্তারিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

এ বিষয়ে সে বলেছে, 'কুরআন শুধু মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করে মানুষকে এই

[৩৯] প্রাগুক্ত : ১৩৩।
[৪০] *লুগাতুল কুরআন* : ২/৯১৮।
[৪১] *ইবলিস ওয়া আদম* : ১৬২।
[৪২] প্রাগুক্ত : ৫৬।
[৪৩] *ইকবাল আওর কুরআন* : ১৬৫।

স্বাধীনতা দিয়েছে, তারা যেন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এই নীতিমালার আলোকে শাখাগত বিধান ও আইন প্রণয়ন করতে পারে।'[৪৪]

পারভেজ নিজের মনমতো কুরআনের তাফসির করার প্রবক্তা। রাসুলের পক্ষ থেকে কৃত কুরআনের তাফসিরের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অস্বীকার করে সে বলে, 'কুরআনের নীতিমালা অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী। কাজেই এখন কোনো নবির দরকার নেই। আবার এসব নীতিমালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আদিষ্ট বা ইলহামপ্রাপ্ত হতে হবে, ব্যাপারটা মোটেও এমন নয়; বরং এটি কুরআনবিরোধী এক ধারণা। কুরআন কোথাও এ কথা বলেনি, আমার শিক্ষা মানুষকে বুঝাতে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট অথবা ইলহামপ্রাপ্ত হতে হবে।[৪৫]

## নয়. কুরআনের বিচ্যুতিপূর্ণ তাফসির

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও পারভেজ কুরআনের অন্যান্য বহু স্থানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্বপ্রণীত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পারি :

### ১. সুরা আনকাবুতের ১৪ নম্বর আয়াত

﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾

তারপর নুহ নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে ৯৫০ বছর অবস্থান করেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সে বলে, 'আরবি ভাষায় "সানাহ" শব্দের অর্থ ঋতু। এক বছরে চার ঋতু হয়, তাই হাজার ঋতুর অর্থ ২৫০ বছর। এ হিসেবে ৫০ বছর বাদ পড়ে যায়, বাকি থাকে ২০০ বছর। তাই নুহ আ.-এর বয়স হয়েছিল ২০০ বছর, যা বোধগম্য।

### ২. সুরা নামলের ১৬ নম্বর আয়াত

﴿وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾

আর সুলায়মান বললেন, হে লোকসকল, আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সে বলে, 'এখানে "মানতিক" দ্বারা বিদ্যা উদ্দেশ্য; আর "তাইর" অর্থ অশ্ববাহিনী। ফলে "মানতিকাত তাইর" অর্থ দাঁড়ায় অশ্ব চালনার বিদ্যা।'[৪৬]

---

[৪৪] *লুগাতুল কুরআন* : ২/৪৭৯।

[৪৫] *কুরআনি ফ্যায়সালে* : ৩/২৬০।

[৪৬] *লুগাতুল কুরআন* : ১১০৬; *মাতালিবুল কুরআন*, সুরা নামল অংশ : ৬৭-৭০।

৩. সুরা আলে ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াত

﴿اَنِّیْۤ اَخْلُقُ لَکُمْ مِّنَ الطِّیْنِ کَهَیْـَٔةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَیَکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾

আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির মতো একটি আকৃতি তৈরি করব, তারপর তাতে ফুঁ দেবো। ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে।

এই আয়াতে রূপক ব্যাখ্যা করে সে বলে যে, এর অর্থ হবে 'আমি ওহির মাধ্যমে মানুষকে নতুন জীবন দান করব এবং তারা মাটি থেকে আকাশে ওড়ার সক্ষমতা লাভ করবে।'

৪. সুরা বাকারার ২৫৯ নম্বর আয়াত

﴿وَانْظُرْ اِلَی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوْهَا لَحْمًا﴾

তুমি গাধার হাড্ডিগুলোর প্রতি লক্ষ করো, আমি কী করে সেগুলো সংযোজিত করি এবং গোশত দিয়ে ঢেকে দিই।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সে বলে, 'মায়ের জরায়ুতে মানুষের আচ্ছাদিত থাকার কথা বোঝানোই এই আয়াতে উদ্দেশ্য।'

৫. সুরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াত

﴿اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَی النِّسَآءِ﴾

পুরুষ নারীর কর্তা।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় গোলাম পারভেজ বলে, 'এ আয়াতে "কাওয়াম" শব্দের অর্থ রিজিকের ব্যবস্থাপক।'

৬. নবি ইবরাহিম আ.-এর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনায় তার ব্যাখ্যা, 'মুশরিকরা আসলে তাঁকে নিজেদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।'

৭. ইবরাহিম আ. কর্তৃক ইসমাইল আ.-কে জবাই করার ব্যাপারে পারভেজ বলে, 'এ বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি ছিল। আসলে ইবরাহিম আ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভুল বুঝেছিলেন। তাই এই ভুলের ওপর আমল থেকে আল্লাহ তাঁকে বাঁচাতে সন্তানের স্থলে ভিন্ন কিছু জবাইয়ের ব্যবস্থা করেন।'

৮. সুরা শুআরার ৬৩ নম্বর আয়াত

﴿فَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى اَنِ اضۡرِبۡ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِ﴾

তারপর আমি মুসার প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করো। অনন্তর তা বিভক্ত হয়ে গেল। (সমুদ্রের) প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে গেল।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নবি মুসা আ.-এর লাঠির মাধ্যমে নীলনদের পানি বিভক্ত হয়ে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনাটি চতুরতার সঙ্গে অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'এ আয়াতে "কুল্লু ফিরক" অর্থ দুটি সম্প্রদায়। অর্থাৎ ফিরআউনের সম্প্রদায় ও বনি ইসরাইল পাহাড়ের মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল।'

৯. সুরা তা-হার ২০ নম্বর আয়াত

﴿فَاَلۡقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسۡعٰى﴾

এরপর মুসা লাঠি নিক্ষেপ করল, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।

এর ব্যাখ্যায় গোলাম আহমাদ মুসার লাঠির অর্থ করেছে সেসব বিধান যা মুসা আ. তাঁর জাতিকে দিয়েছিলেন।

১০. সুরা আলে ইমরানের ৪৬ নম্বর আয়াত

﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الۡمَهۡدِ وَكَهۡلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيۡنَ﴾

তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি হবেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তার বক্তব্য, 'ছোট বয়সে তিনি কথা অনেক বেশি বলবেন।'

সালাতের ব্যাপারে গোলাম আহমাদ পারভেজ বলে, 'সালাত নিষ্প্রাণ একটি প্রথা ও উপাসনা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মতো আমিও তা পড়ি।'

তার মতে সালাত প্রতিষ্ঠার অর্থ সেসব নির্দিষ্ট জনসম্মিলন, যা পূর্বোক্ত প্রভুত্ববাদী শাসনব্যবস্থার স্মৃতি নবায়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

জাকাতের বিষয়ে সে বলে, 'এর কোনো ব্যাখ্যা ইসলামে স্পষ্টরূপে দেওয়া হয়নি। তবে একটি ইসলামি সরকার কারও পুরো জাকাত নিয়ে নিতে পারে, এতে কোনো অসুবিধা

নেই। আর জাকাত ও কর এক ও অভিন্ন; দুটোতে কোনো পার্থক্য নেই।'

কুরবানির ব্যাপারেও গোলাম পারভেজের অবস্থান অস্বাভাবিক। হজ ছাড়া অন্য বিধানসমূহকে সে কুরআনের প্রতি মিথ্যাচার বলে মনে করে। তার মতে হারামে কা'বার অর্থ মক্কা মুকাররমা নয়, বরং ধর্মীয় বিধানাবলি বাস্তবায়নের স্থানই কা'বার হারাম। কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলে সাওয়াব হবে কি না, এ ব্যাপারেও তার অবস্থান নেতিবাচক। একে সে অনারবদের উদ্ভাবিত একটি বিশ্বাস বলে মনে করে।

একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারে তার অভিমত হলো, 'এক স্ত্রীর বদলে দ্বিতীয় স্ত্রী রাখা যদিও বৈধ, কিন্তু তা প্রথম স্ত্রীর অনুপস্থিতির শর্তে।'

কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধির ব্যাপারে তার ভাষ্য হলো, 'এ দণ্ডবিধি চূড়ান্ত শাস্তি। তাই শাস্তি প্রয়োগকারী নির্ধারিত শাস্তি লঘু করার অধিকার রাখেন।'

## দশ. পারভেজের কাফির হওয়ার ফাতওয়া

হারাম শরিফের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ সাবিল গোলাম আহমাদ পারভেজ ও তার অনুসারীদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। কুয়েত সরকারের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ফাতওয়া পরিষদের চেয়ারম্যান শায়খ মাশআল মুবারাক আবদুল্লাহ সাবাহও পারভেজিয়া আকিদা লালনকারীদেরকে কাফির বলেন। এ ছাড়া সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতি শায়খ আবদুল আজিজ ইবনু বাজ ও শায়খ আবদুল আজিজ ইবনু আবদুল্লাহ আলি শায়খও হাদিস অস্বীকারের কারণে গোলাম পারভেজের ব্যাপারে কুফরের ফাতওয়া দিয়েছেন।

সৌদি আরবের আলিমদের এই ফাতওয়া সমর্থনকারীদের মধ্যে মাওলানা ইদরিস সালাফি, মাওলানা ড. সরফরাজ আহমাদ নাইমি, মাওলানা তাকি উসমানি, মুফতি আবদুল কাইয়ুম হাজারবি, মাওলানা ড. মুফতি গোলাম সারওয়ার কাদরি, ড. আবদুর রাজ্জাক সিকান্দার, মাওলানা সিরাজুদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবি, মাওলানা হাফিজ আবদুল কাদির রোপড়ি, মাওলানা মুফতি রফি উসমানি, মাওলানা আবদুল হাফিজ মাক্কি, মাওলানা মনজুর আহমাদ চিনিউটি, মাওলানা ড. শের আলি শাহ মাদানি, মাওলানা মুফতি আশিকে ইলাহি বুলন্দশহরি, মুফতি ড. আবদুল ওয়াহিদ, মাওলানা আবদুস সাত্তার খান নিয়াজি, মাওলানা সফিউর রাহমান মুবারাকপুরি, মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসিমি, মাওলানা মুহাম্মাদ আজমাল কাদরি, মাওলানা রিয়াজুল হাসান নুরি, মাওলানা আবদুর রাহমান মাদানি, মাওলানা আবু আম্মার জাহিদ

রশিদি, মাওলানা আবদুল মালিক, মাওলানা মুফতি ইলিয়াস কাশমিরি, ড. ইসরার আহমাদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে পারভেজ যে কাফির এ নিয়ে বিশেষ প্রচারণা চালানো হয় এবং তার ব্যাপারে বিস্তারিত একটি ফাতওয়াগ্রন্থও প্রণীত হয়। ২৫৬ পৃষ্ঠার ওই ফাতওয়াগ্রন্থ *পারভেজের ব্যাপারে আলিমদের সর্বসম্মত ফাতওয়া* নামে করাচি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ফাতওয়ায় ১ হাজারের বেশি আলিম স্বাক্ষর করেন। যাঁদের মধ্যে মাওলানা দাউদ গজনবি, হাফিজ আবদুল্লাহ মুহাদ্দিসে রোপড়ি, হাফিজ আবদুল কাদির, মুফতি মাহমুদ, মুফতি মুহাম্মাদ শফি, মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরি, মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবি, মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানি, মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরিস কান্ধলবি, মাওলানা গোলাম গাওস হাজারবি, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি, মুফতি ওলি হাসান টুনকি, আবদুল হামিদ কাদিরি, আবদুস সালাম কাদিরি, মুহাম্মাদ আবদুল হালিম চিশতি, আবদুল কারিম কাসিমি, মুহাম্মাদ বাহাউল হক প্রমুখ ছিলেন।

আল্লাহ সবার প্রতি রহম করুন। পরবর্তী সময়ে এই গ্রন্থের শেষে আরববিশ্ব তথা মক্কা-মদিনা, মিসর এবং শামের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের ফাতওয়া যুক্ত করা হয়।

উপমহাদেশে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির পরে গোলাম আহমাদ পারভেজ সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি, আলিমরা যার সমস্ত চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে কুফরি বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাশাপাশি তার অনুসারীদেরকেও ইসলামের বহির্ভূত বলে রায় দিয়েছেন।



# প্রফেসর ড. তাহির আল কাদরি

## এক. জন্ম ও শিক্ষাজীবন

ড. তাহির কাদরি ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের ঝাং অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাবি মতে তিনি কোনো মতাদর্শের অনুসারী না হলেও বক্তৃতা ও লেখায় তাঁকে বেরেলবি মতাদর্শের স্পষ্ট সমর্থক মনে হয়। পিতা প্রফেসর ফরিদুদ্দিন কাদরি ছিলেন মাহনি সিয়াল বংশের। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তাহির কাদরি প্রথম বিয়ে করেন। বড় ছেলে প্রফেসর হাসান মুহিউদ্দিন কাদরি মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনালের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি মিনহাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যারাবিকে এমএ এবং মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবিও করেছেন। ছোট ছেলে হুসাইন মুহিউদ্দিন কাদরি এমবিএ করার পর অস্ট্রেলিয়ায় গ্লোবাল ইকোনোমিকসে ডক্টরেট করেছেন।

তাহির কাদরি ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মেট্রিক এবং ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এফএসসি পাশ করেন। এরপর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে বিএ পাশ করেন এবং ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এখান থেকেই ইসলামিক স্টাডিজে এমএ সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তাঁর কথা মতে ১৯৬৩ থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি জামিয়া কুতুবিয়া রিজবিয়া ঝাং থেকে দারসে নিজামির পাঠও সম্পন্ন করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্জন করেন এলএলবি ডিগ্রি। এরপর ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামি দণ্ডবিধি নিয়ে গবেষণার জন্য আইনের ডিগ্রি প্রদান করে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Punishment in Islam, their classification and philosophy'.

প্রফেসর তাহির কাদরির শিক্ষাজীবনে এলএলএম ডিগ্রির কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না, তবে এলএলবির পরে পিএইচডি ডিগ্রির কথা জানা যায়। সম্ভবত ইসলামি বিভাগের অধীনে এই ডক্টরেট ডিগ্রি চালু করা হলেও বিষয় হিসেবে তাঁকে ইসলামি আইনে পিএইচডি ডিগ্রির সমমর্যাদা দেওয়া হয়। সত্য কথা হলো, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের নিবন্ধন পায়, আর এ বছরই তিনি পিএইচডি অর্জন করেন। আইন অনুষদে তাঁর ইসলামি আইনে শিক্ষকতার কারণে ইসলামিক স্টাডিজের পিএইচডির ব্যাপারে এই ধারণার জন্ম হয়েছে যে, সম্ভবত এটি আইন অনুষদের পিএইচডি; কিন্তু মূলত সেটা ইসলামিক স্টাডিজেরই পিএইচডি।

## দুই. ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন

প্রফেসর তাহির কাদরি ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসা খেল মিয়ানওয়ালির গভর্নমেন্ট কলেজে ইসলামিক স্টাডিজের প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং পরের বছরই এই চাকরিতে ইস্তফা দেন।

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ঝাং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে অ্যাডভোকেট হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। একই বছর ঝাং স্বাধীনতা ফ্রন্ট নামে তরুণদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ড. কাদরি ঝাং থেকে লাহোর চলে যান। এ বছরই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ইসলামি আইনের প্রভাষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে চাকরি করেন। তারপর পাকিস্তান সরকার তাঁকে ফেডারেল শরয়ি আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা নিযুক্ত করে। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন কনফারেন্সের মাধ্যমে মিনহাজুল কুরআন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রচারণা শুরু করেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকার তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের শরিয়া অ্যাপিলেট বেঞ্চের উপদেষ্টা নিযুক্ত করে। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইরান সফর করে আয়াতুল্লাহ খোমেনি ও অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বছরই নাওয়াজ শরিফের লাহোর মডেল টাউন জামে মসজিদে খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের শুরু পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলেও একপর্যায়ে পারিবারিক টানাপোড়েন প্রকট আকার ধারণ করলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। এ সময় তিনি পিটিভিতে *ফাহমুল কুরআন* নামে নিয়মিত একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এ বছরই এম ব্লক মডেল টাউনে ২০ কানাল[৪৭] জমি মিনহাজুল কুরআন ইন্সটিটিউটের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এবং মসজিদের জন্য খরিদ করেন। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মিনহাজুল কুরআন ইন্সটিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তাঁর ভাষ্যমতে এ বছরই মিনহাজুল কুরআন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বপ্নে রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কিছু সুসংবাদ লাভ করেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মিনহাজুল কুরআন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য লাহোর টাউনশিপে ২০০ কানাল জমি ক্রয় করেন। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ বছরই মিনহাজুল কুরআনের সাংগঠনিক নীতিমালা প্রণীত হয়, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়।

[৪৭] এক কানালে ৬০৫ গজ।

প্রফেসর তাহির কাদরি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে *পাকিস্তান 'আওয়ামি তেহরিক'* নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরের বছরই দলটি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ বছর তাঁর বাসায় এক হামলার ঘটনা ঘটে। তবে আদালত এই ঘটনাকে অবাস্তব এবং নাটক উল্লেখ করে প্রফেসর কাদরিকে অসুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী আখ্যায়িত করে। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। *মিনহাজ এনসাইক্লোপিডিয়া* ওয়েবসাইটের তথ্যমতে এই পরিকল্পনার অধীনে ১২টি কলেজ এবং ১৭২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নেওয়া হয়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাকিস্তান আওয়ামি ইত্তিহাদের সভাপতি নির্বাচিত হন। পিপলস পার্টিসহ আরও ১৯টি রাজনৈতিক দল এই জোটে যুক্ত ছিল। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে বেনজির ভুট্টো মিনহাজুল কুরআন ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করে এর আজীবন সদস্য হন।

## তিন. রচনাবলি

প্রফেসর তাহির কাদরির ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি চার শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে আরবি ভাষায় ১৯টি, ইংরেজি ভাষায় ১৩৯টি; আর বাকিগুলো উর্দু ভাষায়। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *মিলাদুন নবি, তারজামায়ে ইরফানুল কুরআন, আল-মিনহাজুস সাবি মিনাল হাদিসিন নাবাবি, ইসলাম আওর জাদিদ সাইন্স, দিহশাত গারদি আওর ফিতনায়ে খাওয়ারিজ, শানে আওলিয়া, তাখলিকাতে কায়িনাত, আল-ফুয়ুজাতুল মুহাম্মাদিয়া, ফালসাফায়ে মিরাজুন নবি, আল-কাউলুল মু'তাবার ফিল-ইমামিল মুনতাজার, আল-ইরফান ফি ফাজায়িলি ওয়া আদাবিল কুরআন, আহসানুস সিনাআহ ফি ইসবাতিশ শাফাআহ, জিয়ারাতে কুবুর, আস-সাইফুল জালি আলা মুনকিরি বিলায়াতি আলি, বারাকাতে মুসতাফা, ইসলাম মেঁ খাওয়াতিন কে হুকুক, শেহরে মাদিনা আওর জিয়ারতে রাসুল, জাবহে আজিম, আরকানে ইসলাম, শাহাদাতে ইমাম হুসাইন: হাকায়িক ওয়া ওয়াকিয়াত, শামায়িলে মুসতাফা, মাসআলায়ে ইসতিগাসা আওর উসকি শারয়ি হাইসিয়াত, আকায়িদ মেঁ ইহতিয়াত কি তাকাজে, দুরুদ শরিফকে ফাজায়িল, গুসতাখানে রাসুল কি আলামাত, মুনাজাতে ইমাম জায়নুল আবিদিন, তাবাররুক কি শারয়ি হাইসিয়াত, আসিরানে জামালে মুসতাফা, ইসলামি নিজামে মায়িশাতকে বুনিয়াদি উসুল, মারাজুল বাহরাইন ফি মানাকিবিল হাসানাইন, আহলে বাইতে আতহারকে ফাজায়িল ওয়া মানাকিব, হায়াতুন নাবি, কিতাবুত তাওয়াসসুল, মিসাকে মাদিনা কা আইনি তাজজিয়া, বিদআত আয়িম্মা ওয়া মুহাদ্দিসিন কি নজর মেঁ, মাআরিফে আয়াতুল কুরসি, আকিদায়ে তাওহিদ আওর গাইরুল্লাহ কা তাসাওউর, আল-কাউলুল ওয়াসিক ফি মানাকিবিস সিদ্দিক, আল-*

*কাউলুস সাওয়াব ফি মানাকিব উমর ইবনিল খাত্তাব, রাউদুল জিনান ফি মানাকিবি উসমান ইবনি আফফান, কানজুল মাতালিব ফি আলি ইবনি আবি তালিব, তাজকিরায়ে ফরিদে মিল্লাত, বিদআত কা তাসাওউরে সহিহ, হুকুকে ওয়ালিদাইন, রাব্বুল আলামিন কি ইলমি আওর সায়েন্সি তাহকিক, ইমাম আবু হানিফা ইমামুল আয়িম্মা ফিল হাদিস, খাসায়িসে মুসতাফা, আসমায়ে মুসতাফা, ইসলাম কা তাসাওউরে ইলম, ওয়াসায়িতে শারইয়্যা, আকিদায়ে খাতমে নুবুওয়াত, আকিদায়ে তাওহিদ কে সাত আরকান, আন-নাজাবাহ ফি মানাকিবিস সাহাবা ওয়াল কারাবা, আল-আকদুস সামিন ফি মানাকিবি উম্মহাতিল মুমিনিন, ইসলাম মেঁ বাচ্চোঁ কে হুকুক, ফালসাফায়ে সাউম, সিরাতুর রাসুল, ইসালে সাওয়াব আওর উস কি শারয়ি হাইসিয়াত, ফাসাদে কালব আওর উস কা ইলাজ এবং হায়াত ওয়া নুজুলে মাসিহ আওর বিলাদাতে ইমাম মাহদি।*

এ ছাড়া তার অধীনে মাসিক *মিনহাজুল কুরআন* এবং *দোখতারানে ইসলাম* নামে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক দুটি দাওয়াতি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

## চার. পর্যালোচনা

কিছু মানুষ এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, প্রফেসর তাহির কাদরি সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও দাওয়াতি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এত গ্রন্থ কীভাবে লিখলেন?

এর উত্তরে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ্য। প্রথমত প্রফেসর কাদরির রচনা যাঁরা মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন অথবা করেন, তাঁরা সাধারণত এমন প্রশ্ন করবেন না। কারণ, তাঁর রচনার বিরাট অংশই অত্যন্ত ছোট। যেমন : *কুরআন আওর ফালসাফায়ে তাবলিগ, এটি মাত্র ২০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা; মাজহাবি আউর গাইরে মাজহাবি উলুমকে ইসলাহে তালাব পাহলু*, এর পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ৩২; *তেহরিকে মিনহাজুল কুরআন কা তাসাওউরে দিন* মাত্র ২৮ পৃষ্ঠা; *খিদমতে দিন কি তাওফিক* এটা ৩২ পৃষ্ঠা; *সিরাতে নববি কি আসরি ওয়া বাইনাল আকওয়ামি আহাম্মিয়াত*, এটাও মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ; *ইকবাল আওর পয়গামে ইশকে রাসুলের* পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৯; *হামারা আসল ওয়াতান* ৪৮ পৃষ্ঠা; *ইকবাল কা মরদে মুমিন*, এটাও ৪৮ পৃষ্ঠা; *ফালসাফায়ে তাসমিয়া* ৪৪ পৃষ্ঠা; *মাআরিফে ইসমুল্লাহ* ৪৬ পৃষ্ঠা; *উমর রসিদা আওর মা'জুর আফরাদকে হুকুক* মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, প্রফেসর কাদরির এসব রচনা মূলত বিভিন্ন সময়ে দেওয়া তাঁর বক্তৃতা থেকে সংকলন করা হয়েছে। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মিনহাজুল কুরআন রাইটার্স প্যানেল নামে প্রফেসর কাদরি একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে এর নাম পরিবর্তন করে ফরিদে মিল্লাত রিসার্চ ইন্সটিটিউট করা হয়। এর রিসার্চ স্কলাররা তাঁর

বক্তৃতা, লেকচার ইত্যাদি কাগজে লেখেন। এরপর কমপোজ, বিন্যাস, নিরীক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব আনজাম দেন।

তৃতীয় বিষয় হলো, প্রফেসর কাদরির প্রকাশিত এসব গ্রন্থে বিস্তর পুনরাবৃত্তি রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, এক বইয়ের সব পরিচ্ছেদ পুরোপুরি আরেক বইয়েও বিদ্যমান। দুটি বইয়ের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য দেখে মনে হয়, একটি পূর্ণ বই হলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকেই বানানো হয়েছে। ১১ খণ্ডে সমাপ্ত একটি সিরাতগ্রন্থের ভূমিকা এক খণ্ডে *মুকাদ্দিমায়ে সিরাতুর রাসুল* নামে প্রকাশ করা হয়। পরে এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদকে পৃথক পৃথক পুস্তিকা হিসেবে আবারও প্রকাশ করা হয়। যেমন : *সিরাতে রাসুল কি দীনি আহাম্মিয়ত, সিরাতে রাসুল কি ইলমি ওয়া সায়েন্সি আহাম্মিয়াত, সিরাতে রাসুল কি ইনতিজামি আহাম্মিয়াত* এবং *সিরাতে রাসুল কি রিয়াসাতি আহাম্মিয়াত* ইত্যাদি।

অনুরূপ *কিতাবুল বিদআহ* গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদকেও আলাদা বই হিসেবে *আল-বিদআহ ইনদাল-আয়িম্মাহ ওয়াল মুহাদ্দিসিন* নামে প্রকাশ করা হয়। এমনিভাবে *ইসলাম আউর জাদিদ সায়েন্স, তাখলিকে কায়িনাত* এবং *রাব্বুল আলামিন কি ইলমি ওয়া সায়েন্সি তাহকিক* বইগুলোও তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে প্রত্যেকটির মূল বিষয় একই মনে হয়। এ ছাড়া *ইসলাম আউর মাআশি নিজাম* ও *ইকতিসাদিয়াতে ইসলাম* অধ্যয়ন করলেও দুটি বইয়ের মূল বিষয়বস্তুর এক বিরাট অংশই মনে হয় এক ও অভিন্ন।

তাহির কাদরি *তাফসিরে মিনহাজুল কুরআন* নামে একটি তাফসিরগ্রন্থ রচনা করছেন। এর প্রথম খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সুরা ফাতিহার প্রথম চার আয়াতের তাফসির স্থান পেয়েছে। এই তাফসিরের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সম্ভবত তাঁর সব বই-ই ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন! কেননা, প্রথম খণ্ডেই *ফালসাফায়ে তাসমিয়া, রাব্বুল আলামিন কি ইলমি ওয়া সায়েন্সি তাহকিক, মাআরিফে ইসমুল্লাহ, তাখলিকে কায়িনাত* এবং *তাসমিয়াতুল কুরআন* ইত্যাদি গ্রন্থের প্রায় সব লেখাই তাতে স্থান দিয়েছেন।

চতুর্থ বিষয় হলো, প্রফেসর সাহেবের বিভিন্ন বইয়ে বিষয়-সংশ্লিষ্ট নয়, এমন অনেক বিষয়ও থাকে। যেমন, *সিরাতুর রাসুল কি ইলমি ওয়া সায়েন্সি আহাম্মিয়াত* বইয়ের দুটি পরিচ্ছদের একটির নাম 'কুরআনে হাকিম আওর ইলমি ওয়া সায়েন্সি তারাক্কি।'

পাকিস্তানে আত্মঘাতী আক্রমণের বিষয়ে তাঁর রচিত *দিহশাতগারদি আউর ফিতনায়ে খাওয়ারিজ* বইয়ের নবম থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শুধু অমুসলিমদের অধিকার ও জানমালের রক্ষা নিয়েই আলোচনা করেছেন। যদিও পাকিস্তানে অমুসলিম থাকলেও না থাকার মতোই; অথচ তাঁর উচিত ছিল মুসলিমদের অধিকার ও জানমাল রক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা।

## পাঁচ. একটি ঘটনা

একবার মাওলানা লুকমান সালাফি ভারত থেকে পাকিস্তানের মাজলিস আত-তাহকিক আল-ইসলামি লাহোরে আসেন। তিনি ভারতে সম্ভবত মাকতাবায়ে ইবনু তাইমিয়া নামে একটি গ্রন্থাগার করতে চাইছিলেন। তাই সংস্থার কয়েকজন দায়িত্বশীল সঙ্গে নিয়ে মিনহাজুল কুরআন গ্রন্থাগার পরিদর্শনে আসেন। সেখানে তিনি পাঠাগারের সঙ্গে প্রফেসর কাদরির গবেষণাকেন্দ্রও পরিদর্শন করেন। প্রায় ৪০ জন গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী এখানে কর্মরত ছিলেন। মাওলানা লুকমান সালাফি তাঁদের কাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানান, প্রফেসর তাহির কাদরি তাঁদের কোনো বিষয়ের রূপরেখা প্রদান করলে তাঁরা সে অনুসারে পূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করে দেন।

## ছয়. রচনার অ্যাকাডেমিক ভিত্তি নিয়ে আপত্তি

প্রফেসর কাদরির রচিত গ্রন্থসমূহের অ্যাকাডেমিক ভিত্তি নিয়েও যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। প্রধান আপত্তি হলো, ধর্মীয় বিষয়াদিতে লিখিত তাঁর রচনাসমূহ দুর্বল এবং জাল বর্ণনায় ঠাসা। কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি সহিহ, হাসান, জয়িফ এবং মাউজু সব ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করেন। এ থেকে তাঁর এমন এক প্রতিকৃতি মনে উদিত হয়, যেখানে ভালোমন্দ সবই একাকার। *আদ-দুররাতুল বাইজা ফি মানাকিবি ফাতিমা আজ-জাহরা* গ্রন্থে তিনি একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন,

إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِنْتِيْ فَاطِمَةَ لأَنَّ اللهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ.

> আমার মেয়ের নাম ফাতিমা রাখা হয়েছে এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং তাঁর প্রেমিকদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন।

ইমাম ইবনুল জাওজি, ইমাম জাহাবি, ইবনু ইরাক আল কান্নানি, ইমাম শাওকানি প্রমুখ এই বর্ণনাকে মাউজু বা মিথ্যা আখ্যা দিয়েছেন। তা ছাড়া মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব-সংক্রান্ত এসব অতিরঞ্জন-মিশ্রিত মাউজু বর্ণনাগুলো মুসলিম সমাজে আমলহীনতাকে উসকে দেওয়ার বড় নিয়ামকরূপে কাজ করে। ফলে অনেক লোক দীনের সাধারণ অথবা ফরজ দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন পুরোদস্তুর উপেক্ষা করে কিছু মানুষের ভালোবাসা রক্ষাকেই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করেন।

আরেক গ্রন্থ *ওয়াসাইতে শারইয়ায়* তিনি উদ্ধৃত করেন,

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلَاكَ.

আপনি যদি না হতেন, তবে আমি এই আকাশসমূহ সৃষ্টি করতাম না।

ইমাম সানআনি, মোল্লা আলি কারি, আল্লামা আজলুনি, আল্লামা আলবানি প্রমুখ এই বর্ণনাকে মাউজু আখ্যায়িত করেন।

অনুরূপভাবে প্রফেসর কাদরি বেরেলবি ধারার আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়ায় এই বর্ণনা উল্লেখ করে প্রমাণ পেশ করেন,

عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ.

তোমরা অবশ্যই তোমাদের সর্ববৃহৎ দল আঁকড়ে ধরো।

ইমাম ইবনু হাজম, ইমাম ইরাকি, ইবনু আবদুল হাদি, আল্লামা আলবানি প্রমুখ একে জয়িফ আখ্যা দিয়েছেন।

*জিয়ারতে রাসুল* গ্রন্থে তিনি উদ্ধৃত করেন,

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

যে আমার কবর জিয়ারত করে, আমার শাফাআত তাঁর জন্য ওয়াজিব।

ইমাম নববি, ইবনুল কাত্তান, দিমইয়াতি, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনু আবদিল হাদি, ইমাম জাহাবি, ইবনু হাজার আসকালানি, ইমাম সুয়ুতি, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল গাজ্জি, আল ওয়াদায়ি প্রমুখ এই বর্ণনাকে জয়িফ অথবা মুনকার আখ্যা দিয়েছেন।

*আল-ফাউজুল জালিল ফিত-তাওয়াসসুল বিন-নাবি* গ্রন্থে প্রফেসর কাদরি এক বর্ণনা উদ্ধৃত করেন,

> আদম আ. মুহাম্মাদ ﷺ-এর অসিলা করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাআলা আদমকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি মুহাম্মাদের ব্যাপারে কোথা থেকে জানলে?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আমি আরশে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" লেখা দেখেছি।'

ইমাম বায়হাকি, ইমাম ইবনু কাসির, ইমাম শাওকানি, ইমাম সানআনি প্রমুখ এই বর্ণনাকে জয়িফ আখ্যা দিয়েছেন। অধিকন্তু ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, এই বর্ণনা জয়িফ হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত। এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ আছে, আন্দাজ করার জন্য আমরা এগুলোই যথেষ্ট মনে করছি।

এ ছাড়া কাদরির সাধারণ বিষয়আশয় নিয়ে রচিত বইপত্রের মানও আধুনিক গবেষণারীতিতে উত্তীর্ণ নয়। *ইসলাম আওর জাদিদ সাইন্স* অথবা *তাখলিকে কায়িনাত*

বই দুটো দেখলে মনে হয় কোনো উর্দু সাময়িকীতে বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট আলোচনা পড়ছি।

বক্তৃতা ও উপস্থাপনের যথেষ্ট যোগ্যতা ড. তাহির রাখেন, শত শত মানুষের সমাবেশকে প্রভাবিত করার শিল্প তিনি জানেন। তবে তাঁর রচনা একেবারেই নিষ্প্রাণ, প্রভাবশূন্য; বরং পুনরাবৃত্তি, অগভীর তথ্য, অনির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বহীন উৎস এবং অবিন্যস্ততা তাঁর রচনার বিশেষত্ব। অধিকন্তু আধুনিক গবেষণারীতিতেও এসব উত্তীর্ণ নয়। তাহির কাদরির বক্তৃতার উদ্দীপনাও খুব কম নয়। কখনো উদ্দীপনার জোরে অমূলক কথাও বলে ফেলেন তিনি। এক বক্তব্যে তিনি বলেন, রাসুলের পথের কুকুরের সঙ্গে অশিষ্টাচার প্রদর্শনকারীও কাফির।

## সাত. আধুনিকতাবাদী চিন্তাচেতনা

নিচে প্রফেসর তাহির কাদরির আধুনিকতাবাদী কিছু চিন্তাচেতনা উল্লেখ করা হলো।

### ১. নারী বিষয়ে কাদরির লিবারেল চিন্তাধারা

প্রফেসর তাহির কাদরি নারী-অধিকারের আলাপে অনেক উদার চিন্তা লালন করেন। *ইসলাম মেঁ খাওয়াতিনকে হুকুক* গ্রন্থে তিনি উমর রা.-এর শাসনামলে নারীরা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্য ছিলেন উল্লেখ করে বলেন, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতে নারীদের কোনো বাধা নেই। তিনি বলেন, এ কারণেই মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে এক নারী খলিফা উমরের ব্যাপারে আপত্তি তুললে উমর রা. তাঁর মত ফিরিয়ে নেন।

ঘটনাটি এমন—উমর রা. তাঁর খিলাফতকালে একবার মিম্বারে উঠে বললেন, 'কেউ যেন বিয়েশাদিতে মোটা অঙ্কের মোহর নির্ধারণ না করে।' এক নারী এ কথা শুনে খলিফার প্রতি অভিযোগ করে বলেন, 'আপনি জনগণকে বেশি মোহর নির্ধারণে বারণ করেছেন; অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমরা যদি এক স্ত্রীর বদলে আরেক স্ত্রী রাখো এবং তাঁদের কাউকে এক কিনতার দিতে চাও, তাহলে তা থেকে তোমরা নিতে পারবে না।"' এরপর উমর রা. আবার মিম্বারে উঠে নিজের মত ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ, উমরের চেয়ে অধিক ফকিহ এমন প্রত্যেককে আপনি ক্ষমা করে দিন।'

এরপর তিনি লেখেন, এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, উমর রা. বাজার, মার্কেট ও পথঘাট তথা সাধারণ কোনো স্থানে রাষ্ট্রীয় আলোচনা করছিলেন না; বরং বিষয়টি পার্লামেন্টেই বিবেচনাধীন ছিল। এর অর্থ হলো, সাধারণ মানুষদের পরিবর্তে নির্বাচিত মানুষেরাই এই পরামর্শ-সভায় অংশগ্রহণ করতেন। তাই একজন নারী তাঁর মতামতের ব্যাপারে

দাঁড়িয়ে অভিযোগ পেশ করা থেকে এই অর্থ সাধারণভাবেই বুঝে আসে যে, তখন নারীদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, প্রশাসনের কাজ করা এবং সেখানে নিজের মত প্রকাশের অধিকার ঠিকই ছিল। অধিকন্তু উমর রা.-এর পক্ষ থেকে নিজের মত ফিরিয়ে নেওয়া এবং ভুল স্বীকার করা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যের কোনো স্থান নেই; আর নারী-পুরুষ সবার অধিকার সমান।

খাদিজা ও অন্যান্য উম্মুল মুমিনিন রা. রাসুলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন উল্লেখ করে কাদরি নারীদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হওয়ার বৈধতা প্রদান করেন। এ ছাড়া উমর রা. শিফা বিনতু আবদুল্লাহ আদাবিয়াকে বাজারের পরিদর্শক করেছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীরা রাষ্ট্রের নির্বাহী দায়িত্বও পালন করতে পারেন। অধিকন্তু উসমান রা. উম্মু কুলসুম বিনতু আলি রা.-কে রোমান দরবারে দূত হিসেবে পাঠানোর কথা উল্লেখ করে তিনি দূত হিসেবে নারীদের পাঠানোর পক্ষে মত দেন।

## ২. ইসলামি অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র

কাদরির মতে, উত্তরাধিকারের সম্পদে নারীকে পুরুষের অর্ধেক দেওয়ার বিধান মূলত তাঁর লিঙ্গ বিবেচনায় নয়; বরং পুরুষকে উপার্জনের দায়িত্ব দেওয়ার কারণেই অধিকার বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, যদি নারী কোনো চাকরির মাধ্যমে জীবিকার দায়িত্ব পালন করে, তাহলে কি উত্তরাধিকারের সম্পদ সমান হবে? যদি না হয়, তাহলে নারীর উত্তরাধিকার অর্ধেক হওয়ার বর্ণিত কারণটিও সঠিক নয়।

প্রফেসর তাহির *ইকতিসাদিয়াতে ইসলাম* গ্রন্থের পূর্ণ এক পরিচ্ছেদ জুড়ে এ কথা প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র সাধারণ নাগরিকদের অধিকার সীমাবদ্ধকরণের অধিকার রাখে। এ ছাড়া জীবিকা উপার্জনের প্রচেষ্টাকে তিনি নামাজের আত্মা আখ্যায়িত করেন। এসব চিন্তাধারাকে অনেক আলিম সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি বলে মন্তব্য করেছেন।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নারী-নেতৃত্বের বিরোধী থাকলেও ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজের মত পরিবর্তন করে আলিমসমাজকে বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বরের *দৈনিক জঙ্গ* পত্রিকার তথ্য মতে তিনি বলেন, 'নারীরা অবশ্যই যেকোনো ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। যদিও তথাকথিত আলিমরা নিজেদের প্রসিদ্ধির স্বার্থে এর বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করেন।'

## ৩. ধর্মীয় সমাজে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

পশ্চিমা ধাঁচে বেড়ে ওঠা ওড়নাবিহীন ও উন্মুক্ত বক্ষের মেয়েদের সঙ্গে ছবি তোলায় বা

একত্রে বসে আলোচনা করায় প্রফেসর সাহেবের কোনো দ্বিধা দেখা যায় না। তাঁর এ ধরনের ছবি ও ভিডিয়ো প্রচুর রয়েছে। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ও ৫ ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে ড. কাদরিকে রোমানিয়ার প্রথম নারী সেক্রেটারির সঙ্গো হাত মেলাতে দেখা যায়।

চলচ্চিত্র ও নাটক অভিনেতা এবং গায়কদের নিয়ে তিনি কালচারাল উইং গঠন করেছেন। এর সেক্রেটারি জেনারেল খ্যাতিমান গায়ক ফেরদৌস জামাল, সভাপতি চলচ্চিত্র অভিনেতা নাদিম, সহ-সভাপতি আফজল আহমাদ এবং চিফ অর্গানাইজার সাইয়িদ নুরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তেহরিকে মিনহাজুল কুরআনের ওয়েবসাইটে 'খ্যাতিমানদের মন্তব্য' শিরোনামে নাটক ও চলচ্চিত্র অভিনেতা নাদিম, মুহাম্মাদ আলি, মুহাম্মাদ আফজল রেমবু, ফেরদৌস জামাল, উসমান পিরজাদা, মাসাররাত শাহিন, শাজাআত হাশমি, ইফতেখার ঠাকুর এবং নাসিম ওয়াকি প্রমুখের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। অভিনেতা মাসাররাত শাহিনের এই মন্তব্য লক্ষ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, 'ড. তাহির আল কাদরি নির্মল ও স্বচ্ছ চরিত্রের অধিকারী একজন মানুষ। তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার দূত এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকা; সংকীর্ণমনা নন, উদার।'

প্রফেসর তাহির কাদরি ছবি আঁকার ব্যাপারেও শিথিল অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা এ ধরনের ছবি এঁকে প্রকাশ করেন। যেমন ড. *মুহাম্মাদ তাহির কাদরি : ময়দানে কারজার মেঁ* বইয়ের প্রচ্ছদের ছবিটি।

## ৪. সংগীত এবং কাদরি

প্রফেসর কাদরি বাজনাসহ কাওয়ালি এবং সুফি-মরমি সংগীত শোনা সমর্থন করেন। অধিকন্তু সুফি নৃত্য ও সংগীতকে তিনি আত্মিক উন্নতির মাধ্যমও মনে করেন। কয়েকটি ভিডিয়ো আছে, যেগুলোতে তাঁকে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গো কাওয়ালি ও সুফিগান উপভোগ করতে দেখা যায়। অথচ তাঁর সামনে নৃত্য চলছে, গান বাজছে। আবার কিছু ভিডিয়োতে তাঁকে সিজদা করতেও দেখা যায়।

বাজনার ব্যাপারে এক ফাতওয়ায় তাহির কাদরি *সহিহ বুখারির* এক বর্ণনা থেকে প্রমাণ পেশ করে বলেন, ইদসহ বিভিন্ন উৎসবে গান, বাজনা ও নৃত্য জায়িজ।[৪৮] তা ছাড়া এটি

---

৪৮ গান এবং মিউজিকের বিষয়ে মিসরের সাবেক মুফতি ড. আলি জুমআ বলেন, গান এবং মিউজিকের মধ্যে যেটা হালাল, তা শোনাও হালাল। এর কিছু বৈধ আর কিছু হারাম। গানের কথা সুন্দর হলে তা উত্তম, আর অশ্লীল হলে তা অশ্লীল। তিনি বলেন, মিউজিক এবং গান যদি ধর্মীয় বা দেশাত্মবোধক সংগীত হয়, তাহলে তা বিশেষভাবে হালাল। অথবা ইদ ও অন্যান্য উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশের জন্য হলে যদি গানের অর্থ শালীন ও সুন্দর হয়; তাহলে নারী-পুরুষের মেলামেশা, অশ্লীলতা এবং হারাম কাজ না হলে তা-ও বৈধ। আলি জুমআ আরও বলেন, গান হারাম হয় তখনই, যখন তা আল্লাহর স্মরণ থেকে মানুষকে বিমুখ করে। অশালীনতা ও অশ্লীলতার উৎস হয়। প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা জাগ্রত করে। অথবা তাতে গায়কের আওয়াজ

চিশতিয়া ধারার একটা প্রথা। এভাবে আরেক ফাতওয়ায় তিনি বলেন, রাসুল ﷺ-এর ইশকে নৃত্য করাও জায়িজ।

আরেক ভিডিয়োতে দেখা যায়, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কাওয়ালি গাওয়ার সময় তিনি এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। এসে গায়কদেরকে টাকা ছিটিয়ে দেন; তখন তাঁর পায়জামা ছিল টাখনুর নিচে।

প্রশ্ন হতে পারে, রাসুল ﷺ-এর অনুরাগ ও ভালোবাসা সাহাবিদের চেয়ে বেশি কার ছিল? কিন্তু এমন কি কখনো হয়েছে, খুলাফায়ে রশিদিনের কেউ কোনো অনুষ্ঠানে এসে রাসুলের সামনে নৃত্য করেছেন? বা আশারায়ে মুবাশশারার কেউ রাসুলের সামনে কাওয়ালি গেয়েছেন? নাকি বদরি সাহাবিরা গানবাজনার তালে তালে রাসুলের সামনে নৃত্য করেছেন? অথবা মুহাজির কিংবা আনসারি সাহাবিরা কি রাসুলপ্রেমে তাঁকে কখনো সিজদা করেছেন? নাকি সাহাবিদের অন্য কেউ রাসুলের ভালোবাসায় বাদ্য বাজিয়ে কাওয়ালি শুনেছেন, টাকা ছড়িয়েছেন? রাসুলের ভালোবাসার এ কেমন বহিঃপ্রকাশ, প্রকৃত প্রেমিকেরাও যা কখনো করেননি!

## ৫. ধর্মীয় সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় চিন্তাধারা

প্রফেসর তাহির আল কাদরি অমুসলিমদের সঙ্গে ঐক্য বিষয়েও অত্যন্ত শিথিল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। অমুসলিমদের অধিকার বিষয়ে তাঁর পৃথক একটি গ্রন্থও রয়েছে। 'মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান ডায়ালগ ফোরাম' নামের একটি সংস্থাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার চেয়ারম্যান তিনি নিজেই। এই সংস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত এক ক্রিসমাস অনুষ্ঠানে কুরআনের সঙ্গে বাইবেল পাঠ করা হয়। এমনকি এক খ্রিষ্টান পাদরির সঙ্গে

---

কোমল ও নরম হয়। অথবা ফিতনা বা জীবন ও চরিত্র ধ্বংসের কারণ হয়।

এ বিষয়ে শায়খ শারাবির মতও আলি জুমআর মতোই। তিনি বলেন, আলিমদের মতে ইদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে গানের মাধ্যমে মনোরঞ্জন করা জায়িজ। এর প্রমাণ হলো, একবার আবু বকর রা. দুটি দাসীকে গান গাইতে দেখে ধমক দিয়ে বলেন, শয়তানের বাঁশি কি রাসুল ﷺ-এর ঘরে? রাসুল সা. এমনটা দেখে বললেন, 'রাখো, আজ তো ইদের দিন'। অনুরূপ সেনাবাহিনীর উৎসাহের জন্য বা কর্মীদের কাজে আগ্রহ বাড়াতে যদি নাশিদ শোনানো হয়, তা-ও বৈধ। অথবা সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর জন্য শোনানো হলে এমন নাশিদ বৈধ। শারাবি বলেন, এ ব্যাপারে ফাতওয়া হলো; যা কিছু অশ্লীলতার কারণ হয়, মানুষকে অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে, তা হারাম এবং অন্যায়—চাই তা কণ্ঠের ধ্বনি ছাড়া শুধু কথা হোক, বা কথা ছাড়া কণ্ঠের ধ্বনি হোক। অথবা এমন কিছুর মিশ্রণ হোক, যার সঙ্গে হারাম গান যুক্ত না থাকে। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, যে গানে নৃত্য, অশ্লীলতা এবং অশালীন মিউজিক থাকে, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই।। আর যা কিছু মানুষকে অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে, ভারসাম্য লোপ করে অথবা সুস্থ অনুভূতিকে আঘাত করে; তা হারাম। অধিকন্তু, গান হলো শুধুই ধ্বনি। যদি ধ্বনির বাইরে এতে প্ররোচনামূলক কিছু গাওয়া হয়, বা হাত-পা অথবা চোখ এবং কোমরের ব্যবহার হয়; তাহলে তা হারাম।

তাহির কাদরি ক্রিসমাসের কেক কাটেন এই অনুষ্ঠানে। উভয় পক্ষ থেকেই শান্তির আলো জ্বলে ওঠে। প্রফেসর কাদরি খ্রিষ্টানদের আহ্বান করে বলেন, মিনহাজুল কুরআনের মসজিদ তাদের উপাসনার জন্য উন্মুক্ত!

তিনি এ-ও বলেন, ঐশীগ্রন্থসমূহ যারা সত্য বলে মানে তাদেরকে বিশ্বাসীদের (Believers) এবং অন্যদেরকে অবিশ্বাসীদের (Non-Believers) অন্তর্ভুক্ত করা হয়; খ্রিষ্টানরা বিশ্বাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সংবাদ ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তানের *দৈনিক এক্সপ্রেস, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত*, ডন, *ইনসাফ, পাকিস্তান, জিন্নাহ*সহ বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই আন্তঃধর্মীয় সহনশীলতা ও ঐক্যের ফলাফল পাকিস্তান আওয়ামি তেহরিকের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করলে কিছুটা বোঝা যাবে। এই সংস্থার অধীনে মিনহাজুল কুরআন ইন্টারফেইথ রিলেশন্সের উদ্যোগে বিভিন্ন চার্চে ইদে মিলাদুন নবির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাদ যায় না হিন্দুদের হোলি উৎসবে অংশগ্রহণও। এ ছাড়া ক্রুশের ছায়ায় খ্রিষ্টানদের পবিত্র শহর ভ্যাটিক্যান সিটিতে প্রফেসর সাহেবের ৬০তম জন্মদিন পালন করা হয়।

## ৬. দাড়ি বিষয়ে কাদরির অবস্থান

দাড়ির ব্যাপারেও প্রফেসর সাহেবের অবস্থান বেশ ধোঁয়াটে। তাঁর মতে, দাড়ি রাখা সুন্নাতে মুআক্কাদা হলেও শরিয়তের পক্ষ থেকে এক মুষ্টি অথবা তারচেয়ে বেশি অথবা কম রাখতে হবে এমন কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। তাই কেউ যদি এক মুষ্টির কম রাখে, তা-ও জায়িজ; বরং শরিয়াসম্মত। এক মুষ্টি অথবা তারচেয়ে বেশি রাখা সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা বা সুন্নাতে আদিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কারও দাড়ি যদি এক মুঠোর কম অথবা এক মুঠো হয় বা তারচেয়ে বেশি, সাওয়াবে কিন্তু সবাই সমান।

নারীদের পর্দা অথবা নিকাবের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান হচ্ছে, নারীর পরিবেশ, প্রয়োজন, বয়স এবং ইমানের দৃঢ়তা অনুসারে চেহারার পর্দার বিধান ভিন্ন। কারও জন্য ওয়াজিব, কারও জন্য মুসতাহাব, আবার কারও জন্য মুবাহ বা উন্মুক্ত।

নারীদের মাহরামবিহীন ভ্রমণের ব্যাপারে তিনি বলেন, রাসুলের যুগে মাহরামের গুরুত্ব দেওয়া হতো। কেননা, সে সময় নিরাপত্তা-সমস্যা বেশি ছিল। বর্তমানে রাজ্যপুলিশ এবং নীতিপুলিশ সর্বত্র থাকার ফলে সামাজিক যে নিরাপত্তা আছে, তা মাহরামের অর্থেই। কাজেই এখন নারীদের ভ্রমণের জন্য মাহরামের প্রয়োজন নেই।

মুসলিমদের পোশাকের ব্যাপারে তিনি বলেন, মুসলিমদের পোশাক শালীন হওয়া চাই। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কেউ হ্যাট পরুক অথবা টাই বাঁধুক অথবা

ধুতি পরুক কোনো অসুবিধা নেই। অথবা কেউ সালোয়ার-কামিজ বা আফ্রিকান অথবা ইন্ডিয়ান পোশাক পরলে তাতেও কোনো রকমের নিষেধাজ্ঞা নেই।

### ৭. শিরক ও বিদআতের নতুন সংজ্ঞা

বিদআত সম্পর্কে প্রফেসর সাহেব তাঁর *কিতাবুল বিদআ* গ্রন্থে বলেন, 'ইসলামে নব-সংযোজিত কোনো বিষয়কে ততক্ষণ বিদআত বলা যাবে না, যতক্ষণ এই বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা কুরআন-হাদিস বা সাহাবিদের আসার থেকে প্রমাণিত না হয়।' প্রফেসর সাহেবের এই মাপকাঠি অনুসারে দীনের কোনো নব-সংযোজিত বিষয়ের নিষেধাজ্ঞার যদি কুরআন-হাদিসের কোনো বক্তব্য বা সাহাবিদের কোনো আসার না পাওয়া যায়, তাহলে তা জায়িজ এবং মুবাহ অথবা বিদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত হবে।

## আট. কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক তাফসির

প্রফেসর কাদরি কুরআনের অসংখ্য স্থানে আয়াতের এমন অদ্ভুত অনুবাদ ও তাফসির করেছেন, যা কুরআনের বাহ্যিক অর্থবিরোধী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের তাফসির-নীতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিচে কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত হলো :

১. সুরা নাজিআতের প্রথম পাঁচ আয়াতের দুটি অনুবাদের একটিতে তিনি বলেন, 'শক্তিশালী সেসব তরঙ্গের শপথ, যা পদার্থের ভেতরে ঢুকে রাসায়নিক যৌগকে চরমভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। শক্তিশালী সেসব তরঙ্গের শপথ, যা রাসায়নিক যৌগকে অত্যন্ত সহজ ও শিথিলভাবে ধ্বংস করে দেয়। শক্তির সেসব তরঙ্গের শপথ, যেগুলো আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিনা বাধায় স্বাধীনভাবে ঘুরে চলে। এরপর শপথ সেসব শক্তিশালী তরঙ্গের, যেগুলো দ্রুততার সঙ্গে স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্যের বলে অন্যান্য তরঙ্গের ওপর প্রাধান্য লাভ করে। এরপর শক্তিশালী সেসব তরঙ্গের শপথ, যেগুলো পারস্পরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনার ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা কায়িম রাখে।'

২. সুরা নাজমের প্রথম আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে, 'শপথ সেই আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্রের (মুহাম্মাদ), যখন তিনি (চোখের পলকে মিরাজের রাতে) অবতরণ করেন।'

৩. সুরা জুমারের ৩০ নম্বর আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন, '(হে শ্রদ্ধেয় বন্ধু,) নিঃসন্দেহে আপনার (তো) মৃত্যু (শুধু আস্বাদনের জন্য) আসবে; আর

তারাও (চিরকালীন ধ্বংসের জন্য) মৃত্যুমুখে পতিত হবে (এরপর উভয়ে মৃত্যুর পার্থক্য দেখতে পাবে)।'

৪. সুরা কাসাসের ৫৬ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে, 'বাস্তবতা হলো, যাকে আপনি (হিদায়াতের পথে) আনতে চান, তাকে হিদায়াতের অধিকারী আপনি নিজে বানান না; বরং (এমন হয়) যাকে (আপনিও তাকেই চান) আল্লাহ চান (আপনার মাধ্যমে) হিদায়াতের অধিকারী করেন; আর তিনি হিদায়াতের পরিচয়প্রাপ্তদের বিষয়ে ভালো জানেন। (অর্থাৎ যারা আপনার ইচ্ছার মূল্য জানে, তাদেরই হিদায়াত দিয়ে ধন্য করা হয়)।'

৫. সুরা মারইয়ামের ৪২ নম্বর আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেন, 'যখন তিনি নিজের পিতাকে (তথা চাচা আজারকে, পিতা তারাখের মৃত্যুর পরে তাঁকে যে লালন করেছিল) বলেন, 'হে পিতা, আপনি এদের (মূর্তির) উপাসনা কেন করছেন, যেগুলো না কিছু শুনতে পায় আর না কিছু দেখতে পায় এবং না আপনার থেকে কোনো (কষ্টদায়ক) জিনিস দূর করতে পারে।'

৬. সুরা কাহাফের ১১০ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে, 'বলে দিন, আমি তো শুধু (বাহ্যিক আকৃতিতে) মানুষ হওয়ার বিবেচনায় তোমাদের মতো। (তা ছাড়া আমার সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক আছে, সামান্য ভেবে দেখো)। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ দেওয়া হয় (তবে তোমাদের মধ্যে এই যোগ্যতা কোথায় আছে যে, তোমাদের ওপর কালামে ইলাহি অবতীর্ণ হবে)।'

৭. সুরা রাহমানের ১৯ নম্বর আয়াতের অনুবাদে দুই সাগরের পরিবর্তে হাসান ও হুসাইনের অর্থ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর *জাবহে আজিম* গ্রন্থে তিনি সুরা সাফফাতের ১০৭ নম্বর আয়াতে জাবহে আজিমের অর্থ করেন হুসাইন রা. বলে।

## নয়. শিয়া হওয়ার অভিযোগ

বেরেলবি মতাদর্শের কিছু আলিম প্রফেসর তাহির কাদরির প্রতি তাফজিলি শিয়া হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। মুফতি গোলাম সারওয়ার কাদরি তাঁর লিখিত *প্রফেসর তাহির আল-কাদরি : ইলমি ওয়া তাহকিকি জায়িজা* গ্রন্থে বলেন, প্রফেসর তাহির কাদরি সাহেব কসরে বাতুলে 'মাওলুদে কা'বা' শীর্ষক এক বক্তৃতায় বলেন, 'সকল সাহাবিকে একত্রিত করা হলেও তাঁদের জ্ঞান আলি রা.-এর সমান হবে না।'

ড. তাহির কাদরি *আস-সাইফুল জালি আলা মুনকিরি বিলায়াতি আলি* গ্রন্থে লিখেছেন,

রাসুল ﷺ-এর খিলাফত ছিল দুই প্রকারের—একটি প্রকাশ্য, অপরটি আধ্যাত্মিক। প্রথম প্রকারের খিলাফত আবু বকর সিদ্দিক রা. পেয়েছেন, দ্বিতীয় প্রকারের খিলাফত পেয়েছেন আলি রা.। প্রথমটি ছিল রাজনৈতিক দায়িত্ব, অন্যটি আধ্যাত্মিক। প্রথম প্রকারের খিলাফত নির্বাচনী ও পরামর্শমূলক; আর দ্বিতীয় প্রকারের খিলাফত হচ্ছে নির্ধারণী ও দানমূলক। প্রথম প্রকারের খিলাফতের নির্বাচক জনসাধারণ; আর দ্বিতীয় প্রকারের খিলাফতের নির্ধারক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। প্রথম প্রকারের খিলাফত আবু বকর রা.-এর পরে খুলাফায়ে রশিদিনের মধ্যে এসেছে; আর দ্বিতীয় প্রকারের খিলাফত আলি রা.-এর পরে ১২ ইমাম লাভ করেছেন। প্রথম শ্রেণির খিলাফতের মাধ্যমে রাসুল ﷺ-এর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীরা নির্বাচিত হয়েছেন, আর দ্বিতীয় শ্রেণির খিলাফত লাভ করেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীরা। শেষোক্ত প্রকারকে বিলায়াত এবং ইমামাতও বলা হয়।

প্রফেসর তাহির কাদরি তাঁর *মাসআলায়ে বিলাদাতে ইমাম মাহদি* গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেন, 'দ্বিতীয় প্রকারের খিলাফত তথা বিলায়াত ও ইমামাতের শেষ খলিফা হবেন মাহদি; আর তিনি হবেন ১২তম খলিফা ও ইমাম।' আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ীও হজরত মাহদি তাদের ১২তম ইমাম।

এ ছাড়া *আস-সাইফুল জালি* গ্রন্থে প্রফেসর কাদরি আরও লিখেছেন, 'আমি বলি, আলি এবং মাহদি দুজনই আল্লাহ তাআলার ওলি বা বন্ধু এবং তাঁর রাসুলের অসি তথা অসিয়তকারী।' প্রফেসর কাদরির ভাষ্যানুসারে হজরত মাহদির আবির্ভাব কমপক্ষে আরও ৮০০ বছর পরে ২২০৪ হিজরি অথবা এরও ১ হাজার বছর পরে হবে।

আবু বকর রা.-এর ওপর আলি রা.-এর ফজিলত সাব্যস্তকরণ, শিয়াদের বিলায়াত ও ইমামাত স্বীকার করা, মাহদিকে ইসনা আশারিয়া শিয়াদের মতো ১২তম ইমাম মনে করা—এগুলো তাহির কাদরির বিভিন্ন বই ও বক্তব্যে এখনো প্রমাণিত। তবে ভবিষ্যতে তিনি কখনো এই অবস্থান থেকে ফিরে এলে সেটা ভিন্ন কথা।

আবার এটাও সত্য যে, তিনি যদিও খুলাফায়ে রশিদিন এবং সকল সাহাবির ওপর আলি রা.-এর ফজিলত প্রমাণ করেছেন, সেই সঙ্গে আলি রা.-এর বিলায়াত ও ইমামাত প্রমাণ করতে গিয়ে মিথ্যা ও স্বপ্রণীত যুক্তি ও বাক্যালংকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি জাফারি অথবা জায়দি ফিকহের অনুসারী নন; বরং সবসময় নিজেকে মতাদর্শে সুন্নি এবং ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফিই বলেন। অতএব বলা যেতে পারে, প্রফেসর ড. তাহির কাদরি আকিদার বিবেচনায় তাফজিলি শিয়া হলেও ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফি এবং মতাদর্শে বেরেলবি।

ড. তাহির কাদরি নিম্নোক্ত আকিদা পোষণকারী শিয়াদেরকে অকাট্য কাফির বলেন :

১. যারা আলি রা.-এর উলুহিয়াত বা ইলাহের প্রবক্তা।
২. যারা জিবরিল আ.-এর ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে, তিনি ভুলে আলি রা.-এর পরিবর্তে রাসুল ﷺ-এর কাছে ওহি নিয়ে এসেছিলেন।
৩. যারা কুরআনের বিকৃতিসাধন ঘটেছে বলে মনে করে।
৪. যারা আয়েশা রা.-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে।
৫. যারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, কিছু সাহাবি মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়েছেন।
৬. যারা আবু বকর রা.-এর সাহাবিয়াত অস্বীকার করে।

## দশ. তাহির কাদরির স্বপ্ন

প্রফেসর কাদরি তাঁর স্বপ্নের জন্যও অনেক সময় মাজহাবি এবং সালাফি সব ধরনের লোকদের সমালোচনার শিকার হন। বিশদ এই স্বপ্নগুলো অডিয়ো-ভিডিয়ো আকারে পাওয়া যায়। এর কিছু ইউটিউবেও উপলভ্য।

তাঁর একটি স্বপ্নের সারসংক্ষেপ এমন, সিন্ধুর কোনো এক শহরে একবার রাসুল ﷺ-এর আগমন ঘটে। লোকজন রাসুলের জিয়ারতে জড়ো হয়। একে একে সবাই আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই জিয়ারতের (সাক্ষাতের) অনুমতি পায় না। শেষমেশ রয়ে যান একা প্রফেসর কাদরি। তিনি রাসুলের দর্শনে ধন্য হন। রাসুল ﷺ তাহিরকে অনুযোগ করে বলেন, 'আমি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, আলিম, ইসলামি জামাআত ও দলসমূহের প্রতি অসন্তোষ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। তারা আমাকে সম্মান করেনি। ফলে আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করিনি।' তারপর প্রফেসর তাহির নবিজিকে মিনতি করেন, পায়ে পড়েন, মানত করেন; ফলে নবিজির হৃদয় কোমল হয়। রাসুল ﷺ তখন পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি হন। তবে তাহির কাদরিকেই আতিথেয়তার দায়িত্ব নিতে হবে। পাকিস্তানে অবস্থান ও খাবারের ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ ভ্রমণসহ মদিনায় ফিরে যাওয়ার টিকেট এবং থাকার ব্যবস্থা প্রফেসর সাহেবই করবেন। তারপর রাসুল ﷺ বলেন, 'তুমি মিনহাজুল কুরআন ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠা করো, আমি সেখানে তাশরিফ আনব।'

আরেক স্বপ্নের সারসংক্ষেপ এমন, জুমুআর দিন আজানের সময়। মসজিদে নববিতে প্রচণ্ড ভিড়। মুআজ্জিন যখনই আজান দিতে দাঁড়ান, রাসুলের পক্ষ থেকে হুকুম হয়, 'এই মুআজ্জিনকে সরিয়ে দাও, আজ জুমআর আজান তাহির দেবে।'

আরেকটা স্বপ্নের ব্যাপারে ড. তাহির কাদরি বলেন, মরু-এলাকার বালুময় টিলা, সেখানে রাসুল ﷺ এলেন। ডানে আবু বকর এবং বামে উসমান। আমি সবার ছোট। রাসুল আমাকে বুকে জড়ালেন। চার খলিফায়ে রশিদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁদেরকেও আমার পরিচয় জানালেন।

আরেক স্বপ্ন সম্পর্কে কাদরি বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার বয়স ২৩ বছর নির্ধারণ করলেন, এরপর রাসুল ﷺ তা বাড়িয়ে করলেন ৬৬; কিন্তু আমি তা কবুল করিনি। কারণ, এভাবে বয়সের ধারায় সুন্নাতে নববির বিরোধিতা হয়। তাই রাসুল ﷺ আবার আল্লাহ তাআলার কথামতো ২৩ বছরই করে দেন।

## এগারো. কাদরির সমালোচক

প্রফেসর তাহির কাদরির দুই শ্রেণির সমালোচক রয়েছেন। প্রথম শ্রেণি মাজহাবপন্থি, দ্বিতীয় শ্রেণি তার বিপরীত। মাজহাবপন্থিদের মধ্যে বেরেলবি, দেওবন্দি, আহলে হাদিস এবং শিয়াদের কিছু আলিম তাঁর সমালোচনা করেন। সমালোচনার ধারাবাহিকতা শুরু হয় বেরেলবি ধারা থেকেই। ফেডারেল শরয়ি আদালতের উপদেষ্টা গোলাম সারওয়ার কাদরি *প্রফেসর তাহির কাদরি : ইলমি ও তাহকিকি জায়িজা* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মুফতি গোলাম সারওয়ার প্রফেসর তাহিরের ব্যাপারে বলেন, 'তিনি দেখেও কুরআন কারিম পড়তে পারেন না, আর বিশুদ্ধ অনুবাদ করার সামর্থ্যও তাঁর নেই।' অধিকন্তু অডিয়ো ক্যাসেট থেকে কাদরির আরবি পাঠের কিছু ভুলও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি প্রফেসর কাদরির ব্যাপারে দুই আঙুল পরিমাণ দাড়ি রাখা সুন্নাত আখ্যা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। এ-ও উদ্ধৃত করেন, প্রফেসর সাহেব নারীর অর্ধেকের পরিবর্তে পূর্ণ দিয়াত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁর এই অবস্থান উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদার বিপরীত। জনাব কাদরিকে তাফজিলি শিয়া আখ্যায়িত করার পাশাপাশি আরও কঠিন কিছু আপত্তিও তোলেন গোলাম সারওয়ার কাদরি।

মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মাদ সাদিক *প্রফেসর তাহির কাদরি : উলামায়ে আহলে সুন্নাতকে নজর মেঁ* নামে একটি বই লেখেন। মুহাম্মাদ নাওয়াজ খারলও *মুতানাজাআ তারিন শাখসিয়াত* নামে একটি সমালোচনামূলক রচনা-সংকলন প্রকাশ করেন।

জামিয়া রিজবিয়া মাজহারুল ইসলাম ফায়সালাবাদের বেরেলবি আলিমদের মধ্যে মাওলানা গোলাম রাসুল রিজবি, মুফতি মুহাম্মাদ আসলাম রিজবি, মুহাম্মাদ হাবিবুর রাহমান, আবু সালিহ মুহাম্মাদ বখশ, মুহাম্মাদ নিজামুদ্দিন, মুহাম্মাদ সায়িদ নকশবন্দি

প্রমুখ তাহির কাদরির বিরুদ্ধে এক সর্বসম্মত ফাতওয়া জারি করে তাঁকে আহলে সুন্নাতের শত্রু আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর ইকতিদায় নামাজ আদায় করা নাজায়িজ আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি এই ফাতওয়ায় মিনহাজুল কুরআনে নিজেদের ছেলেদের পড়তে দিতে বারণ করা হয়।

মুফতি আশরাফ কাদরি প্রফেসর তাহির কাদরির ব্যাপারে বলেন, এই ব্যক্তি প্রথমে সহিহ আকিদা লালনকারী সুন্নি এবং হানাফি থাকলেও পরে মুজতাহিদ হয়ে গেছেন। নারীর দিয়াতের মাসআলায় কাদরি উম্মাহর সর্বসম্মত মতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। এ কারণে তিনি যাই হোন, অন্তত আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নন।' তিনি প্রফেসর সাহেবের প্রতি আপত্তি করে বলেন, খোমেনির মৃত্যুর পরে ইমামবাড়ায় কালো জুব্বা পরে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের প্রতিটি শিশু খোমেনি হবে। খোমেনির জীবন ছিল আলির মতো, মৃত্যু ছিল হুসাইনের মতো।'

এ ছাড়া মুফতি আশরাফ কাদরি তাহির সম্পর্কে বলেন, তিনি নেহাত পথভ্রষ্ট এবং ফাসিক।

সাইয়িদ ইরফান শাহও প্রফেসর তাহির কাদরিকে শায়খুল ইসলামের বদলে 'শায়খ ফিল ইসলাম' তথা 'বৃদ্ধ মুসলিম' অভিধা প্রদান করেন। প্রফেসর কাদরি অশিষ্ট খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিলে সাইয়িদ ইরফান শাহ তাঁর সমালোচনা করেন।

মাওলানা কাউকাব নুরানি প্রফেসর সাহেবের সমালোচনা করে বলেন, কাদরি খ্রিষ্টানদের মিনহাজুল কুরআনের মসজিদে উপাসনা করার দাওয়াত দেন। আমরা তাঁর এ বক্তব্য মানতে রাজি নই। তিনি তাহির 'আল কাদরি' থেকে 'আল পাদরি' হয়ে গেছেন।

আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমরান সাকিব ড. *তাহির আল-কাদরি কি ইলমি খিয়ানতি* এবং *তাহির আল-কাদরি : খাদিমে দীনে মাতিন ইয়া আফফাকে আজিম* নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তক দুটিতে তিনি তাহির কাদরির বিদআত, শিরক, অসিলা ও সাহায্যপ্রার্থনা বিষয়ক চিন্তাধারা, শিয়াবাদ এবং মিলাদুন্নবি সংক্রান্ত মতাদর্শের কঠিন সমালোচনা করেছেন।

দেওবন্দি আলিমদের মধ্যে অনেকে তাকে 'কানাডিয়ান শায়খুল ইসলাম' আখ্যা দিয়েছেন। সালাফি ধারার কয়েকজন আলিম তাঁকে 'শুখুল ইসলাম' বলেন। মুলতান থেকে প্রকাশিত মাসিক *আল-আহরার* এবং *আল-ইকাজেও* তাঁর ব্যাপারে পর্যালোচনামূলক কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া লা-মাজহাবিদের প্রসিদ্ধ সমালোচনাগুলোর মধ্যে একটি বিচারিক রায়ও আছে। এই রায়ের পটভূমি ছিল এমন—প্রফেসর কাদরির মডেল টাউন লাহোরের

বাসায় ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল ভোরে রহস্যজনক গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। পাঞ্জাব বিচারালয়ে মামলা দায়ের করা হলে এর তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর আদালত রায় দেন। রায়টির সারসংক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত হলো :

> যে গোলাগুলির কথা বলা হয়েছে, তা সত্য নয়। জনাব কাদরির ক্ষতি আদতে তাঁরই কর্মফল। তাঁর এই অবিবেচক কাজ থেকে মনে হয়, তিনি একজন অসুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, যার ফলে তিনি নিজের শত্রুদের থেকে—যে রকমের শত্রুই হোক—চূড়ান্ত রকম ভীত; বরং তিনি শত্রুফোবিয়ায় ভোগেন। এ বিষয়ে তিনি প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনার শক্তি রাখলেও করেন না।
>
> আসল কথা হলো, জনাব কাদরি তাঁর বিশেষ স্বপ্নসমূহ আলোচনায় আনতে যে অস্থির থাকেন, সেই অসুস্থতাই মূলত তাঁর মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। এটাও হতে পারে যে, কোনো স্বপ্ন অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। আবার তাঁর গোঁড়ামিও উপেক্ষা করার মতো নয়। কারণ, নিজের স্বপ্নগুলো তিনি এক বিশেষ ঢঙে উপস্থাপন করেন, নিজের ব্যক্তিত্বকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। এই ধরনের চতুর ব্যক্তিরা কী করতে পারে না? মধ্যরাতে অস্ত্রধারীদের আক্রমণের নাটক এর বাইরে হবে, তা কে বলবে?[৪৯]

আদালতের এই রায় অনুযায়ী প্রফেসর সাহেব প্রসিদ্ধিলাভের জন্য নিজের বাসায় নিজেই গোলাগুলির ঘটনা ঘটান; আর এর অপবাদ চাপিয়ে দেন বিরোধী রাজনীতিকদের ওপর।

## বারো. উপসংহার

প্রফেসর তাহির কাদরির ব্যাপারে আমাদের সমাজে দুই শ্রেণির মানুষ আছেন। প্রথমত তাঁর ভক্তশ্রেণি ও অনুসারী। এরা তাঁকে শায়খুল ইসলাম, মুজতাহিদে মুতলাক এবং কিবলা হুজুরের চেয়ে কম সম্মান দিতে রাজি নন। দ্বিতীয় শ্রেণি তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। এরা তাঁকে তাহির আল পাদরি, মুরতাদ এবং ক্রুসেডারদের মুফতি ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করতে ভালোবাসেন। প্রফেসর কাদরির অ্যাকাডেমিক এবং চারিত্রিক বিচ্যুতির ভারসাম্যপূর্ণ সমালোচনা ও বিশ্লেষণ এখন নেহাত প্রয়োজন। কাফির অথবা বিচ্যুত আখ্যা দেওয়ার মতো ফাতওয়ার ভাষা ব্যবহার না করে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা সময়ের দাবি।

নিচে আমরা কাদরির আধুনিকতাবাদী চিন্তাধারা বিষয়ে *মুতানাজাআ তারিন শাখসিয়াত*

[৪৯] *তাহির আল-কাদরি ময়দানে কারজার মেঁ* : ২০৯-২১০। ইনকিশাফ পাবলিশার্স, লাহোর।

গ্রন্থ থেকে একটি নিবন্ধের কিয়দংশ উল্লেখ করছি। যদিও এই সমালোচনায় কিছু শব্দ কঠিন হয়ে গেছে, তবু যুক্তির বিচারে কথাগুলো যথাযথ এবং সঠিক।

> *এই বই মূলত প্রফেসর তাহির কাদরির আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার বৃত্তান্ত। এতে অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিতে ভারসাম্য রক্ষা করে তাঁর সমালোচনা করা হয়েছে। তাহির কাদরির ব্যাপারে পরিতাপের বিষয় হলো, তিনি সবসময় কথা ও কাজে বৈপরীত্যের শিকার হন। ভেতরের ও বাইরের এই দ্বিমুখিতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করে দিয়েছে। একদিকে তিনি বেনজির ভুট্টোকে নিজের বোন এবং অপরদিকে আবার দুর্নীতিগ্রস্তও বলেন। নাওয়াজ শরিফকে একদিকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি আখ্যা দেন, আবার পারমাণবিক পরীক্ষার জন্য অভিনন্দনও জানান। একদিকে বলেন, প্রতিবাদ ও র‍্যালির মাধ্যমে দেশে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হবে; আবার তিনিই বড় গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিবাদ-সভা, র‍্যালি ও মিছিলের আয়োজন করেন। এক জায়গায় সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করলে আরেক জায়গায় মিলাদ কনফারেন্সও করেন ধুমধামের সঙ্গে।*
>
> *ড. তাহির কাদরি বিগত কয়েক বছর থেকে মডারেট, প্রগতিশীল এবং সেকুলারের আলখাল্লা পরে আছেন। বিভিন্ন স্বপ্ন, কাহিনি এবং অনর্থক আলোচনায় তিনি মানুষকে বিনোদন দিয়েই যাচ্ছেন। তাঁর প্রেস কনফারেন্সসমূহ নিষ্প্রয়োজন ও বিরোধপূর্ণ আলোচনায় এবং সত্য-অসত্যের মিশ্রণে পূর্ণ থাকে। খ্যাতনামা মিনহাজুল কুরআন ইন্সটিটিউশন যেসব মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠানটি প্রফেসর তাহিরের নেতিবাচক রাজনীতির শিকার হয়েছে। মহান হওয়ার অন্ধ কল্পনা এবং নিজের মতকে সবার মত মনে করার মানসিক অসুস্থতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করছে। প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যে তরুণদের কর্মজীবনের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার কথা ছিল, তারা এই আন্দোলনের ফলে সমাজে হাসির পাত্র হচ্ছে। মুসতাফাবি আন্দোলনের স্লোগান ত্যাগের পর তাহির কাদরি এই দলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন।*
>
> *একজন কৌতুকাভিনেতার চেয়েও তাঁর অবস্থান কীভাবে নিম্নতর হলো, তা কে জানে। 'কালাল্লাহ' ও 'কালার-রাসুল'-এর ধ্বনিতে মুখরিত শ্রেণিকক্ষগুলোয় 'বান কে মাস্ত মালাং রাহে, তাহির তেরে সাংগ রাহে'-এর মতো সংগীত চলচ্চিত্রের কায়দায় নৃত্যসহ গাওয়া হচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সম্ভবত তিনি মনে করেন, এই মুজাহাদা ও ইশকের মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয় লাভ হবে; যদিও তাতে নিজের মান-সম্মান খোয়া যায়। চিন্তাশীল শ্রেণি একে অধঃপতন ও ধ্বংস বলেই মনে করছেন।*

আদতে যেখানে খোঁড়ারাই নৃত্য করে, অন্ধের দল সুরমা বিক্রি করে, মুণ্ডুহীনেরা পাগড়ি বিক্রি করে, টাকমাথা লোকেরা কেশপ্রসাধনী বিক্রি করে অথবা চলৎশক্তিহীনেরা তরবারি চালনার দাবি করে, সেখানে ভালোর আশা কীভাবে করা যায়? এখানকার বাস্তবতাবোধসম্পন্ন ও চিন্তাশীল শ্রেণি স্বভাবতই অন্ধ এবং সংকীর্ণমনা হয়ে ওঠেন। তবে পরিতাপের ব্যাপার হলো, এই অপূরণীয় ক্ষতির উপলব্ধিও এঁদের মনে জাগে না। ইকবালের ভাষায়—

আফসোসের কথা হলো,<br>
জাতি ধ্বংস ও বিনাশের পথে চলছে,<br>
এরচেয়েও খতরনাক হলো, ধ্বংস ও বিনাশের<br>
উপলব্ধিটুকুও তাদের নেই।

প্রফেসর তাহির কাদরির এ অপরাধ অত্যন্ত ভয়াবহ। সস্তা খ্যাতি, ধন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এমন কিছু স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছেন, যেগুলোতে সরাসরি রাসুল ﷺ-এর প্রতি অশিষ্টাচার রয়েছে। কোনো বোধসম্পন্ন মানুষ এত বেশি বুদ্ধিগত দৈন্যের শিকার হতে পারে, তা কল্পনা করাও কঠিন।





# মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

## এক. জন্ম ও সংক্ষিপ্ত জীবন

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। এরপর মায়ের কাছেই বেড়ে ওঠেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আজমগড়ের সরাইমিরে গতানুগতিক ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসাতুল ইসলাহে ভর্তি হন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে এখান থেকে আলিম কোর্স সম্পন্ন করেন এবং গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নয়াদিল্লিতে *দ্য ইসলামিক সেন্টার* প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে *আর-রিসালাহ* নামে একটি পত্রিকা চালু করেন। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এই পত্রিকা হিন্দি এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায়ও প্রকাশ হয়। *তাজকিরুল কুরআন* নামে দুই খণ্ডে উর্দু ভাষায় তাঁর কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির প্রকাশিত হয়। এই তাফসিরই পরে হিন্দি এবং ইংরেজিতে প্রকাশ হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজের চিন্তাধারা ও দাওয়াত প্রচারের লক্ষ্যে সিপিএস বা সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়্যালিটি প্রতিষ্ঠা করেন, যার মূলকথা দাওয়াত এবং শান্তি। এ ছাড়া ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত *সাপ্তাহিক জমিয়ত* নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *নয়ে আহদ কে দরওয়াজে পর* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে তিনি *মাজহাব আওর জাদিদ চ্যালেঞ্জ* নামে প্রসিদ্ধ আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। *আল-ইসলাম ইয়াতাহাদ্দা* নামে এর আরবি অনুবাদও ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে, যেটি আরবের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক সাময়িকীতে ৫০০ জন প্রভাবশালী মুসলিমের তালিকায় তাঁকে বিশ্ব আধ্যাত্মিক ইসলামের প্রতিনিধি আখ্যা দেওয়া হয়।

## দুই. লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম

ইসলাম, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক সম্প্রীতি, বাকস্বাধীনতা, ভবিষ্যদ্‌বাণীমূলক

জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা এবং বহুজাতিগত সমাজে সহাবস্থানের পাশাপাশি আধুনিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে ওয়াহিদুদ্দিন খান দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *নয়ে আহদ কে দারওয়াজে* পর প্রকাশিত হয়। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ করেন, যা উর্দুতে তাজকিরুল কুরআন; হিন্দিতে পবিত্র কুরআন এবং আরবিতে আত-তাজকিরুল কাওয়িম ফি তাফসিরিল কুরআনিল হাকিম নামে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তাঁর উর্দু রচনাবলির মধ্যে রয়েছে : *আর-রাব্বানিয়া, আমনে আলম, আকলিয়াতে ইসলাম, আকওয়ালে হিকমত, আসবাকে তারিখ, আসফারে হিন্দ, আওরাত মি'মারে ইনসানিয়াত, আজমতে ইসলাম, আজমতে কুরআন, দাওরে দাওয়াত, দীন ওয়া শরিয়ত, দীন ওয়া ইনসানিয়াত, ডায়েরি, ফিকরে ইসলামি, হিকমতে ইসলাম, ইসলাম এক তাআরুফ, ইসলামি তালিমাত, কারওয়ানে মিল্লাত, খাতুনে ইসলাম, কিতাবে মারিফাত, কিতাবে জিন্দেগি, মাজহাব আওর জাদিদ চ্যালেঞ্জ, মুতালাআয়ে হাদিস, মুতালাআয়ে কুরআন, রাজে হায়াত, তাবির কি গলতি, তামিরে হায়াত, তাসবিরে মিল্লাত, তাজকিরুল কুরআন।*

আরবিতে *আল-কাজিয়্যাতুল কুবরা, কাজিয়্যাতুল বা'স আল-ইসলামি, ওয়াকিউনা ওয়া মুসতাকবালুনা ফি জাউয়িল ইসলাম, আল-ইসলাম ইয়াতাহাদ্দা, মান নাহনু, আলাইকুম বিসুন্নাতি, ইমকানাত জাদিদাহ লিদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া, আত-তাফসিরুস সিয়াসি লিদ-দীন, তারিখুদ দাওয়াহ ইলাল ইসলাম, খাতা ফিত-তাফসির, মা'সাতু কারবালা আল-হাসান ওয়াল হুসাইন।*

ইংরেজিতে *এ কেইজ অব ডিসকভারি, এ ট্রেসারি অব দ্য কুরআন, অ্যাবাউট দ্য কুরআন, কলিং পিপল টু গড, কনসার্নিং ডিভোর্স, ডিসকভারিং গড, এক্সপ্লোর ইসলাম, গড অ্যারাইজ : এভিডেন্স অব গড ইন ন্যাচার অ্যান্ড ইন সাইন্স, হিজাব ইন ইসলাম, ইন সার্চ অব গড, ইন্ডিয়ান মুসলিমস : দ্য নিড ফর এ পজিটিভ আউটলুক, ইন্ট্রোডিউসিং ইসলাম : এ সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলাম, ইসলাম অ্যান্ড পিস, ইসলাম অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড পিস, ইসলাম অ্যান্ড দ্য মডার্ন এইজ, ইসলাম অ্যাজ ইট ইজ, ইসলাম ইন হিস্টোরি, ইসলাম রিডিসকভার্ড: ডিসকভারিং ইসলাম ফ্রম ইটস অরিজিনাল সোর্সেস, ইসলাম স্ট্যান্ডস দ্য টেস্ট অব হিস্টোরি, ইসলাম : ক্রিয়েটর অব দ্য মডার্ন এইজ, জিহাদ পিস অ্যান্ড ইন্টার-কমিউনিটি রিলেশন্স ইন ইসলাম, লিভিং এ স্প্রিচুয়্যাল লাইফ, লাইফ ডেথ অ্যান্ড বিয়ন্ড, ম্যান অ্যান্ড গড* ইত্যাদি।

## তিন. চিন্তাধারা ও মতাদর্শ

ওয়াহিদুদ্দিন খানের ইনতিকালের পর জাবেদ আহমাদ গামিদি প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, 'মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আহ্বান ছিল স্বতন্ত্র ধাঁচের। সম্ভবত এমন আহ্বান ইতিপূর্বে কেউ করেননি। পরেও কেউ করবেন, তা-ও বলা যায় না।'

গামিদি যদিও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কথাটি বলেছেন; কিন্তু বক্তব্যটি আমরা যদি বিপরীত দিক থেকে বিবেচনা করি, তাতে একবিন্দু ভুল আছে বলে মনে হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের মিশ্রণে ইসলামের যেই রূপ তিনি দাঁড় করিয়েছেন, নিকট-অতীতে এ ধরনের পণ্ডিত খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর চিন্তাধারা ও মতাদর্শের এক বিরাট অংশ—বরং সমগ্র চিন্তাধারাই—সাধারণ আলিমসমাজের থেকে অন্যরকম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর অবস্থান সংখ্যাগুরু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিপরীত। এসব চিন্তাধারার প্রত্যেকটি বিশদভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়—কিন্তু বিশেষত দীন প্রতিষ্ঠা ও শরিয়তের বাস্তবায়ন-নীতি, জিহাদ ও শান্তি-ভাবনা, খতমে নবুওয়াত ও রিসালাত, ফিলিস্তিন ও কাশমির সংকট ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় এমন যে, এসব ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা না বললেই নয়।

## চার. দীন প্রতিষ্ঠা ও শরিয়ত বাস্তবায়ন-নীতি

দীন প্রতিষ্ঠা, শরিয়ত বাস্তবায়ন এবং ইসলামের রাজনৈতিক কর্মপন্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ওয়াহিদুদ্দিন খানের চিন্তাধারা কয়েকটি ধাপ পার হয়ে গিয়েছে। এর কারণ হলো, জামাআতে ইসলামিতে যোগদানের পর মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারার সঙ্গে যখন তাঁর ভিন্নমত দেখা দেয়, তখন তিনি নিজেও বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি আসলে কী বলতে চাইছেন। ভিন্নমত ছিল তা ঠিক, তবে তা স্পষ্ট করে উপস্থাপন করতে পারছিলেন না খান। পরে একসময়ে তিনি লিখিত আকারে নিজের চিন্তাধারা তুলে ধরেন। প্রতিক্রিয়াও প্রথমদিকে স্বাভাবিক ছিল। তবে ধীরে ধীরে সেই মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারার ব্যাপারে তাঁর অবস্থান বাড়াবাড়ির দিকে চলে যেতে থাকে। ফলে দীন প্রতিষ্ঠা, শরিয়ত বাস্তবায়ন, জিহাদ, নেতৃত্ব, খিলাফত এবং রাজনীতি, ইসলামি আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের প্রশ্নে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর মধ্যে একধরনের প্রান্তিকতা পরিষ্কার হতে থাকে। তাঁর সমালোচনা-নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে খারিজিদের মতো কঠোরতা ও চরমপন্থা প্রকাশ পেতে থাকে।

মাওলানা মওদুদির সঙ্গে ওয়াহিদুদ্দিন খানের যেসব ভিন্নমত ছিল, *তাবির কি গলতি*

গ্রন্থে এর বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। এটি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির প্রথমদিকে মাওলানা সাদরুদ্দিন ইসলাহি, জলিল আহসান নদবি, আবুল লাইস নদবি এবং আবুল আলা মওদুদি প্রমুখের সঙ্গে আদান-প্রদানকৃত পত্রাবলি রয়েছে। দ্বিতীয়াংশে মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারা ও দীনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা এবং তার বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আর তৃতীয় অংশে ওয়াহিদুদ্দিন খান নিজে যেভাবে দীন বুঝতে পেরেছেন সেটাই ব্যাখ্যা করেছেন।

মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারা বিষয়ে ওয়াহিদুদ্দিন খানের দৃষ্টিভঙ্গি যে তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে, সেগুলো বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

### ক. প্রথম ধাপ

শুরুর দিকে যখন মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদুদির চিন্তাধারার সঙ্গে ওয়াহিদুদ্দিন খানের মতভিন্নতা দেখা দেয়, তখন সহকর্মীদের কাছে তিনি তা এক-আধটু প্রকাশ করতেন। নিজের চিন্তাভাবনা ও অবস্থান তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না বলে খুব একটা খোলাখুলি বলতে চাইতেন না। মাঝেমধ্যে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের কানে গেলেও এসবকে স্বাভাবিক মনে করে তাঁরা একাধিকবার মীমাংসার চেষ্টা করেন। খান লিখেছেন, 'জামাআতের আরেকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার একাধিকবার আলোচনা হয়। তিনি বরাবরই আমাকে বুঝাতে চাইছিলেন যে, আপনার চিন্তাধারা আর দলের মতাদর্শে খুব একটা হেরফের নেই। এই কথাবার্তা ১৯৬০ বা এর আগে-পরে দিল্লির রামপুর অথবা আজমগড়ে হয়েছিল। আরও কয়েকজন আমাকে এমনটাই বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে, এসব মতান্তর খুব স্বাভাবিক, দুই চিন্তাধারায় মূলত কোনো পার্থক্য নেই। এসব যখনকার ঘটনা, তখনও আমার *তাবির কি গলতি* প্রকাশ হয়নি।'[৫০]

### খ. দ্বিতীয় ধাপ

ক্রমশ ওয়াহিদুদ্দিন খান যখন নিজের ভিন্নমত লিখিত আকারে প্রকাশ করতে শুরু করেন, তখন মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর ব্যবধান একটু একটু করে পরিষ্কার হতে থাকে। ওয়াহিদুদ্দিন খান লেখেন, 'উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য—যিনি আলিমও ছিলেন—আমার লেখা পড়ার পর বললেন, ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে যখন সামান্য কথা হয়েছে, আমি তো মনে করেছিলাম মাওলানা মওদুদি দীনের ব্যাখ্যায় বাড়াবাড়ি করেছেন বলে আপনার অভিযোগ। এতে আমিও একমত ছিলাম। কিন্তু এখন আপনার লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, মওদুদি সাহেব দীনের গোটা ব্যাখ্যাটাই

[৫০] *তাবির কি গলতি* : ২৪-২৫।

ভুলভাবে করেছেন বলে আপনি বলছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে কোনোভাবেই আমি একমত হতে পারছি না।'[৫১]

ওয়াহিদুদ্দিন খানের সে সময়ের লেখা পড়ে মনে হয়, মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারার সঙ্গে মৌলিকভাবে একই অবস্থানে থাকলেও তিনি মনে করেন বর্ণনাভঙ্গিতে মাওলানা মওদুদি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। শুরুর দিকে ভিন্নমত বলতে যা বোঝা যায় তা ছিল এই যে, মাওলানা মওদুদির চিন্তাভাবনা মৌলিকভাবে যদিও সঠিক, তবু সামগ্রিকভাবে তাকে যথার্থ বলা যায় না। খান সাহেবের ভাষায়, 'মাওলানা মওদুদির সাহিত্যে দীনের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে সে ব্যাপারে আমার স্পষ্ট বক্তব্য হলো, এর অবস্থান দীনের সঠিক চিন্তাধারা থেকে অনেক দূরে। এসব ব্যাখ্যার মূল উপাদান যদিও ঠিক, যা মূলত আল্লাহ তাআলার দীনেরই ব্যাখ্যা; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার রূপ আপাদমস্তক এমনভাবে বদলে গেছে, যার ফলে তার প্রকৃত রূপই এখন আর অবশিষ্ট নেই।'[৫২]

ওয়াহিদুদ্দিন খান আরেক জায়গায় মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারা খণ্ডন করতে গিয়ে লেখেন, 'যে রাজনীতি মূলত ইসলামেরই একটি অংশ, তাকে সামনে রেখে এখন পুরো ইসলামেরই ভিন্নতর রূপ দাঁড় করানো হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি এই অভিযোগ করছি না যে, মাওলানা মওদুদি রাজনীতিকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাজনীতি তো জীবনেরই এক অপরিহার্য অংশ। মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ক্ষেত্রের সঙ্গেই রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কোনো ইসলামি দল বিশেষ কোনো সময়ে রাজনীতিতে কতটুকু শক্তি ব্যয় করবে, আমার অভিযোগ তা নিয়েও নয়। বিশেষ কোনো সময়ে তাঁরা নিজেদের পূর্ণ শক্তি বা অধিক শক্তি শুধু রাজনীতিতেই ব্যয় করতে পারেন, এমনটা খুবই স্বাভাবিক। আমার অভিযোগ মূলত এই যে, যে রাজনীতি আদতে ইসলামেরই একটি অংশ, তাকে এখানে পুরো ইসলামরূপে হাজির করার চেষ্টা চলছে। কোনো জিনিস তার প্রকৃত অবস্থানে থাকলে যেমন সঠিক থাকে, অবস্থান পরিবর্তিত হলে সেই জিনিসই ভুল বলে প্রমাণিত হয়।'[৫৩]

পাকিস্তানে শরিয়ত ও ইসলামি ইমারাত বা শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ন্যায্যতা তুলে ধরে ওয়াহিদুদ্দিন খান লেখেন, 'দীনের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে এখন আমাদের কর্মপন্থা কী হতে পারে, এবার সে বিষয়ে কথা বলতে চাই। পাকিস্তানে মাওলানা মওদুদি শরিয়ত প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব পালন করছেন, তা গঠনমূলকভাবে সঠিক বলেই আমি মনে করি। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। স্বাধীন হওয়ার পর মৌলিকভাবে

[৫১] প্রাগুক্ত : ২৬।
[৫২] প্রাগুক্ত : ২১।
[৫৩] প্রাগুক্ত : ২৬৬।

এখানকার অধিবাসীরা এই অধিকার লাভ করেছেন যে, তারা এখানে যে জীবনব্যবস্থা এবং শাসনপদ্ধতি চান, তা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এ অবস্থায় পাকিস্তানের মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য হলো, তারা ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং সে অনুসারে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ইসলামি বিধান ও নিয়ম জারি করবে। কেননা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রাখা অপরিহার্য।'[৫৪]

অন্যত্র হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানে রাজনীতির সম্ভাবনা এবং পন্থা নিয়ে তিনি বলেন, 'সত্য কথা হচ্ছে, একটি স্বাধীন মুসলিম সমাজের জন্য আবশ্যক হলো তারা ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতি করবে। কারণ, তা ছাড়া সমাজের সর্বস্তরে শরিয়তের বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে মুসলিমদের এমন ক্ষমতা না থাকে, সেখানে তাদের বাহ্যিক জীবনে ইসলাম যে দায়িত্ব অর্পণ করে, তা নেতৃত্ব হাসিল নয়; বরং মানুষকে অন্যায়ের বিষয়ে সতর্ক করা এবং ভালো কাজের প্রতিদানের সুসংবাদ প্রদান করা। এই সতর্কীকরণ এবং সুসংবাদপ্রদানের ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিস্থিতিই সামনে আসুক, তাতে দৃঢ়পদ থাকা চাই। যদি তারা এই দায়িত্ব পালন করে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের জন্য তিনি এমন অবস্থা তৈরি করবেন, যার ফলে তারা সহজেই শাসনক্ষমতা লাভ করতে পারবে। প্রথম অবস্থায় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ইমানদারদের জন্য ফরজ। আর দ্বিতীয় অবস্থায় শাসনক্ষমতা প্রদান করা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ।'[৫৫]

মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারার বাড়াবাড়ি নিয়ে আরেক জায়গায় ওয়াহিদুদ্দিন খান লিখেছেন, 'এই ব্যাখ্যা অনুসারে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে স্বরূপ সামনে আসে, তা হচ্ছে শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন। আমি স্বীকার করি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্তরসমূহের মধ্যে এটিও একটি স্তর; কিন্তু এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটি তার প্রকৃত অবস্থান থেকেই সরে গেছে।'[৫৬]

তিনি আরও লেখেন, 'এমন লোকদের অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, তারা নিজেদের ব্যাপারেই উদাসীন হয়ে পড়েন, কিন্তু বৈশ্বিক সমস্যার আলোচনায় তারা অক্লান্ত। সালাত কায়িমের কথা বললে তাদের মধ্যে তেমন আগ্রহ তৈরি হয় না, কিন্তু ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জিকির তারা নিয়মিতই করে। ব্যক্তিজীবনে তাদের যতই অপূর্ণতা থাকুক, বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে তাদেরকে নিয়মিতই আলোচনা করতে হয়। নিজেদের ঘরবাড়িতে দুনিয়া-পূজারিদের অনুসরণ হয় ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রকে দুনিয়া-পূজারিদের প্রভাবমুক্ত করতে তারা চেষ্টার ত্রুটি রাখেন না। আল্লাহর স্মরণ তাদের মনে যদি না-ও থাকে, তবু

---

[৫৪] প্রাগুক্ত : ৩২৮।
[৫৫] প্রাগুক্ত : ৩০৬।
[৫৬] প্রাগুক্ত : ২৭০।

সম্প্রচারকেন্দ্রসমূহের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারা দুনিয়াজুড়ে আল্লাহর ইবাদতের বিস্তার কামনা করে। নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের জন্য যা কিছু করা দরকার, তাতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন থেকে নিয়ে জাতিসংঘের সংস্কারের জন্য শত শত পরামর্শ নিয়ে বসে থাকে। পত্রপত্রিকায় তাদের বক্তব্য দেখলে বোঝা যায়, ইসলামের জন্য তাদের কী দরদ! উম্মাহর ছোট-বড় প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানের জন্য তারা অধীর হয়ে পড়ে। কিন্তু কাছে গেলে টের পাওয়া যায়, বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের এই নিন্দা নিয়মমাফিক নিন্দা জ্ঞাপনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। যে শোক মৃতদের বিরহে নয়, বরং জীবিতদের কথা ভেবে জানানো হয়। নিজেদের মধ্যে তারা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অসচেতনতামূলক আচরণ করে, কিন্তু আন্দোলনের সাফল্য তারা এমনভাবে উদযাপন করে যেন খিলাফতে রশিদা আবার ফিরে এসেছে!'[৫৭]

দলের নেতৃবৃন্দের আত্মশুদ্ধির জন্য এ কথাগুলো মূল্যবান বইকি। আরেক জায়গায় মাওলানা মওদুদির চিন্তাশীল সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, মাওলানা মওদুদির সাহিত্যই আমার প্রধান আলোচ্য। তিনি বলেছেন, এর দ্বারা আমরা তাঁর তাবৎ সাহিত্যকর্মকেই ভ্রান্ত মনে করি। আমি বলেছি, আমার উদ্দেশ্য এমনটা নয় যে একে আমরা পরিপূর্ণভাবেই ভ্রান্ত মনে করি, পাঠাগারসমূহে এসব বইপত্র থাকা নিয়েও আমাদের অভিযোগ নেই। আমাদের কথা হলো এই সাহিত্যের স্তর নিয়ে। কারণ জামায়াতের আলোচনাসভাগুলোতে এই সাহিত্যের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যার ফলে এসবকেই জামায়াতের মুখপত্র মনে করা হয়।'[৫৮]

ওয়াহিদুদ্দিন খান *তাবির কি গলতি* গ্রন্থে মাওলানা মওদুদির চিন্তাগত সীমালঙ্ঘন ও তাঁর ভ্রান্তিসমূহের যেসব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, কোথাও কোথাও বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা কঠোর হলেও তা আসলেও ঠিকই। এ জন্যই *তাবির কি গলতি* প্রকাশের পর খোদ জামায়াতেরই সিনিয়র অনেক সহকর্মী এসব পর্যালোচনা খোলামনে গ্রহণ করেছিলেন।

ওয়াহিদুদ্দিন খানের ভাষায়, 'জামায়াতের একজন উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মন্তব্য করেছেন, সামগ্রিকভাবে না হলেও অন্তত কর্মপন্থায় ভিন্নমত দেখা যাচ্ছে।'[৫৯]

ড. ইসরার আহমাদও ওয়াহিদুদ্দিন খানের মতোই চিন্তাগত ভিন্নমতের কারণে জামায়াতে ইসলামি ত্যাগ করেন। তিনি মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারায় শুধু এই অসামঞ্জস্যই অনুভব

---

[৫৭] প্রাগুক্ত : ২৬৭।

[৫৮] প্রাগুক্ত : ১০০-১০১।

[৫৯] প্রাগুক্ত : ৩০-৩১।

করেননি, বরং জামায়াত কর্তৃক তানজিমে ইসলামি ধ্বংসের অপচেষ্টাও উপলব্ধি করেছেন। ইসরার আহমাদ একদিকে যেমন সংগঠনটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মনেপ্রাণে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু করার চিন্তা দেখতে চান, অন্যদিকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কারের পাশাপাশি ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ও তাজকিয়াকেও পূর্ণরূপে তারবিয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মনে করেন।

যাই হোক, ওয়াহিদুদ্দিন খান এবং জামায়াতে ইসলামির নেতৃবৃন্দের মধ্যকার দ্বিমুখী কঠোরতার উৎস এখন খুঁজে বের করা দরকার। এ নিয়ে আপত্তির সূচনা কোথা থেকে শুরু হয়েছে তা বের করা যদিও কঠিন, তবু বাহ্যিকভাবে মনে হয় এটা ওয়াহিদুদ্দিন খানের থেকেই হয়েছে।

ওয়াহিদুদ্দিন খান জলিল আহসান নদবিকে দেওয়া এক চিঠিতে স্বীকারোক্তি করে বলেন, 'আমি মেনে নিচ্ছি, আমার লেখার ধাঁচ বাস্তবেই কঠোর।'[৬০]

জবাবি চিঠির সূচনায় জলিল আহসান নদবি বলেন, 'জনাব ওয়াহিদুদ্দিন খানকে আমার সালাম। এই পত্রে যদি কোনো কথা তিক্ত হয়ে যায়—আমি তাঁকে এতে ভ্রুক্ষেপ না করতে বলব। কারণ এই কঠোরতা মূলত তাঁরই সৃষ্টি।'[৬১]

এই কঠোরতা ও অশিষ্টাচারের সূচনা যদিও ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াহিদুদ্দিন খানের *তাবির কি গলতি* গ্রন্থ প্রথমবার প্রকাশের পরে হয়েছে; কিন্তু এটাও সত্য যে, জামায়াতের আলোচনাসভাগুলোয় তাঁর এই কঠোরতার শক্ত জবাব দেওয়া হয়। ফলে পরবর্তী ২০-২৫ বছর ওয়াহিদুদ্দিন খানের কথা মতে জামায়াত কর্তৃক তিনি বেশ সমালোচনার শিকার হন। পরিণত হন তাদের লক্ষ্যবস্তুতে।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াহিদুদ্দিন খান লেখেন, 'বাস্তবতা হলো, *তাবির কি গলতি* গ্রন্থে যে চিন্তাধারার আমি সমালোচনা করেছি, অ্যাকাডেমিকভাবে তা পুরোদস্তুর অসারই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সংগঠনটির সদস্যদের দলীয় মনোভাব তাদের ভুল স্বীকারে প্রস্তুত হতে বাধা দিয়েছে। পরাজিত মানসিকতার ফলে তারা এর প্রতিবাদে বেশ পরিকল্পিতভাবে লেখকের দুর্নাম রটানোর দায়িত্ব পালন করছে। গঠনমূলক পর্যালোচনার পরিবর্তে সমালোচনার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের জানা দরকার ছিল, এভাবে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হচ্ছে। ফলে আবারও প্রমাণিত হলো, তারা জ্ঞানের দৈন্যের পাশাপাশি চারিত্রিক অধঃপতনেরও সমান শিকার।'[৬২]

---

[৬০] প্রাগুক্ত : ১২২।
[৬১] প্রাগুক্ত : ৫০।
[৬২] প্রাগুক্ত : ১১।

## গ. তৃতীয় ধাপ

এই ২০-২৫ বছরে জামায়াতের সংঘাতমূলক আচরণে ওয়াহিদুদ্দিন খানের বিপ্লব ও আন্দোলনের চিন্তায় এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, শরিয়ত বাস্তবায়নের রাজনীতি, জিহাদ এবং সর্বোপরি ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কেই তাঁর মধ্যে গড়িমসি দেখা দেয়। এখান থেকেই তাঁর চিন্তাধারায় ধীরে ধীরে ভারসাম্যহীনতা ও অসামঞ্জস্য তৈরি হতে থাকে। প্রতিক্রিয়া জানানোর এই মানসিকতা ক্রমেই ভিন্ন আরেক চিন্তাধারায় রূপ নেয়। তিনি যখন জামায়াতের উচ্চপর্যায়ের কয়েকজন দায়িত্বশীলকে *তাবির কি গলতি* গ্রন্থটি দেখান, তখন তারা মন্তব্য করতে গিয়ে খানকে বলেন, 'জনাব আবুল কালাম, মাওলানা মওদুদি এবং আপনি—তিনজন একই ধরনের ভুলের মধ্যে পড়ে আছেন। আর তা হলো, সাময়িক কিছু ভুলের নিরসনের চেষ্টা যদিও প্রত্যেকেই করেছেন, তাতে পরিস্থিতি শান্ত তো হয়নি, বরং সেই চেষ্টা উলটো দীনের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যার রূপ ধারণ করেছে। যা মূলত কর্মপন্থার সংস্কার বিষয়ে ছিল, তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদরূপে দাঁড় করানো হয়েছে। ফলে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির সৃষ্টি হয়েছে। ভারসাম্য আর রইল না।'[৬৩]

ওয়াহিদুদ্দিন খানের ক্ষেত্রেও একই কথা। তিনি দীনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন দিকে প্রভাবিত, কঠোরতা এবং চরমপন্থার শিকার হয়েছেন। এর সূচনা তাঁরই *রাহে আমল* (১৯৯০)-এ। এই বইয়ে তিনি লেখেন, 'বর্তমানে মুসলিমদের প্রত্যেকটি বড় আন্দোলনই সীমাহীন ব্যর্থতার শিকার হয়েছে। তারা যখনই কোনো আন্দোলনের স্লোগান তোলে, আল্লাহ তাদেরকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। ফলে মনে হয়, তাদের এসব কার্যক্রম আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। যে কারণে তাদেরকে তিনি শুরুতেই ব্যর্থ করে দেন।'[৬৪]

আমেরিকায় নাইন ইলেভেনের ঘটনার পর শরিয়ত বাস্তবায়ন, দীন প্রতিষ্ঠা, জিহাদ এবং ইসলামি শাসন ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াহিদুদ্দিন খানের মধ্যে অস্বাভাবিক চরমপন্থা দেখা যায়। এ শব্দগুলো তাঁর কাছে অনেকটা গালিতে পরিণত হয়। এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'কিন্তু আমি ১৮ অক্টোবরের পরপরই এ কথা বলেছিলাম এবং এখনো বলছি, বোমা বিস্ফোরণ কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান নয়। আমেরিকার নীতিনির্ধারকেরা একে খুব সরলভাবে সন্ত্রাসবাদের একটি সমস্যা মনে করে। তাদের ধারণা হলো, তারা পাল্টা বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে একে খতম করতে পারবে; কিন্তু এটি প্রকৃত বিচারে খুবই ঠুনকো এক ধারণা মাত্র। বাস্তবতা হলো, ইসলামিক টেরোরিজম এমন

---

[৬৩] প্রাগুক্ত : ৩০-৩১।

[৬৪] *রাহে আমল* : ১১০।

টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ, যাকে একটি পবিত্র আইডিয়োলোজি হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। যেসব মুসলিম আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করছে, তারা উন্মাদ নয়—এই আইডিয়োলোজি শতভাগ ভুল। ইসলামের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এর পেছনে শত বছরের বেশি সময়ের ইতিহাস যুক্ত। সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানি, হাসান আল বান্না, সাইয়িদ কুতুব, মুহাম্মাদ ইকবাল, আয়াতুল্লাহ খোমেনি, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদির মতো অনেক ব্যক্তি ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করে মুসলিমদের মনমস্তিষ্কে তা গেঁথে দিয়েছেন—"ইসলামের সবচেয়ে বড় কাজ জিহাদ। জিহাদ করো আর সহজে জান্নাতে চলে যাও।" এর সমাধান হলো, ইসলামের অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে ধ্বংস করতে হবে। এটি বন্দুক বনাম বন্দুকের ব্যাপার নয়; বরং বন্দুক বনাম আদর্শবাদের ব্যাপার। এই ভিত্তিহীন আদর্শের মূলোৎপাটন করেই আমরা ইসলামের নামে চলা এই সন্ত্রাসবাদ বিনাশ করতে পারি।'

আরেক জায়গায় তিনি লেখেন, 'আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ব্যক্তিগতভাবে সহস্রাধিক মানুষকে আমি সন্ত্রাসবাদ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর সৌভাগ্য লাভ করেছি। ইসলামের নামে বর্তমানে যে মিলিট্যান্সি বা উগ্রতা চালানো হচ্ছে, প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এ সবই সেই সাহিত্যের ফল, যেখানে ইসলামের পলিটিসাইজড ভার্সন তথা রাজনীতিকীকরণের রূপ দেখানো হয়েছে। এবার একে দ্বিতীয়বার ডি-পলিটিসাইজড করা দরকার।'[৬৫]

তিনি আরও লেখেন, 'বর্তমানে বিপ্লবপ্রিয় মুসলিমদের একটি স্লোগান হলো শরিয়তে মুহাম্মাদির বাস্তবায়নের স্লোগান। নিঃসন্দেহে এটি স্বপ্রণীত এক স্লোগান। কুরআন ও হাদিসে এর কোনো সমর্থন নেই। এই স্লোগান সঠিক হওয়ার জন্য অবশ্যই কুরআন অথবা হাদিসে 'শরিয়তে মুহাম্মাদি বাস্তবায়ন করো' মর্মে কোনো বিধান বর্ণিত থাকা দরকার। যেহেতু কুরআন-হাদিসে এমন কোনো বিধান বর্ণিত হয়নি, কাজেই এর ভিত্তিতে রাজনীতি শুরু করা নিঃসন্দেহে এক নবোদ্ভাবিত বিদআত; এটি কোনো ইসলামি কাজ নয়। শরিয়ত বাস্তবায়নের তত্ত্ব সাধারণ কোনো তত্ত্ব নয়। এটি মূলত ইসলামে এক বিরাট কলুষ অন্তর্ভুক্ত করার নামান্তর। এই চিন্তাধারা ইসলামকে জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠার বিষয় বানিয়েছে। অথচ ইসলাম প্রকৃত অর্থে ঐচ্ছিক আনুগত্যের নাম। শরিয়ত বাস্তবায়ন খুব সুন্দর একটি শব্দ, কিন্তু ফলাফলের ভিত্তিতে তা শুধু নাশকতা এবং নাশকতাই।'[৬৬]

---

[৬৫] *আর-রিসালাহ*—জুলাই ২০০৭ : ৩৩-৩৪।
[৬৬] প্রাগুক্ত—অক্টোবর ২০০৯ : ২৯।

খান আরও লেখেন, 'পাকিস্তানের বড় সমস্যা হলো, এর জন্মই হয়েছে একটি নেতিবাচক রাষ্ট্র হিসেবে। পাকিস্তানিরা যাকে 'পাকিস্তান-তত্ত্ব' বলে, তা মূলত হিন্দুবিরোধী তত্ত্বের সুন্দর একটি নাম। হিন্দুবিরোধী তত্ত্বের অর্থ হলো, যারা দাওয়াতের হকদার তাদের সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব। এটি ইসলামে হারাম। পাকিস্তান প্রথমে হিন্দুবিরোধী তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর ক্রমান্বয়ে তা অ্যান্টি অল থিংকিং তথা সর্ববিরুদ্ধ চিন্তাধারায় পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের সব সমস্যার মূল প্রধানত এই নেতিবাচক চিন্তাধারা। আমার ধারণা, এখন শুধু একটি কাজই সম্ভব আর তা হলো, সবাই এই নেতিবাচক চিন্তাধারা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে। সবাই বাস্তববাদী হোক, ব্রিটিশদের চিন্তাধারায় জীবনযাপনের চেষ্টা করা কারও জন্য সমীচীন নয়। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আবশ্যক হলো ইকবাল ও মওদুদির চিন্তাধারার গণ্ডি থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা। নইলে কিছুতেই কারও সংশোধন সম্ভব নয়।'[৬৭]

ওয়াহিদুদ্দিন খান আরও লেখেন, 'কুরআনে বলা হয়েছে, মানবজাতিকে সৃষ্টির শুরুতে যখন আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করলেন, সেখানে আদম ছাড়াও আরো দুটি মাখলুক ছিল—ফেরেশতা এবং জিন। আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তোমরা আদমের সামনে সিজদা করো। ফেরেশতারা আল্লাহর এই নির্দেশ মান্য করলেন; কিন্তু জিন-সম্প্রদায়ের সরদার ইবলিস আল্লাহর নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অবাধ্যতা করল। এটি মানবেতিহাসে স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম ঘটনা। এই রাজনৈতিক অবাধ্যতা বা পলিটিক্স অব অ্যাপোজিশন নিঃসন্দেহে শয়তানের নীতি। অবাধ্যতা না করে স্রষ্টার নির্দেশ মেনে নেওয়া হলো ফেরেশতাদের নীতি। আর অবাধ্যতা করে পলিটিক্স অব অ্যাপোজিশনের বিশৃঙ্খলা দাঁড় করানো শয়তানের পদ্ধতি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই নেতিবাচক রাজনীতি ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। ইমানদারদের মধ্যেও, অন্যদের মধ্যেও। এই নেতিবাচক রাজনীতির সহজ ফলাফল হলো, মানবেতিহাস সৃষ্টির ইতিহাস হওয়ার বিপরীতে নাশকতার ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।'[৬৮]

ওয়াহিদুদ্দিন খানের এই উলটো চরমপন্থা গ্রহণের পেছনে জামায়াতের সাথিদের বৈরী আচরণের পাশাপাশি তাঁর নিজের মানসিকতাও দায়ী। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের মস্তিষ্কেই কিছু দুর্বলতা ও অক্ষমতা রেখেছেন। খান সাহেবের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করলে মনে হয়, জেদ তাঁর মেজাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে জেদের একটি ইতিবাচক দিকও আছে, তা হলো এটা মানুষকে কাজে প্রায়শ অগ্রবর্তী করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, কখনো কখনো জেদ মানুষকে তার মিশনে

---

৬৭ প্রাগুক্ত—মে ২০১১ : ৩৯।

৬৮ *আর-রিসালাহ*—মে ২০১১, : ১৮-১৯।

দৃঢ়পদ রাখে; কিন্তু এই জেদই আবার ভারসাম্যহীন মনোভাবেরও কারণ হয়। যেমনটা আমরা ওয়াহিদুদ্দিন খানের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি।

জলিল আহসান নদবির সঙ্গে ওয়াহিদুদ্দিন খানের যেসব চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে, তার একটিতে জলিল আহসান নদবি বলেন, 'রামপুরে কয়েকজন সাথির সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। সবারই মন্তব্য ছিল, আপনি যখন কোনো বিষয় মনে একবার গেঁথে নেন, এরপর তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তনের চিন্তা করা একেবারেই অনর্থক হয়ে পড়ে। জনাব, আল্লাহ না করুন, আমার আশঙ্কা সত্য না হোক; কিন্তু যেমনটা শুনেছি যদি তা-ই হয়, যে আশঙ্কা আপনার এই লেখা পড়ে মনে হচ্ছে—এই পদ্ধতি সত্যান্বেষীদের নয়। এই ব্যাপারে আপনার ভাবা উচিত।'

আবুল লাইস নদবির নামে এক চিঠিতে ওয়াহিদুদ্দিন খান লেখেন, 'আমার চিন্তাগত ভিন্নমতগুলো নিরসনের চেষ্টা তো পূর্ণরূপে করা হয়নি। তবে এ ধরনের কথা বেশ প্রসিদ্ধ হয়েছে—এই ব্যক্তি তো ধর্মহীন; যা একবার গ্রহণ করে তা আর বর্জন করে না।'[৬৯]

আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই—আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় যে পরিমাণ চরমপন্থার প্রকাশ ওয়াহিদুদ্দিন খান ঘটিয়েছেন, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা উৎস কী? কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও উপেক্ষণীয় নয় যে, এই কারণগুলো কি সমাজব্যবস্থা, ইসলামি শিক্ষা, রাজনীতি, শরিয়ত বাস্তবায়ন, জিহাদ, ইসলামি আন্দোলন এবং খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে খারিজিদের মতো চরমপন্থার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে? এর উত্তর নিশ্চয়ই 'না'।

ওয়াহিদুদ্দিন খানের লেখাজোখা পড়ে বোঝা যায়, প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রবণতা আর মেজাজের বিরোধপূর্ণ ঝোঁক তাঁকে এই অবস্থায় নিয়ে গেছে যে, দুনিয়ার সব বিষয় নিয়ে তিনি বেশ শান্ত ও নিশ্চিন্তে আলোচনা করেন, চূড়ান্ত খারাপ লোকের মধ্যেও কোনো-না-কোনো ভালো গুণ তিনি দেখতে পান; কিন্তু যখনই রাজনীতি, খিলাফত, নেতৃত্ব, শরিয়ত বাস্তবায়ন এবং ইসলামি আন্দোলন অথবা মাওলানা মওদুদির চিন্তাধারার কথা ওঠে, অমনি তাঁর মাথা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায়। প্রতিক্রিয়া জানানোর উন্মাদনায় বিরোধপূর্ণ ও ক্রুদ্ধ মনে এমন সব কথা তিনি বলে ওঠেন, যা কোনো বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ অস্বাভাবিক অবস্থায়ও বলতে পারে না।

## পাঁচ. জিহাদ ও শান্তি-ভাবনা

ওয়াহিদুদ্দিন খান শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদের কথাই স্বীকার করেন। তা-ও আবার

---

[৬৯] *তাবির কি গলতি* : ৯৬।

এ শর্তে যে, তা হতে পারবে শুধু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। তাঁর ভাষায়, 'ইসলামে কেবল প্রতিরোধযুদ্ধ জায়িজ। এর এখতিয়ারও কেবল সামর্থ্যবান শাসকের হাতে। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো দলের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ বৈধ নয়। এ শর্তে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ যদিও জায়িজ, কিন্তু কঠোরভাবে এ থেকে বিমুখ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিরোধের প্রয়োজন হলেও যথাসাধ্য প্রতিরোধ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে এই কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসুল ﷺ-এর যুগে কেবল তিন বার নিয়মমাফিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে : বদর, উহুদ আর হুনাইনের যুদ্ধ। এগুলো ছাড়া বাকিগুলো হয়তো কেবল শান্তিপূর্ণ প্রচারণা ছিল, যেমন নবম হিজরির তাবুক যুদ্ধ। অথবা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও যুদ্ধ ত্যাগ করা, যেমন পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধ। কিছু যুদ্ধের ক্ষেত্রে শুধু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যেমন সপ্তম হিজরির খায়বারের যুদ্ধ। এ ছাড়া নিয়মমাফিক যুদ্ধগুলোর বেলায়ও বলা চলে যে, এগুলো খুব বড় কিছু ছিল না। দুপুরের পরে শুরু হয়ে সন্ধ্যার আগেই শেষ হয়ে গেছে। বদর, উহুদ আর হুনায়ন যুদ্ধ এমনই ছিল। এভাবে দেখা যায় যে, রাসুল ﷺ তাঁর নবুওয়াতি জীবনে সব মিলিয়ে মাত্র দেড় দিনের মতো যুদ্ধ করেছেন।[৭০]

তিনি এ-ও দাবি করেন, বর্তমানে আক্রমণাত্মক জিহাদ এবং কিতালের বিধান রহিত। তাঁর ভাষায়, 'কিতাল বা যুদ্ধ অনেকটা ভায়োলেন্ট অ্যাকটিভিজম বা উগ্র তৎপরতা। এর উলটোটাকে বলা হয় পিসফুল অ্যাকটিভিজম বা শান্তিপূর্ণ তৎপরতা। এটা সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীতে উগ্র তৎপরতার স্থলে শান্তিপূর্ণ তৎপরতা এসেছে। এবার শান্তিপূর্ণ তৎপরতার অধীনে মানুষ সব ধরনের কার্যক্রম করতে পারে। তবে শর্ত হলো চরমপন্থা অবলম্বন করা যাবে না।'[৭১]

উপরিউক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা মনে করি যে, উক্তিটা দুই চরমপন্থার একটাকে আশ্রয় করেছে। প্রথম চরমপন্থা হলো, জিহাদ ও কিতালের আয়াতগুলোর মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলিগের বিধান রহিত মনে করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের সব সমস্যার সমাধান একমাত্র জিহাদই, এমন ধারণা রাখা। এটি কঠোরতাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয় চরমপন্থা হলো, জিহাদ ও কিতালের বিধান রহিত মনে করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও শরিয়ত বাস্তবায়নের একমাত্র পন্থা তাবলিগ—এমন ধারণা নিয়ে বসে থাকা। এটি আধুনিকতাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি। এ দুই চরমপন্থার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যপন্থি অবস্থান হলো, উভয় কাজই কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। সময়ে সময়ে মুসলিমরা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সক্ষমতা এবং সবদিক বিবেচনা করে যে কর্মপন্থা উপযুক্ত

---

৭০ *আর-রিসালাহ*—মার্চ ২০০৮ : ৪-৫।

৭১ প্রাগুক্ত—অক্টোবর ২০০৭ : ১৫।

ও ফলপ্রসূ মনে করবে, তা-ই অবলম্বন করবে। দাওয়াত এবং তাবলিগ তো সবসময়ই চলবে। তবে জিহাদ ও কিতালের ফরজ হওয়ার জন্য শরিয়তের শর্তসমূহ এবং স্পষ্ট নির্দেশ থাকা আবশ্যক। অবশ্য এই বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই।

জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মতো ওয়াহিদুদ্দিন খানের শান্তি ও নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গিও নেহাত আশ্চর্যজনক। তিনি বলেন, 'চরমপন্থা দুই শ্রেণির হয়—একটি নিষ্ক্রিয় চরমপন্থা, অন্যটি সক্রিয় চরমপন্থা। নিষ্ক্রিয় চরমপন্থা হলো কাউকে জালিম মনে করে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা; আর সক্রিয় চরমপন্থা হলো কাউকে জালিম বলে তার সঙ্গে আগ্রাসী আচরণ করা। দুটোই ইসলামে সমান অপরাধ। যে চরমপন্থাতেই আপনি লিপ্ত হোন, নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। দুই শ্রেণির চরমপন্থায় পার্থক্য শুধু বাহ্যিকভাবেই, বাস্তবে দুটোতে কোনো পার্থক্য নেই।'[৭২]

অথচ জালিমকে জালিম বলা এবং জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করা দুটোই কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ। এ ব্যাপারে অসংখ্য নস রয়েছে।

## ছয়. খতমে নবুওয়াত ও রিসালাতের অমর্যাদা

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান দাবি করেন, রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউই নবুওয়াতের দাবি করেনি। তিনি মনে করেন, 'পয়গম্বর ছাড়া কারও জন্য এমন দাবি করা অসম্ভব।' যাদের ব্যাপারে নবুওয়াত দাবির কথা বলা হয়, তা বাস্তবতার ভুল বোঝাবুঝির চেয়ে বেশি কিছু নয়। তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে ঘোষণা করেন, 'আমি শেষ নবি।' এরপর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ নবুওয়াত দাবি করতে পারেনি, যেন নবিজির সেই ঘোষণা ইতিহাসের একক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এ কথা মনে রাখতে হবে, রাসুল ﷺ-এর পরে ইতিহাসে কেউই নিজের মুখে দাবি করে বলতে পারেনি যে, 'আমি আল্লাহর নবি'। যেহেতু কেউই নবুওয়াতের দাবি করেনি, ফলে রাসুল ﷺ-এর কৃত দাবি একটি প্রমাণিত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। নবিজির এই ঘোষণার পর প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই এমন সাহস পায়নি, যে নিজের মুখে নবুওয়াতের দাবি করবে।'[৭৩]

রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব, আসওয়াদ আনসি এবং

---

[৭২] প্রাগুক্ত—সেপ্টেম্বর ২০০৯ : ৯।

[৭৩] প্রাগুক্ত—অক্টোবর ২০১১ : ১০-১১।

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি—যারা নবুওয়াত দাবি করেছে—ওয়াহিদুদ্দিন খান এদের সবার ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, 'বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর সমগ্র ইতিহাসে পুরো পৃথিবীতে এমন কেউ জন্মায়নি, যে নিজের মুখে নবুওয়াতের ঘোষণা দেবে। এক্ষেত্রে কয়েকজনের ব্যাপারে নবুওয়াতের দাবির কথা বলা হয়। এমন ধারণা সঠিক নয়।'

এক জায়গায় মুসায়লিমার নবুওয়াত দাবির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'যেমন বলা হয়, রাসুল ﷺ-এর সময় ইয়ামেনে মুসায়লিমা নবুওয়াতের দাবি করেছিল; কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে মনে হয়, সে পূর্ণ নবুওয়াত দাবি করেনি। শুধু বলেছিল, আমাকে মুহাম্মাদের সঙ্গে নবুওয়াতে অংশদার করা হয়েছে।'

আসওয়াদ আনসির নবুওয়াত দাবির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর যুগে ইয়ামেনের আরেক ব্যক্তির ব্যাপারে নবুওয়াত দাবির কথা বলা হয়, এ ব্যক্তি হলো আসওয়াদ আনসি। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোয় এ কথা প্রমাণিত নেই যে, সে তার মুখে নবুওয়াত দাবি করেছে। আমার অনুসন্ধান থেকে মনে হয়, তার ব্যাপারটি না ধর্মত্যাগ বা বিদ্রোহের বিষয় ছিল, আর না নবুওয়াত দাবির ব্যাপার ছিল।'[৭৪]

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির নবুওয়াত দাবি অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'বর্তমানে দুই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যারা নবুওয়াত দাবি করেছে। একজন হলো বাহাউল্লাহ খান, অন্যজন মির্জা গোলাম কাদিয়ানি। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী এ কথা সঠিক নয়। বাহাউল্লাহ খান শুধু এটা বলেছিল যে, 'আমি সত্য প্রকাশকারী'। কখনো বলেনি, 'আমি আল্লাহর নবি'। তদ্রুপ মির্জা গোলাম কাদিয়ানিও কখনো নিজের মুখে নবুওয়াত দাবি করেনি। শুধু এটা বলেছে, 'আমি জিল্লি নবি বা নবিজির ছায়ারূপ'। এ ধরনের কথাকে সর্বোচ্চ প্রকারের পাগলামি বলা যায়; কিন্তু নবুওয়াত দাবি বলা যায় না।'[৭৫]

বস্তুত রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পরে কারও পক্ষে নবুওয়াত দাবি করা সম্ভব নয়—ওয়াহিদুদ্দিন খানের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এর খণ্ডনে নবিজির এই বিষয়ক হাদিসগুলোই যথেষ্ট। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

> لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبًا مِن ثَلاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أنَّه رَسولُ اللهِ.
>
> ৩০ জনের মতো এমন মিথ্যুক প্রতারকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রাসুল মনে

[৭৪] প্রাগুক্ত : ১১-১২

[৭৫] প্রাগুক্ত : ১২-১৩।

করবে।[৭৬]

রাসুল ﷺ বলেছেন, এই প্রতারকেরা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রাসুল বলে দাবি করবে। অথচ ওয়াহিদুদ্দিন খান বলছেন, তা সম্ভব নয়। মুসায়লিমা কাজ্জাবের নবুওয়াত দাবি রাসুল ﷺ-এর কাছে তার পাঠানো চিঠির সূচনা থেকেই স্পষ্ট। দশম হিজরির শেষ দিকে সে রাসুল ﷺ-এর কাছে এক চিঠিতে লিখেছিল :

*আল্লাহর রাসুল মুসায়লিমা কর্তৃক আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের প্রতি,*

*আমাকে আপনার সঙ্গে নবুওয়াতে শরিক করা হয়েছে। অর্ধেক পৃথিবীতে আমার শাসন চলবে, বাকি অর্ধেকে কুরাইশের।*[৭৭]

শাসনক্ষমতায় অংশদারির ব্যাখ্যা ওয়াহিদুদ্দিন খান এভাবে করেন, 'সে রাসুল ﷺ-এর শাসনক্ষমতায় অংশ দাবি করেছে'। অথচ বাস্তবে সে রাসুলের নবুওয়াতের সমান্তরালে নিজের নবুওয়াত দাবি করেছিল।

আসওয়াদ আনসির নবুওয়াত দাবির বিষয়ে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আবু মুসলিম খাওলানিকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি স্বীকার কর যে, আমি আল্লাহর রাসুল? তিনি বলেন, 'না'। আনসি আবারও জিজ্ঞেস করে, তবে তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।

আনসির এ দাবি অস্বীকারের কারণে মহান এই তাবিয়িকে সে আগুনে নিক্ষেপ করে। আল্লাহর রহমতে তিনি রক্ষা পান। আলবানি এই বর্ণনাকে সহিহ বলেছেন।

গোলাম কাদিয়ানির নবুওয়াত দাবিও নিঃসন্দেহে সত্য ঘটনা। এ ব্যাপারে অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে, বিশদভাবে জানতে সেগুলো দেখা যেতে পারে। ওয়াহিদুদ্দিন খান বলেন, 'ঠিক এই ব্যাপারটি কাদিয়ানির বেলায়ও ঘটেছে। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কাদিয়ানির এই চিন্তা শুরু হয়। এরপর সে দাবি করে বসে, আমি আল্লাহর নবি। কিন্তু ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর ছেলে মির্জা বাশিরুদ্দিন মাহমুদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হলে সে বলে, তার পিতা কাদিয়ানি পয়গম্বর ছিল না; ছিল শুধু একজন রিফর্মার বা সংস্কারক। ছেলের এই বক্তব্যে ফিতনা খতম করার সুযোগ যদিও ছিল, কিন্তু শত্রুতাপূর্ণ মানসিকতার ফলে এখানকার মুসলিমরা না বিষয়টি বুঝতে পারল, আর না একে কাজে লাগাতে পারল। অধিকন্তু ঝগড়ার রাজনীতিতে কাদিয়ানি ফিতনা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল, যেটা সবাই দেখছে।'[৭৮]

---

[৭৬] *সহিহ বুখারি*, কিতাবুল মানাকিব, আলামাতুন নুবুওয়াহ অধ্যায় : ৩৬০৯।
[৭৭] *মুসতাখরাজু আবি আওয়ানাহ* : ৪/৩৬৫।
[৭৮] *আর-রিসালাহ*—অক্টোবর ১৯৯৬ : ৩৮।

## সাত. ফিলিস্তিন ও কাশমির সংকট

*সুনানু আবি দাউদের* এক হাদিসে মাহদির ব্যাপারে বলা হয়েছে :

> يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ.
>
> তাঁর সাত বছরের শাসনে পৃথিবীতে এমন ন্যায় ও ইনসাফ বিরাজ করবে, ইতিপূর্বে যেমন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছিল।[৭৯]

ওয়াহিদুদ্দিন খান জোর দিয়ে বলেন, 'পৃথিবী অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী এই হাদিসে করা হয়েছে, এই অত্যাচার এবং বিশৃঙ্খলার সূচনা মুসলিমদের হাতেই হবে। এই মুসলিমও তারা, যারা ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে, স্বাধীনতা-আন্দোলনে সমর্থন জোগাচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'ফিলিস্তিন সংকটের সক্রিয় সূচনা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর পুরো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতারা প্রতিক্রিয়ায় শামিল হন। মুসলিমদের মধ্যে ঘৃণা আর চরমপন্থার আন্দোলন শুরু হতে থাকল। এই বিদ্বেষ ও চরমপন্থার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ইসরাইল থাকলেও পরে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ব্রিটেন। কারণ ব্রিটেনই বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরপর সেই বিদ্বেষ ও চরমপন্থার মোড় ঘুরে গেল আমেরিকার দিকে। কারণ ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমেরিকা ইসরাইলকে বরাবরই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। তারপর মুসলিমদের নেতিবাচক এই জজবা ভারতের মতো রাষ্ট্রগুলোর ওপরে এসে পড়ে, যারা ইসরাইলের সঙ্গে বন্ধুরাষ্ট্রসুলভ সম্পর্ক রাখছিল। অধিকন্তু নেতিবাচক জজবায় তাড়িত এই মুসলিমরা একসময় খোদ ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যায়। কারণ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের পছন্দমতো কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। উল্লিখিত হাদিসে পৃথিবী অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলায় ভরে যাওয়ার এবং পরে ন্যায়-ইনসাফ ছড়িয়ে পড়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা মূলত একটি প্রকাশ-ভঙ্গি। উপরে বর্ণিত বাস্তবতাই এর উদ্দেশ্য। বর্তমানে এমনটাই দেখা যাচ্ছে যে, ফিলিস্তিনের ব্যাপারে পুরো পৃথিবীর মুসলিমরা বিদ্বেষ ও চরমপন্থায় পড়ে গেছে। এই চরমপন্থা ও বিদ্বেষকেই অত্যাচার এবং বিশৃঙ্খলা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর হাদিসের ভাষ্যমতে যা হওয়ার, তা হলো পৃথিবীতে ন্যায়-ইনসাফ ছড়িয়ে পড়বে। এটি হলো শান্তি ও নিরাপত্তা। এই হাদিসে ন্যায় ও ইনসাফ থেকে উদ্দেশ্য হলো, শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ, যা মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রমের পথ খুলে দেবে।'[৮০]

---

[৭৯] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৮৫।

[৮০] *আর-রিসালাহ*—অক্টোবর ২০০৯ : ৩০-৩১।

ওয়াহিদুদ্দিন খানের মতে, মুসলিমদের স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে সৃষ্ট এই অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা মাহদি এসে বন্ধ করবেন। তিনি বলেন, 'মাহদি এসে শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলবেন এবং দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের ছড়ানো এই অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটন করবেন।'

এবার, শান্তি ও নিরাপত্তার সেই প্রতিনিধি ও আহ্বায়ক কে—যিনি সময়ের মাহদি হবেন? এই লেখকের *ওয়াহিদুদ্দিন খান : চিন্তাধারা ও মতবাদ* বইয়ের শুরুর দিকটা মন দিয়ে পড়লে পাঠক এই ফলাফল খুব সহজেই বের করতে পারবেন যে, এই মাহদি খোদ ওয়াহিদুদ্দিন খানই!

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মুসলিমরা বিদ্বেষ আর কঠোরতার শিকার কি না তা জানা নেই, তবে উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হচ্ছে, ওয়াহিদুদ্দিন খান মুসলিমদের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ ঘৃণা এবং চরমপন্থার শিকার ছিলেন। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যমে তিনি অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের পথ উন্মোচন করতে চান। নিজেকে নিজেই মন্দ বলেন, যাতে অন্যরা তার কাছে আসে—কী বিস্ময়কর ব্যাপার!

কাশমিরের ব্যাপারে ওয়াহিদুদ্দিন খানের মত হলো, কাশমিরকে পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, 'অভিজ্ঞতা বলে, ভারত সবদিক বিবেচনায় পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। বাস্তবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সঙ্গেই মিলিত হওয়া। আর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অর্থ এমন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, উন্নতির সূচনাই যার এখনো হয়নি।'[৮১]

ওয়াহিদুদ্দিন খানের মন্তব্যটি ভাবার মতো। তিনি কীসের ভিত্তিতে কাশমিরকে পাকিস্তানের বদলে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন? এটি নিতান্তই একটি জড়বাদী চিন্তাধারা। ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা বেশি, তাই কাশমিরের উচিত ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া—এই চিন্তাধারা তো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি দেননি। প্রকৃত ব্যাপার তো এখানে যুক্ত হওয়া না হওয়ার নয়, বরং নির্বাচনের—কাশমির মুসলিম রাষ্ট্র নাকি অমুসলিম রাষ্ট্র, কোনটি নির্বাচন করবে? মুসলিম যতই গুনাহগার হোক, অমুসলিমদের তুলনায় তারা সর্বক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ, ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার সারকথা এটিই। অবশ্য যখন কারও নির্বাচনের স্বাধীনতা না থাকে, তখন পরিস্থিতি বিবেচনায় বিধানও ভিন্ন হয়।

---

[৮১] প্রাগুক্ত—সেপ্টেম্বর ২০০৭ :১৯।

ফিলিস্তিন ও কাশমিরে ভারত ও ইসরাইলের নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিমরা প্রতিবাদ করলে এর প্রতিরোধে নিরাপত্তাবাহিনী এমন অনেক ব্যক্তিকে শহিদ করে, যারা প্রতিবাদে অংশই নেয়নি—ওয়াহিদুদ্দিন খানের মতে এমনটা স্বাভাবিক বিষয়। এসব নিরপরাধ মুসলিমের নিহত অথবা হতাহত হওয়ার দায় প্রতিবাদকারীদের কাঁধেই। তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারটি সেসব ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য, যেখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ কাশমির এবং ফিলিস্তিনের দিকে তাকানো যাক। এসব স্থানেও এমনটা ঘটে, প্রথমে মুসলিমরা পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর দিকে ইট-পাথর ছোড়ে, এরপর পুলিশ বা সেনাবাহিনী তাদের দিকে গুলি ছোড়ে বা বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করে। এ ধরনের ঘটনায় কার্যত যা ঘটে তা হলো, যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়নি, তারাও প্রতিরোধের সময় বাহিনীর গুলি বা বোম্বিংয়ের লক্ষ্যবস্তু হয়। অংশগ্রহণকারীও, অন্যরাও।'

এরপর এই জুলুমকে স্বাভাবিক আখ্যা দিয়ে তিনি লেখেন, 'এসব ঘটনা নিয়ে এই প্রতিবাদের ফলাফল দাঁড়ায় কী—অপরাধী এবং নিরপরাধ উভয় শ্রেণিই রাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এটা মানবতাবিরোধী কাজ। এ ধরনের প্রতিবাদ সম্পূর্ণ অন্যায়। কুরআন এমন প্রতিবাদ সমর্থন করে না। আর এসব ক্ষেত্রে অপরাধীর সঙ্গে নিরপরাধ ব্যক্তিরাও নিহত হয়, এটা স্বাভাবিক।'[৮২]

অথচ প্রতিবাদ মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকার শুধু ধর্মই নয়, বরং প্রত্যেক সেকুলার রাষ্ট্রও তার নাগরিকদেরকে দিয়ে থাকে।

## আট. কিয়ামতের আলামত : খানের অপব্যাখ্যা

কুরআন-হাদিসে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বেশকিছু আলামত তথা পূর্বনিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। এসবের মধ্যে মাহদির আবির্ভাব, ইসা ইবনু মারইয়াম আ.-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আগমন, ভূগর্ভ থেকে অদ্ভুত প্রাণীর উদয়, পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ওয়াহিদুদ্দিন খান এসব বর্ণনা স্বীকার করলেও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাবিল বা দূরবর্তী রূপক ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন। ফলে দেখা যায়, কোনো-না-কোনোভাবে এগুলো তাঁরই স্বভাবের সঙ্গে মিলে যায়। এখানে যেহেতু প্রত্যেকটি আলামত প্রসঙ্গে তাঁর মতামতের ওপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই, তাই সংক্ষেপে কয়েকটি আলোচিত হলো।

ইসা ইবনু মারইয়াম ও মাহদি উভয়ের ব্যাপারেই ওয়াহিদুদ্দিন খান মনে করেন, ওই দুটি

---

[৮২] *সুবহে কাশমির* : ৩২।

নাম বাস্তবে একজনেরই। তাঁর ভাষায়, 'সব ধর্মেই এ কথা বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার আগে একজন ত্রাণকর্তার আগমন ঘটবে। তিনি বিশেষ কিছু কাজ সম্পাদন করবেন। এ কথা ইসলামে বলা আছে। হাদিসের গ্রন্থসমূহে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, খেয়াল করে দেখলে তিনটি শব্দই চোখে পড়ে—মুমিন, মাহদি, মাসিহ। শব্দ তিনটি মূলত একই ব্যক্তি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।'[৮৩]

ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি আরও লেখেন, '*সুনানু ইবনি মাজাহ*র কিতাবুল ফিতান অধ্যায়ে বিপদে ধৈর্যধারণ শীর্ষক পরিচ্ছেদের একটি হাদিস পড়ে মনে হয়, মাহদি এবং মাসিহ এ দুটি একই ব্যক্তির দুই নাম, যাঁর আবির্ভাব হবে শেষ যুগে। অন্য হাদিসে তাঁকেই মুমিন বা মাহদি অথবা অন্য বর্ণনায় মাসিহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেহেতু তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিরই একজন সদস্য হবেন, সেই বিবেচনায় 'মুমিন' বলা হয়েছে। আবার তিনিই বিভ্রান্তির অন্ধকারে হিদায়াতের আলো জ্বালাবেন, সেই হিসেবে মাহদিও বলা হয়েছে। আবার উম্মাতে মুহাম্মাদির মধ্যে তিনিই সেই দায়িত্ব সম্পাদন করবেন, ইয়াহুদিদের মধ্যে ইসা মাসিহ যেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেন এ তিনটি শব্দই একই ব্যক্তির ভিন্ন তিনটি দিক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, পৃথক তিন ব্যক্তির জন্য নয়।'[৮৪]

ওয়াহিদুদ্দিন আরও লেখেন, 'কিয়ামতের আগে আত্মপ্রকাশকারী ব্যক্তির ব্যাপারে হাদিসের বর্ণনাগুলোয় তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—মুমিন, মাহদি এবং মাসিহ। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, এই তিনজনের দায়িত্ব একই বলা হয়েছে। আর তা হলো দাজ্জালকে হত্যা করা। এতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, তিন শব্দের দ্বারা একজনই উদ্দেশ্য। নইলে তো হাদিসে তিন জনের আলাদা আলাদা দায়িত্বের উল্লেখ থাকত।'[৮৫]

হাদিসে 'মুমিন ব্যক্তি' বা মাহদির দায়িত্ব বলা হয়েছে একটাই, দাজ্জালকে হত্যা—ওয়াহিদুদ্দিন খানের এই বক্তব্য মোটেই ঠিক নয়। হাদিসে দাজ্জাল হত্যার বিষয়টি কেবলই ইসা আ.-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে। অন্যদিকে মুমিন ব্যক্তি বা মাহদি উম্মতের একজন গুরুত্বপূর্ণ বা রাজনৈতিক ব্যক্তি হবেন, যেমনটা আমরা সামনে স্পষ্ট করব।

তিনি আরও মনে করেন, মাসিহ বলতে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এমন কোনো নবি বোঝানো হয় নি, বরং তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিরই একজন হবেন। তিনি বলেন, 'সাধারণত মনে করা হয়, মাসিহ আ. আসমানে জীবিত আছেন এবং শেষ যুগে মানুষের মতো আসমান থেকে নেমে এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এই চিন্তাধারা যদিও মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি জীবিত আছেন এমনটা

---

[৮৩] *আর-রিসালাহ*—জুলাই ২০১০ : ১৩।

[৮৪] প্রাগুক্ত—মে ২০১০ : ৪১।

[৮৫] প্রাগুক্ত—জুলাই ২০১০ : ১৪।

কুরআন থেকে যেমন প্রমাণিত হয় না, তদ্রুপ হাদিসেও পাওয়া যায় না। হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রায় দুই ডজন গ্রহণযোগ্য বর্ণনা রয়েছে, এসবের কোনো একটি বর্ণনায়ও স্পষ্ট বলা নেই যে, তিনি সাধারণ শরীর নিয়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন। এ বিষয়ক বর্ণনাগুলোয় শুধু 'বিসাত' এবং 'নুজুল' তথা অবতরণ এবং প্রেরণ এ দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু স্রেফ এই শব্দ থেকেই তিনি আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এটা প্রমাণিত হয় না। আরবিতে 'নুজুল' শব্দটি সাধারণ আগমনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, কেবল আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নয়। এই হিসেবেই অতিথিকে আরবিতে 'নাজিল' বলা হয়।'[৮৬]

আরেক জায়গায় মাসিহ সাধারণ মানুষ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'মাসিহ উম্মতে মুসলিমার একজন সংস্কারক—শারীরিক অবয়বে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এমন রহস্যময় কেউ নন। মুসলিম উম্মাহর এক ব্যক্তির সংস্কারকার্য ইসা ইবনু মারইয়াম আ.-এর কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ জন্য তাকে উম্মাহর 'মাসিহ' বলা হয়েছে।'[৮৭]

ওয়াহিদুদ্দিন খান এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে মাসিহ এবং মাহদির কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সেসব বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো, দীর্ঘ আলোচনা এড়াতে আমরা তাঁর বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত না করে শুধু সারকথাতেই শেষ করছি :

১. মাহদি অথবা মাসিহ সাধারণ লোকদের মতোই হবেন। তিনি গ্লোবাল কমিউনিকেশনের যুগে জন্ম নেবেন।

২. মাহদি বা মাসিহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ভ্রান্ত মতবাদসমূহের মূলোৎপাটন করবেন। মানুষের চিন্তার দ্বিধা-সংশয় নিরসন করবেন। ইসলামের এমন রূপ উপস্থিত করবেন, যা সামসময়িক ভ্রান্ত মতবাদসমূহকে যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করবে।[৮৮]

৩. মাহদি, মাসিহ অথবা মুমিন—প্রকৃতপক্ষে যাঁরা একই ব্যক্তি—দাজ্জালকে হত্যা করবেন। দাজ্জালকে হত্যার মানে হলো তাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে হত্যা করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যুগে মানুষ বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে স্রষ্টাকে অস্বীকার করবে, ফলে মাহদি অথবা মাসিহ এই নাস্তিক্যবাদী ফিতনাকে বিজ্ঞানের আলোকেই

---

৮৬ *আর-রিসালাহ*—মে ২০১০ : ৫০।

৮৭ প্রাগুক্ত : মে ২০১০ : ৫০।

৮৮ প্রাগুক্ত—জানুয়ারি ২০১১ : ৪২।

খণ্ডন করবেন।[৮৯]

৪. মাহদি অথবা মাসিহ একজন জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হবেন। তাঁর মধ্যে পূর্ণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতা থাকবে।[৯০]

৫. মাহদি অথবা মাসিহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর সংস্কার হবে ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি সাধারণ সংস্কারকদের থেকে আলাদা ধরনের সংস্কার সাধন করবেন।[৯১]

৬. মাহদি অথবা মাসিহ রাজনৈতিক ব্যক্তি হবেন না, তিনি হবেন আরিফ বিল্লাহ।[৯২]

৭. মাহদি অথবা মাসিহকে কিছু লোক স্বপ্নে দেখবে, যে স্বপ্ন হবে সত্য স্বপ্নের অন্তর্গত। এটিও মাসিহ অথবা মাহদির একটি নিদর্শন।[৯৩]

৮. মাহদি, মাসিহ বা শেষ যুগের সংস্কারকের এ-ও একটি নিদর্শন যে, তিনি কুরআন এবং দীনের ভুল ব্যাখ্যাসমূহ খণ্ডন করে সত্যিকার দীন প্রচার করবেন।

৯. মাহদি অথবা মাসিহের আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি আধুনিক ভাষায় ইসলামকে উপস্থাপন করবেন।

১০. মাহদি অথবা মাসিহ নিজের মাহদি বা মাসিহ হওয়ার ঘোষণা করবেন না—এটিও তাঁর অন্যতম নিদর্শন।[৯৪]

১১. তাঁর আরেকটি নিদর্শন হলো, তখনকার মুসলিমরা তাঁকে অস্বীকার করবে।[৯৫]

১২. মাহদি অথবা মাসিহের আরেকটি নিদর্শন হলো, তাঁর সঙ্গে হাদিসে বর্ণিত ইখওয়ানে রাসুলের দল থাকবে। অতীত ও বর্তমানের সকল প্রেক্ষাপট বিচার করে অনেকটা মনে হয়, এই দলকেই রাসুল ﷺ 'ইখওয়ানে রাসুল' বলে অভিহিত করেছেন।'[৯৬]

দাজ্জাল বিষয়ে তিনি বলেন, 'দাজ্জাল শব্দের অর্থ অধিক প্রতারণাকারী। এই প্রতারণাকর্ম সে তরবারির মাধ্যমে করবে না, করবে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে। যেহেতু দাজ্জাল মানুষকে জ্ঞান এবং যুক্তিতে পরাজিত করবে, তাই তারা চিন্তাগত বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে।

---

[৮৯] প্রাগুক্ত : ১৮-১৯।
[৯০] প্রাগুক্ত : ৩৭।
[৯১] প্রাগুক্ত : ১৫।
[৯২] প্রাগুক্ত—মে ২০১০ : ৩৯।
[৯৩] প্রাগুক্ত—জুন ২০১০ : ১১।
[৯৪] প্রাগুক্ত : ৫০-৫১।
[৯৫] প্রাগুক্ত : ৪৩।
[৯৬] প্রাগুক্ত—সেপ্টেম্বর ২০০৬ : ৪০।

দাজ্জালের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, তাকে *সহিহ মুসলিমে* 'হাজিজ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। *লিসানুল আরবে* 'হাজিজ' অর্থ বলা হয়েছে, যুক্তি ও জ্ঞানের বলে বিজয় লাভ করা। হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের কপালে 'কুফর' শব্দ লেখা থাকবে। এ থেকে অনুমান করা যায়, সে সময় হবে আল্লাহর সঙ্গে কুফরির যুগ। ভিন্নকথায় নাস্তিক্যবাদের যুগ।'[৯৭]

তিনি আরও বলেন, 'দাজ্জাল দুই ধরনের হবে। প্রথমত বহির্গত, দ্বিতীয়ত অন্তর্গত।' বহির্গত দাজ্জাল বলতে তিনি মনে করেন পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা ও এর তল্পিবাহকেরা। আর অন্তর্গত দাজ্জাল মনে করেন এমন মুসলিম চিন্তাবিদদের, যাঁরা ইসলামের বিজয় বা শরিয়ত বাস্তবায়নের ধারণা পেশ করে থাকেন। তিনি বলেন, 'অন্তর্গত দাজ্জাল বহির্গত দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর।' এক জায়গায় আরও বলেন, 'রাসুল ﷺ বলেছেন—“আমি তোমাদের ব্যাপারে দাজ্জালের চেয়েও বড় ফিতনার আশঙ্কা করছি”—এর উদ্দেশ্য সম্ভবত এটাই যে, বহির্গত দাজ্জালের চেয়ে অন্তর্গত দাজ্জালের ফিতনা বেশি ভয়ানক হবে। কারণ বহির্গত দাজ্জালকে চেনা সহজ, কিন্তু অন্তর্গত দাজ্জালকে লোকেরা নিজেদেরই কেউ মনে করবে, ফলে সে বেশিসংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাবে।'[৯৮]

ওয়াহিদুদ্দিন খানের মতে, মাহদি অথবা মাসিহের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হবে দাজ্জালকে হত্যা করা। এই হত্যা করার অর্থ হলো দাজ্জালি ফিতনার যৌক্তিক খণ্ডন। তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে মাসিহের আগমন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ভিন্ন কথায়, শেষ যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হলে উম্মতে মুহাম্মাদির কেউ একজন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আর সে মাসিহের দায়িত্ব পালন করে দাজ্জালি ফিতনার মোকাবিলা করবে। এতে দাজ্জাল পরাস্ত হয়ে যাবে। হাদিসে দাজ্জালকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে বটে, তবে এর অর্থ তাকে শারীরিকভাবে হত্যা নয়; বরং দাজ্জালের ফিতনার যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক খণ্ডন।'[৯৯]

ওয়াহিদুদ্দিন খান জুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের পেছনে অবরুদ্ধ বন্য গোত্রগুলোকে 'ইয়াজুজ-মাজুজ'-এর পরিবর্তে ইউরোপীয় এবং পশ্চিমা জাতি বলে মনে করেন। তিনি বলেন, 'ইয়াজুজ এবং মাজুজ বলতে কী উদ্দেশ্য, এ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমিরির মত আমার কাছে অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। এর ব্যাখ্যায় তিনি রুশ, ব্রিটিশ এবং জার্মান জাতিগোষ্ঠীগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন।'

---

[৯৭] প্রাগুক্ত—মে ২০১০ : ১৮।

[৯৮] প্রাগুক্ত : ২৯।

[৯৯] প্রাগুক্ত : ৪৬।

তিনি আরও বলেন, 'কুরআনে ইয়াজুজ-মাজুজের আলোচনা দুই জায়গায় এসেছে। প্রথমত সুরা কাহফে জুলকারনাইনের আলোচনায়। দ্বিতীয়ত, সুরা আম্বিয়ায় জুলকারনাইনের উল্লেখ ব্যতিরেকে। এই আয়াতগুলো অধ্যয়ন করে মনে হয়, দুটি আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের ভিন্ন দুই সময়ের উল্লেখ রয়েছে, যেন একটির পরে অন্যটি ঘটবে। তাই মনে হয় জুলকারনাইন যে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাথমিক সময়ে। এই প্রাচীর তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ সময় এটা অটুট ছিল। এরপর ইয়াজুজ-মাজুজের প্রথম প্রজন্ম শেষ হয়ে যায়, আরেক প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে। এরা আগের প্রজন্মের মতো বিশৃঙ্খল ছিল না, বরং স্বাভাবিক। এ সময় জুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে। তখন ইয়াজুজ-মাজুজের প্রথম প্রজন্ম প্রাচীর ডিঙাতে সক্ষম হয়। তারা বাইরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই সময়েই তাদের মধ্যে সভ্যতার সূচনা হয়। এই প্রজন্মটি কালক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই পরবর্তী সময় দুই ভাগে বিভক্ত—দ্বিতীয় প্রজন্মের পূর্বকাল এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের সূচনাকাল।'[১০০]

কিয়ামতের আলামতের আলোচনায় একটা অদ্ভুত প্রাণীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যাকে 'দাব্বাতুল আর্‌জ' বলা হয়েছে। এটা মাটির নিচে থেকে বের হবে এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। ওয়াহিদুদ্দিন খান এই প্রাণীর ব্যাপারেও প্রায় একই ধরনের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এর অর্থও উম্মতে মুহাম্মাদির একজন সংস্কারক এবং দায়ি।'

তিনি বলেন, 'এই প্রাণীর বিষয়ে দুটি বর্ণনা এসেছে। বর্ণনাগুলো দেখে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এটি একধরনের অদ্ভুত সৃষ্টি। এসব বর্ণনা ভালোভাবে উপলব্ধির জন্য এই ঘটনাকে রূপক মনে করা জরুরি। যেহেতু একদল তাফসিরবিদ এই বর্ণনাগুলোকে রূপক ধরে নিয়ে লিখেছেন যে, এই প্রাণী বলে মানুষই উদ্দেশ্য; অদ্ভুত কোনো প্রাণী নয়। ফলে তা সাধারণ মানুষের মতো এক মানুষ হবে। যে আল্লাহর বিশেষ তাওফিকের মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ করবে। তাফসিরকার ইমাম কুরতুবি বলেছেন, এই প্রাণীর সবাই মানুষ হওয়াই যুক্তিযুক্ত, যে কাফির এবং বিদআতিদের সঙ্গে বিতর্ক করবে। ফলে যে ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হবে; আর যে জীবিত থাকার সে জীবিত থাকবে।'

এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে গিয়ে খান আরেক জায়গায় লেখেন, 'এর অর্থ সেই দায়ি এবং উম্মাহর সংস্কারক, যিনি উম্মাহর মধ্যে 'প্রমাণ' হিসেবে প্রেরিত হবেন।' তাঁর ভাষায়, 'হয়তো এই প্রাণী বা শেষ যুগে আবির্ভূত দায়ি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সর্বশেষ প্রমাণ হবে। এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর ফেরেশতা ইসরাফিল শিঙায় ফুঁক

[১০০] প্রাগুক্ত : ৩-৫

দেবেন। তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।'[১০১]

যদি প্রশ্ন করা হয়, ওয়াহিদুদ্দিন খানের বক্তব্য অনুযায়ী এই 'দায়ি' কে, যাকে 'দাব্বাতুল আর্‌জ' বলে অভিহিত করা হয়েছে? তবে উত্তরটি তাঁর কথাতেই শুনতে হবে। তিনি বলেন, 'এটি এক বাস্তবতা যে, সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়্যালিটি বা সিপিএস রাসুলের সাহাবিদের যুগের পরে গঠিত একমাত্র দল, খালিস দাওয়াতের কাজ আনজাম দেওয়ার চিন্তাধারা ও লক্ষ্য নিয়েই যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিপিএস এমন একটি আন্দোলন হিসেবে উৎপত্তি লাভ করেছে, যে আন্দোলন প্রথমবারের মতো কুরআন-হাদিসের দাওয়াতি তাফসির ও ব্যাখ্যা প্রণয়নের পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর দাওয়াতি সিরাত রচনা করেছে। সাহাবিদের দাওয়াতের নীতি স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। সেই সঙ্গে এ-ও বলেছে, ইসলামের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো দাওয়াতি শক্তি। চিন্তাগত ভারসাম্যের বজায় রেখে এ দলটি ইসলামি সাহিত্য বিনির্মাণ করেছে। আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইলমুল কালামের[১০২] সাহায্য নিয়েছে।'[১০৩]

ফুরাত নদী থেকে সোনা বের হওয়াও কিয়ামতের অন্যতম আলামত। সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়াহিদুদ্দিন খান লেখেন, 'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত *সহিহ মুসলিমের* একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذهب.

এমন এক সময় আসবে, যখন ফুরাত নদীতে সোনার খনি আবিষ্কৃত হবে।[১০৪]

এই হাদিসে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে, তাতে স্পষ্টতই পেট্রোলিয়াম উদ্দেশ্য। বর্তমানে যাকে লিকুইড গোল্ড বা তরল সোনা বলা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে এই সোনা বিশাল পরিমাণে দেখা গেছে।'[১০৫]

খান সাহেব এখানেও তাঁর স্বভাব অনুযায়ী পুরো বর্ণনা উল্লেখ না করে স্রেফ এতটুকুই উদ্ধৃত করেছেন যাতে পাঠকের মনে কোনো প্রশ্নের উদয় না হয়। পূর্ণ হাদিসটি এমন :

يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

---

[১০১] প্রাগুক্ত : ৫৬-৫৭

[১০২] আরেক জায়গায় তিনি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানই ইলমুল কালামের বর্তমান রূপ।

[১০৩] *আর-রিসালাহ*—সেপ্টেম্বর ২০০৬ : ৩০-৩১

[১০৪] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৯৪।

[১০৫] প্রাগুক্ত—মে ২০১০ : ৫৮।

শীঘ্রই ফুরাতে সোনার খনি আবিষ্কৃত হবে। যে সেখানে থাকবে, সে যেন তা থেকে কিছু না নেয়।[১০৬]

রাসুল ﷺ এই সোনার খনি থেকে কিছু নিতে বারণ করেছেন। এবার যদি একে তেল অথবা পেট্রোল বলে ব্যাখ্যা করা হয়, যেগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস; তাহলে রাসুল ﷺ এগুলো গ্রহণ করতে বারণ করলেন কেন? অথবা যদি সোনা অর্থ তেলই ধরা হয়, তাহলে আরবের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ওয়াহিদুদ্দিন খানের এই বলে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী এই সোনায় যেন তারা হাত না দেয়। বরং তা মার্কিন-ব্রিটিশদের জন্য রেখে দিলে আরও ভালো!

এই হাদিসের বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাসুল ﷺ এই খনি আবিষ্কার হওয়াকে এক ফিতনা বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি এখান থেকে কিছু নিতে বারণ করেছেন। আর এটি ফিতনা হওয়া বুঝাতে সোনা উদ্দেশ্য নেওয়াই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত।

কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন হলো দুখান বা ধোঁয়া। এটি হবে মুমিনদের জন্য পরীক্ষা এবং কাফিরদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। এই আলামতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খান লেখেন, 'এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল ﷺ কিয়ামতের আগে ১০টি নিদর্শনের কথা বলেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো দুখান প্রকাশ হওয়া। দুখানের শাব্দিক অর্থ ধোঁয়া। বর্ণনাটিতে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলা হয়েছে, এমন এক সময় আসবে, যখন পৃথিবীর সমগ্র শূন্যস্থান ধোঁয়ায় পূর্ণ হবে। বর্তমানে এটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ইদানীং একেই বায়ুদূষণ বলা হয়। আধুনিক শিল্পব্যবস্থার ফলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমন জিনিসের উৎপত্তি হয়েছে, যাকে কার্বন নিঃসরণ বলা হয়। এর ফলে আবহাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভরে যায়। এটি মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বায়ুদূষণের এই ব্যাপারটি রাসুল ﷺ-এর সময় অকল্পনীয় ছিল।'[১০৭]

ওয়াহিদুদ্দিন খান বললেন, 'বায়ুদূষণের এই ঘটনা রাসুল ﷺ-এর যুগে অকল্পনীয় ছিল।' অথচ কয়েকজন ফকিহ সাহাবি রাসুল ﷺ-এর যুগের বায়ুদূষণের ঘটনা বিবৃত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন, মক্কার কুরাইশরা রাসুল ﷺ থেকে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ না করলে তিনি অত্যন্ত নাখোশ হন। ফলে এই বলে বদদুআ করেন, নবি ইউসুফ আ.-এর জাতির মতো দুর্ভিক্ষ যেন তাদেরকেও গ্রাস করে। এই বদদুআর ফলে কুরাইশরা গোশত এবং হাড় খেতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মাটির শুষ্কতা

---

[১০৬] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ফিতান, বাবু খুরুজিন নার : ৭১১৯।
[১০৭] প্রাগুক্ত : ৫৯।

আর ক্ষুধায় তখন আসমান-জমিনে শুধু ধোঁয়াই দেখা যাচ্ছিল।[১০৮]

সুতরাং দুখানের একটি ঘটনা মক্কার কুরাইশদের দুর্ভিক্ষের আজাব হিসেবে দেখা গিয়েছিল। অবশ্য এর পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য কিয়ামত। যেমন রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

> إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.
>
> কিয়ামত সে পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না ১০টি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। এগুলো হলো—ধোঁয়া, দাজ্জাল, অদ্ভুত প্রাণী, পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়, ইসা ইবনু মারইয়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ, তিন বার চন্দ্রগ্রহণ (প্রথমবার পূর্বে, দ্বিতীয়বার পশ্চিমে এবং তৃতীয়বার আরব উপদ্বীপে), আর শেষ নিদর্শন হলো আগুন যা একদিক থেকে বেরিয়ে মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে সবাইকে হাশরের মাঠে নিয়ে একত্রিত করবে।[১০৯]

## নয়. ইনতিকাল

২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল ওয়াহিদুদ্দিন খানের শরীরে শতাব্দীর আলোচিত জীবাণু করোনা ধরা পড়ে। তাঁকে দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর ১০ দিন পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। নয়া দিল্লির বস্তি নিজামুদ্দিনের পাঞ্জপিরান কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তিনি দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে যান। প্রথম ছেলে জাফরুল ইসলাম খান দিল্লি মাইনরিটিজ কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। দ্বিতীয় ছেলে সানিয়াসনাইন খান। বড় মেয়ে ফরিদা খানম পিতার অধিকাংশ বই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তিনি সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়্যালিটির চেয়ারপারসন। ছোট মেয়ের নাম মুসলিমা সিদ্দিকি।

ওয়াহিদুদ্দিন খানের ইনতিকালের পর জাবেদ আহমাদ গামিদি প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, 'একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান হলো—যিনি নিজের জীবন, কর্ম এবং দরদ ও নিষ্ঠার বিবেচনায় আমাদের সবার জন্য আদর্শস্বরূপ ছিলেন। মাওলানা

---

[১০৮] *সহিহ বুখারি* : ৪৭৭৪।

[১০৯] *সহিহ মুসলিম* : ২৯০১।

ওয়াহিদুদ্দিন খান ছিলেন একজন অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর আহ্বান ছিল স্বতন্ত্র ধাঁচের। সম্ভবত এমন আহ্বান ইতিপূর্বে কেউ করেনি। পরেও কেউ তা করবে, সেকথা বলা যায় না। আমরা দুজন তো একই উসতাজের ছাত্র। পার্থক্য হলো, তিনি উসতাজ আমিন আহসান ইসলাহির কাছে তালিম নিয়েছেন উসতাজের জীবনের শুরুর দিকটায়; আর আমার এই সৌভাগ্য লাভ হয়েছে তখন, যখন ইসলাহি জীবনের শেষভাগে উপনীত।'





# জাবেদ আহমাদ গামিদি

জাবেদ আহমাদ গামিদি একজন পাকিস্তানি মুসলিম চিন্তাবিদ ও গবেষক। কারও কারও মতে তিনি একজন সংস্কারকও। ২০০৬ সালে তিনি কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডিয়োলোজির সদস্যপদ লাভ করেন। সিভিল সার্ভিসেস অ্যাকাডেমিতে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল মাওরিদ ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান গামিদি উর্দু সাময়িকী *ইশরাক* এবং ইংরেজি *রেনেসাঁ*-এর প্রধান সম্পাদক। এ ছাড়াও তিনি মুসআব স্কুল সিস্টেমের প্রতিষ্ঠাতা।

## এক. জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

জাবেদ আহমাদ গামিদির পিতৃভূমি শিয়ালকোটের দাউদ অঞ্চলে হলেও তাঁর জন্ম পাকপাতানের[১১০] জিওয়ানশাহে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম নিয়েও বেশ কথা আছে। অনেকে যদিও বলেন গামিদির মূল নাম শফিক আহমাদ। এই নাম ভালো না লাগায় পরিবর্তন করে তিনি জাবেদ আহমাদ করেছেন। এটি আংশিক সত্য হলে কথা আরও আছে। মূলত জন্মের পর পরিবারের বিভিন্নজন বিভিন্ন নাম রাখেন। একদিকে মা তাঁকে জাবেদ নামে ডাকলেও পিতা ডাকেন কাকুশাহ বলে। এ ছাড়া শফিক এবং কাকা মুহাম্মাদ নামেও কেউ কেউ ডাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে যখন নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি সবকটা নামই বলেন। পরে তাঁর এক খালাতো ভাই রফিকের নামানুসারে তার নাম শফিক রাখা হয়। একসময় স্কুলেও তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করে 'শফিক আহমাদ জাবেদ' করেন; আর সাধারণভাবে জাবেদ আহমাদ ব্যবহার করতে থাকেন। পরিবর্তনের ধারা এখনো শেষ হয়নি; গামিদি যুক্ত হওয়া তখনো বাকি ছিল। বলা হয়, বনু গামিদের পূর্বপুরুষদের একটি ঘটনা তার মনে দাগ কাটে। এতে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি শব্দটি নিজের নামের সঙ্গে যোগ করেন। এরপর থেকে তিনি নিজের নাম জাবেদ আহমাদ গামিদি লিখে আসছেন।[১১১]

---

১১০ পাকপাতান—পাকিস্তানের পাঞ্জাবের একটি শহর।

১১১ *হায়াতে গামিদি*—শাহ ইমরান হাসান : ২৩।

অবশ্য অনেকে বলেন, গামিদির পিতামহ নুর ইলাহিকে গ্রামের লোকেরা সংস্কারক বলতেন। সেদিকে সম্পৃক্ত করেই তিনি নামের সঙ্গে গামিদি যুক্ত করেছেন। যাই হোক, তিনি যে আরবের প্রসিদ্ধ গামিদি বংশের নন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতা তুফায়েল জুনায়দি চাইতেন ছেলে ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করুক, আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শিখুক। কিন্তু মা চাইতেন ছেলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। পরে সিদ্ধান্ত হয় সকালে তিনি স্কুলে যাবেন। এরপর আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদের ইমামের কাছে কুরআন এবং আরবি-ফারসি শিখবেন। এভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স করেন।

অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়লেও তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা সমান তালেই এগোতে থাকে। ফলে তৃতীয় শ্রেণিতে থাকতেই আরবি ব্যাকরণের *শারহে জামি* এবং ফারসিতে আত্তারের *পান্দনামা* পর্যন্ত পড়ে ফেলেন—নবম শ্রেণিতে উঠতে উঠতে দারসে নিজামির সকল কিতাব তিনি পড়ে শেষ করে ফেলেন। যাঁদের থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি অন্যতম। লাহোরের জামিয়া আশরাফিয়ায় তাঁর কাছে তিনি *সহিহ বুখারি* পড়েছেন। এ ছাড়া তিনি মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহি, মাওলানা সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি, মাওলানা আবুল খায়ের মওদুদি, মাওলানা হানিফ নদবি, মাওলানা আতাউল্লাহ হানিফ, ড. সুফি জিয়াউল হক, ড. সাইয়িদ আবদুল্লাহ. ড. বুরহান আহমাদ ফারুকি, প্রফেসর ইলমুদ্দিন সালিক, প্রফেসর ইউসুফ সালিম চিশতি, ফাইজ আহমাদ ফাইজ, আগা শরেশ কাশমিরি, হাফিজ জালন্ধরি, আবিদ আলি আবিদ, ইহসান দানিশ, আহমাদ নাদিম কাসিমি, প্রফেসর বখতিয়ার হাসান সিদ্দিকি, ড. মুহাম্মাদ আজমাল, প্রফেসর মুনাওয়ার মির্জা, সাবির লুধি, গোলামুস সাকালাইন নাকাবি, মালিক বাশিরুর রাহমান, প্রফেসর সিরাজ, প্রফেসর সায়িদ শায়খ প্রমুখের থেকে ইলম অর্জন করেছেন।[১১২]

জাবেদ আহমাদ গামিদি প্রায় ৩০ বছর আগে নিজের গবেষণা ও দাওয়াতি কাজের সূচনাকালে লেখেন, 'তাফাক্কুহ ফিদ-দীন তথা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রকৃত বোধ উম্মাহর কাছে অবশিষ্ট নেই। দলাদলি এবং রাজনৈতিক শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব ছেড়ে কুরআন-হাদিসের ভিত্তিতে দীনের দাওয়াত মানুষ বিস্মৃত হতে চলেছে। কুরআন মাজিদ যদিও দীনের প্রকৃত ভিত্তি ছিল, তা শুধুই মুখস্থ আর পাঠের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। উম্মাহর চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির লক্ষ্যে এখন কুরআন থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হয় না। কুরআনের প্রেষণা আমরা সর্বক্ষেত্রেই হারিয়েছি।

[১১২] *গামিদি উলামা কে নজর মেঁ*: ৩৭-৩৮।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেসব বিষয়ই মুখ্য হয়ে আছে, যা শেষ পর্যন্ত কুরআন মাজিদ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম মাত্র। কুরআন-হাদিসসহ সবকিছুই ক্রমে অসার হয়ে পড়ছে। নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শভিত্তিক জ্ঞানার্জন আর অন্যান্য মতাদর্শের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই এখন প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

## দুই. চিন্তাধারা ও মতবাদ

জাবেদ আহমাদ গামিদির বহু চিন্তা ও ধারণা কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, এখানে তাঁর সব চিন্তাধারা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে আমরা সব দিক আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু মৌলিক কিছু চিন্তাধারা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

## তিন. কিরাআতে মুতাওয়াতিরা অনারবদের ফিতনা

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী। ইসলামি শরিয়তে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সবকিছুর ওপরে। ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই ফকিহ এবং আলিমরা বিভিন্ন বিধান নিরূপণ ও সাব্যস্ত করতে কুরআনকেই প্রধান উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মহাগ্রন্থ কুরআনের অসংখ্য বিশেষত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো—রাসুল ﷺ-এর ওপর পবিত্র কুরআন একাধিক কিরাআতে অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিরাআতগুলো ধারাবাহিকভাবে উম্মতের মধ্যে চলে আসছে। এর মধ্যে কিছু কিরাআত এমন আছে, যেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ রিওয়ায়াতে হাফস, রিওয়ায়াতে কালুন, রিওয়ায়াতে ওয়ারাশ এবং রিওয়ায়াতে দাওরি ইত্যাদি। অপরদিকে কিছু কিরাআত সাধারণভাবে পঠিত না হলেও উম্মাহর বিশেষ শ্রেণি তার পঠন-পাঠনের দায়িত্ব আনজাম দিয়ে চলেছেন। উম্মাহর ফকিহ, আলিম, মুফাসসির এবং মুজতাহিদরা এসব কিরাআত কুরআন হওয়ার ব্যাপারে একমত। কুরআন থেকে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কুরআনের এসব কিরাআতে মুতাওয়াতিরা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের বিষয়ে চার মাজহাবের সকল ফকিহের ঐকমত্য রয়েছে। তবে যেসব কিরাআত মুতাওয়াতির নয়, তা থেকে বিধান উদ্ভাবন করা যাবে কি না, এ নিয়ে তাঁরা ভিন্নমত করেছেন।

কিরাআতে মুতাওয়াতিরের ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করে গামিদি এসব অস্বীকার করেন। তাঁর মতে কুরআনের কিরাআত শুধু একটিই। একে তিনি কিরাআতে আম্মা বা সাধারণ কিরাআত বলে থাকেন। তিনি বলেন, এই কিরাআত প্রাচ্যের অধিকাংশ

অঞ্চলে 'রিওয়ায়াতে হাফস' নামে প্রচলিত। এ ছাড়া অন্যান্য কিরাআত অনারবদের ফিতনা।

গামিদি আরও বলেন, 'ফলে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের কিরাআত কেবল একটিই, যা আমাদের মুসহাফসমূহে রয়েছে। এ ছাড়া অন্য যেসব কিরাআত তাফসিরগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়, অথবা কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষেরা পড়েন, এ সবই মূলত সেই ফিতনার অবশিষ্ট রূপ, যার প্রভাব থেকে ইসলামি জ্ঞানের কোনো শাখাই মুক্ত নেই।'[১১৩]

মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, সুদান, ইয়ামেন, মৌরিতানিয়া, আলজেরিয়া, সোমালিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলে যে কিরাআত প্রচলিত, গামিদি তা মানতে নারাজ। এক জায়গায় তিনি বলেন, 'কুরআন মূলত আমাদের মুসহাফসমূহে যা আছে, তা-ই। পশ্চিমের কিছু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা যে কিরাআত তিলাওয়াত করেন, তা-ই কুরআন। এ ছাড়া অন্য কোনো কিরাআত কুরআন নয়, তাই তাকে কুরআন হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।'[১১৪]

## চার. সুন্নাহ ও হাদিস একই

আল্লাহ তাআলা মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে অসংখ্য নবি ও রাসুল পাঠিয়েছেন। নবি ও রাসুলদের কাছে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য তিনি ওহির ধারাবাহিকতা চালু করেন। এই ওহি অবতরণ দুটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে :

১. কখনো এই ওহির শব্দ ও মর্ম দুটোই আল্লাহর হয়ে থাকে। এ ধরনের ওহি হয়তো লিখিত আকারে অবতীর্ণ হতো অথবা পরে লিখে রাখা হতো। উদাহরণস্বরূপ ইবরাহিম আ.-এর সহিফাসমূহ থেকে শুরু করে তাওরাত, ইনজিল, জাবুর এবং কুরআন ইত্যাদি।

২. দ্বিতীয় প্রকারের ওহি হলো, যার শব্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে না হলেও মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। উদাহরণস্বরূপ জিবরিল আ. কর্তৃক রাসুল ﷺ-কে নামাজের সময়, ইসলাম, ইমান, ইহসান এবং কিয়ামতের নিদর্শন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। ইবরাহিম আ.-কে আল্লাহ কর্তৃক সন্তান কুরবানির নির্দেশ প্রদানও এ ধরনের ওহির অন্তর্ভুক্ত।

[১১৩] মিজান : ৩২।
[১১৪] প্রাগুক্ত : ২৭।

প্রথম প্রকার ওহিকে ওহিয়ে মাতলু বা পাঠ্য ওহি বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারকে ওহিয়ে গায়রে মাতলু বা অপাঠ্য ওহি বলা হয়। কুরআন মাজিদ হলো ওহিয়ে মাতলু, আর হাদিস ওহিয়ে গায়রে মাতলু।

অন্যকথায়, ইসলামি শরিয়তে শব্দগত ওহি হলো কুরআন মাজিদ আর অর্থগত ওহি হলো রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ। সাহাবিরা এ দুই প্রকারের ওহিই সংরক্ষণ করেছেন এবং উম্মাহর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআনের বর্ণনাকে কিরাআত আর সুন্নাহর বর্ণনাকে হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ কেউ যদি রাসুল ﷺ থেকে উদ্ধৃত করে সুন্নাহ বর্ণনা করেন, তবে তাঁর এই বর্ণনা হাদিস। সুন্নাহ যদি হয় ওহিয়ে খাফি, তাহলে হাদিস এই ওহির বর্ণনা। এই দিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সুন্নাহ এবং হাদিসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ জাবেদ আহমাদ গামিদি আহলুস সুন্নাতের অবস্থান উপেক্ষা করে সুন্নাহ এবং হাদিসের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছেন।

সুন্নাহর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সুন্নাহ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য দীনে ইবরাহিমির এমন কিছু আমল, রাসুল ﷺ যেসবের সংস্কার ও পরিবর্তন-পরিমার্জন করে উম্মাহর মধ্যে দীন হিসেবে চালু করেছেন। কুরআনুল কারিমে রাসুল ﷺ-কে মিল্লাতে ইবরাহিমির আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

> ﴿ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾
>
> এরপর আমি আপনাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করুন। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [সুরা নাহল : ১২৩]

এভাবে আমরা যে দীন পেয়েছি, তা হলো ইবাদত, সামাজিকতা, পানাহার এবং নীতি ও শিষ্টাচারবিষয়ক কিছু সুন্নাহ।

ইবাদতের সুন্নাত :

১. নামাজ।
২. জাকাত এবং সাদাকায়ে ফিতর।
৩. রোজা ও ইতিকাফ।
৪. হজ ও উমরা।
৫. কুরবানি ও আইয়ামে তাশরিকের তাকবির।

সামাজিকতার সুন্নাত :

১. বিয়ে ও তালাক-সংক্রান্ত বিষয়াদি।
২. হায়িজ ও নিফাসের সময় স্বামী-স্ত্রীর মিলন না করা।

পানাহারের সুন্নাত :

১. উচ্ছিষ্ট, রক্ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাইকৃত জন্তুর অবৈধতা।
২. আল্লাহর নামে জবাইকৃত জন্তুর বৈধতা।

নীতি-শিষ্টাচারের সুন্নাত :

১. আল্লাহর নামে ডান হাত দিয়ে পানাহার করা।
২. কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া এবং তার উত্তর প্রদান করা।
৩. হাঁচি এলে 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তার প্রত্যুত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।
৪. নবজাতকের ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া।
৫. গোঁফ ছোট রাখা।
৬. নাভির নিচের লোম কাটা।
৭. বগলের নিচের লোম পরিষ্কার করা।
৮. নখ কাটা।
৯. ছেলেসন্তানের খতনা করানো।
১০. নাক, মুখ এবং দাঁত পরিচ্ছন্ন রাখা।
১১. প্রস্রাব বা পায়খানার পর ইসতিনজা তথা পবিত্রতা অর্জন করা।
১২. হায়িজ ও নিফাসের পর গোসল করা।
১৩. কেউ মারা গেলে কাফনের ব্যবস্থা করা।
১৪. দাফন করা।
১৫. ইদুল ফিতর।
১৬. ইদুল আজহা।

সুন্নাত এগুলোই। এ ব্যাপারে এ কথা অকাট্য যে, প্রামাণিকতার নিরিখে এর সঙ্গে কুরআনের কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন যেমন সাহাবিদের ইজমা এবং তাওয়াতুরের মাধ্যমে এসেছে, তেমনি এই সুন্নাহও তাঁদের ইজমা এবং তাওয়াতুরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমনকি কুরআনের মতোই প্রত্যেক যুগে মুসলিমদের ইজমার মাধ্যমে

প্রমাণিত বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে এখন কোনো রকমের বিতর্ক বা ঝগড়া করার সুযোগ নেই।[১১৫]

## পাঁচ. ফিতরাত বা প্রকৃতি-দর্শন

দীনের উৎস বলে শরিয়তের এমন কিছু প্রমাণ বোঝানো হয়, যেগুলোর আলোকে শরিয়তের বিধিবিধান উদ্ভাবন করা হয়। ইমাম ইবনু হাজম রাহ. ছাড়া আহলুস সুন্নাতের মতে দীনের উৎস চারটি : ১. কুরআন, ২. সুন্নাহ, ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াস। ফকিহদের কাছে এই উৎসগুলো সর্বসম্মত। এগুলো ছাড়াও এমন কিছু উৎস রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন। উদাহরণস্বরূপ সাহাবিদের বক্তব্য, ইসতিহসান, মাসালিহুল মুরসালা, ইসতিসহাব, সাদ্দুজ জারায়ি, উরফ-আদত এবং আগের শরিয়তসমূহ।

ইসলাম স্বভাবধর্ম। কিন্তু এর অর্থ কখনো এই নয় যে, মানবপ্রকৃতি দীন, আল্লাহর বিধানাবলি, আদেশ-নিষেধ এবং বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করতে সক্ষম। বরং স্বভাবধর্ম হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে মানুষকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা সম্পাদন করতে মানবপ্রকৃতি নিজের মধ্যে একধরনের টান উপলব্ধি করে। অন্যদিকে, তিনি যা করতে আমাদের বারণ করেছেন, সুস্থ-মস্তিষ্ক স্বতই তা করতে অস্বীকার করে। আল্লাহর বিধানাবলি স্বভাবসিদ্ধ এটা ঠিক; কিন্তু মানবপ্রকৃতি সেগুলো নির্ণয় করতে পারে না। এই ভুলের মধ্যেই পড়ে আছেন গামিদি। একসময় মুতাজিলারাও এমন ধারণা পোষণ করত। তাদের বক্তব্য ছিল—যুক্তির আলোকে শরিয়ত ও তার বিধানাবলি নির্ণয় করতে হবে। যুক্তির আলোকে যা উত্তীর্ণ হবে, শরিয়তের আলোকেও তা উত্তীর্ণ। আর যুক্তির আলোকে যা অনুত্তীর্ণ, শরিয়তের আলোকেও তা অনুত্তীর্ণ।

মুতাজিলারা যুক্তিকে যে স্থানে দাঁড় করিয়েছিল, গামিদিও মানবপ্রকৃতিকে সেই অবস্থানে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধানাবলি এবং হালাল-হারাম তথা সর্বক্ষেত্রে ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ নির্ণয় করা মানবপ্রকৃতির কাজ। প্রাথমিক যুগে ইমাম আবুল হাসান আশআরি এবং আবু মানসুর মাতুরিদি যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশাবলি নির্ণয় করতে হবে, মুতাজিলাদের এমন অভিমত যথোচিতভাবে খণ্ডন করেছিলেন। সেই সঙ্গে আহলুস সুন্নাতের অবস্থানও তাঁরা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন।

[১১৫] প্রাগুক্ত : ১৪।

গামিদি বলেন, 'এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে কিছু হালাল আর কিছু হারাম। দ্বিতীয় শ্রেণির প্রাণী খাওয়া হলে তার প্রভাব যেহেতু মানুষের চরিত্রে পড়ে, তাই তা খেতে অস্বীকার করা তাদের স্বভাবসিদ্ধ। মানুষের এই প্রকৃতি তাদের সঠিক নির্দেশনা দেয়। কোনো সন্দেহ ছাড়াই মানুষকে সিদ্ধান্ত দেয় যে, কোন প্রাণী খাওয়া যাবে আর কোনটি খাওয়া যাবে না। তার জানা আছে—বাঘ, সিংহ, হাতি, চিল, কাক, গাধা, বাজপাখি, সাপ-বিচ্ছু এমনকি খোদ মানুষ, এসব খাদ্যবস্তু নয়। সে জানে, ঘোড়া এবং গাধা সুস্বাদু খাবার হওয়ার জন্য নয়, বরং আরোহণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব প্রাণীর মলমূত্রের বিষয়েও তাদের সম্যক জ্ঞান রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষের এই প্রকৃতি কখনো অক্ষম হয় না। কিন্তু মানুষের স্বভাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষই সাধারণত এ ব্যাপারে ভুল করে না। তাই এসব প্রাণীর হালাল-হারাম হওয়া শরিয়তের আলোচ্য নয়; বরং 'সকল পবিত্র বস্তু হালাল এবং সকল অপবিত্র বস্তু হারাম'—এটা বলে শরিয়ত মানুষকে প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ফলে শরিয়ত কেবল এমন কিছু প্রাণী এবং কিছু বিষয়ের আলোচনা করেছে, যেসবের বৈধাবৈধতার সিদ্ধান্ত প্রদান করা মানবপ্রকৃতির জন্য অসম্ভব ছিল। গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্টের মতোই। কিন্তু এগুলোও হিংস্র প্রাণীর মতো গোশত খায়। এবার এসব হালাল হবে, নাকি হারাম? যেসব প্রাণী আমরা সাধারণত জবাই করি, এমন কোনোটি যদি জবাই ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তা বৈধ হবে না অবৈধ? এসব প্রাণীর রক্তের বিধান কী? বা এদের মলমূত্র কী ধরনের নাপাক? নাকি এসবকে বৈধ এবং পবিত্র বলা হবে? যদি এসব প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা হয়, তবে কি হালাল থাকবে? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট ও অকাট্য উত্তর যেহেতু মানবপ্রকৃতি দিতে সক্ষম নয়, তাই আল্লাহ তাআলা নবিদের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, উচ্ছিষ্ট, রক্ত এবং আল্লাহর নামে জবাই করা হয় না এমন প্রাণী পবিত্র নয়। মানুষের উচিত এসব থেকে দূরে থাকা। প্রাণীর হালাল-হারাম বিষয়ে শরিয়তের বিষয়বস্তু মূলত এই চারটি বিষয়ই। তাই আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক জায়গায় সীমাবদ্ধ করে স্রেফ এই চার জিনিসকেই হারাম বলেছেন।

কিছু বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ নোংরা প্রকৃতির মুরগি, হিংস্র পাখি এবং পালিত গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয়, এটিই সেই ফিতরাত বা প্রকৃতির আলোচনা, যার জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এই জ্ঞানের আলোকে আমরা চাইলে নিষিদ্ধের তালিকায় আরও বিষয় যুক্ত করতে পারি। মূলত মানুষ একে ভুলবশত প্রকৃতির বিষয় মনে না করে শরিয়তের বিষয় মনে করছে। এমতাবস্থায় কুরআনে বর্ণিত এসব হারাম বিষয়ের সঙ্গে কোনো কিছুরই

সম্পর্ক নেই। তাই হাদিসের মাধ্যমে একে রহিত করা অথবা এতে কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ নেই।'[১১৬]

একইভাবে তিনি আরেক জায়গায় বলেন, 'কুরআনের দাওয়াত যেসব পদক্ষেপের মাধ্যমে শুরু হয়, তা হলো :

১. ফিতরাত বা প্রকৃতির বাস্তবতা।

২. দীনে ইবরাহিমির আমল।

৩. নবিদের সহিফা।

প্রথম বিষয়টির সম্পর্ক ইমান ও আখলাকের মৌলিক বিষয়াদির সঙ্গে। এর বিরাট এক অংশকে পরিভাষায় ভালো এবং মন্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব বিষয়কে মানবপ্রকৃতি ভালো মনে করে এবং যেসবকে মন্দ মনে করে, এর সামগ্রিক কোনো তালিকা কুরআন পেশ করেনি; বরং এই বাস্তবতা মেনে সূচনা থেকেই তাদের নির্দেশ দিয়েছে ভালো এবং মন্দ পার্থক্য করে ভালোটা গ্রহণ করতে আর মন্দটা ত্যাগ করতে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

> মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের বন্ধু। তারা মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য থেকে বারণ করে। [সুরা তাওবা : ৭১]

এ ব্যাপারে যদি কোথাও ভিন্নমত দেখা দেয়, তবে সাহাবিদের অবস্থানই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।'[১১৭]

গামিদির বিশিষ্ট শিষ্য এবং *ইশরাক* সাময়িকীর সম্পাদক মানজুরুল হাসান গামিদির এ অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'কুরআন মাজিদ ইসলামের শেষ কিতাব। দীনের সূচনা এই কিতাব দিয়ে নয়; বরং প্রথমত সেই স্বভাব ও প্রকৃতির মাধ্যমে হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, শরিয়তের সেসব বিধানের মাধ্যমে, যা বিভিন্ন সময় নবিদের সুন্নাহ হিসেবে চালু ছিল এবং পরিশেষে সুন্নাতে ইবরাহিমি হিসেবে স্থির হয়েছে। এরপর এসেছে ঐশীগ্রন্থ তাওরাত, জাবুর এবং ইনজিল। এসব গ্রন্থে শরিয়ত এবং হিকমতের বিভিন্ন দিক প্রয়োজন সাপেক্ষে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে

[১১৬] *মিজান* : ৩৬-৩৭—মুদ্রণ—২০০৯।

[১১৭] প্রাগুক্ত : ৪৪-৪৫।

পাঠালেন। কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হলো। তাই কুরআন দীনের শেষ কিতাব; আর দীনের উৎস কুরআন ছাড়াও স্বভাব ও প্রকৃতির বাস্তবতা, সুন্নাতে ইবরাহিমির আমল এবং পূর্বকার সহিফাসমূহ।'[১১৮]

## ছয়. কিতাব শুধু কুরআনই নয়

গামিদির মতে কুরআনে উল্লিখিত 'কিতাব'-এর অর্থ কালামে ইলাহি। অর্থাৎ তাওরাত, ইনজিল, কুরআন ও জাবুর। রহিত আসমানি কিতাবগুলোকেও তিনি শরিয়তের উৎস মনে করেন। এই কিতাব-তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন আমিন আহসান ইসলাহি থেকে, যা গামিদির তাফসির *আল-বায়ান* এবং ইসলাহির *তাদাব্বুরে কুরআনে* সুরা বাকারার প্রথম আয়াতের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসেছে।

কুরআনের সংজ্ঞা উল্লেখ করে গামিদি বলেন, 'কুরআন মূলত কিতাবে ইলাহির একটি অংশ, তবে সমগ্র কিতাব নয়; বরং তাওরাত, ইনজিল এবং জাবুর ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।'

তিনি বলেন, 'কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় কিতাব শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুরা বাকারার প্রথম আয়াতে 'জালিকাল কিতাব'-এর তাফসিরে গামিদি বলেন, 'আর কিতাব অর্থ কিতাবে ইলাহি। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় শব্দটি এই অর্থে এবং এই ঢঙেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকলেও প্রেক্ষাপট ও স্থানভেদে তার একটি অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়।'[১১৯]

গামিদি বলেন, 'কুরআনে কিতাব শব্দটি একেক জায়গায় একেক অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর নির্দিষ্ট অর্থ হলো কিতাবে ইলাহি। আর এটিই তার সবচেয়ে সংগত ও উপযুক্ত অর্থ।'

এই বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন সমগ্র কিতাব নয়; বরং কিতাবের অংশবিশেষ সাব্যস্ত হয়। কিতাবের এই তাফসিরই গামিদির গুরু আমিন আহসান ইসলাহি করেছেন। তিনি লেখেন, 'কুরআন মাজিদে কিতাব শব্দটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

১. লিখিত তাকদির অর্থে।
২. আল্লাহ তাআলার রেজিস্টার অর্থে, যাতে সবকিছুর রেকর্ড রয়েছে।
৩. পত্র ও সংবাদ।
৪. বিধিবিধান ও নির্দেশাবলি।
৫. আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বাণী।

[১১৮] ইশরাক—মার্চ ২০০৪ : ১১।
[১১৯] প্রাগুক্ত—অক্টোবর ১৯৯৮ : ৮।

সুরা বাকারার উপরিউক্ত আয়াতে 'কিতাব' শব্দটি কিতাবে ইলাহি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কিতাবে ইলাহির বিশেষ কোনো অংশও হতে পারে, আবার সমগ্র কিতাবে ইলাহিও হতে পারে। কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থেকে অধিক সংগত ও উপযুক্ত হওয়ার কারণে যেভাবে একটি বিশেষ অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি এখানেও শব্দটি বিশেষভাবে কালামে ইলাহি অর্থে ব্যবহৃত হবে। এটা আগে থেকেই প্রসিদ্ধ।[১২০]

এ কারণে গামিদি এবং তার শিষ্যরা আগেকার আসমানি কিতাবসমূহ থেকে অধিক পরিমাণে প্রমাণ পেশ করেন। এসব গ্রন্থের ওপর আমল করার কারণ হলো—তাদের মতে, ইবরাহিম আ.-এর শরিয়তের বিধানাবলি অত্যন্ত স্পষ্ট সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আর ইবরাহিম আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত যত শরিয়ত এসেছে, তন্মধ্যে খুব কম শরিয়তই রহিত হয়েছে। এজন্য উম্মাতে মুহাম্মাদি রাসুল ﷺ-এর আনীত শরিয়তের পাশাপাশি পূর্ববর্তী সেসব শরিয়তের ওপরও আমল করবে। তবে শর্ত হলো, শরিয়তগুলোর হিফাজত প্রমাণিত হতে হবে। গামিদি মনে করেন, আগের শরিয়তসমূহের অধিকাংশ বিধান এখনো ইসলামের নীতিমালার এক বিরাট উৎস। যদিও সেসব শরিয়তের কিছু কিছু বিধান রহিত করা হয়েছে।

এর পক্ষে দলিল হিসেবে তিনি সুরা মায়িদার ৪৮ নম্বর আয়াত পেশ করেন, যাতে বলা হয়েছে (তাঁর অনুবাদে), 'হে নবি, আমি সত্যসহ আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি সেই শরিয়তের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক হিসেবে, যা ইতিপূর্বে বিদ্যমান ছিল।'[১২১]

আরেক জায়গায় তিনি লেখেন, 'তৃতীয় প্রকার হলো সেসব সহিফা, যা এখন তাওরাত, জাবুর এবং ইনজিল হিসেবে বাইবেলে রয়েছে। এসবের হতভাগা ধারক-বাহকেরা যদিও কিতাবগুলোর কিয়দংশ বিনষ্ট করার পাশাপাশি অনেক বিকৃতি সাধন করেছে, তবু হিকমত এবং শরিয়তের এক বিরাট অংশ এসব গ্রন্থে এখনো আল্লাহ তাআলার বর্ণনাশৈলীতেই বিদ্যমান রয়েছে।'[১২২]

তিনি আরও বলেন, 'তৃতীয় কথা হলো, ইলহামকৃত ইলমের বিশেষ বর্ণনাপদ্ধতি। ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের ইতিহাস, বনি ইসরাইলের নবিদের ইতিকথা এবং অন্যান্য বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা ও ইঙ্গিত বিশদভাবে বুঝতে হলে আগের সহিফাসমূহই প্রধান উৎস বলে পরিগণিত হবে।'[১২৩]

গামিদির শিষ্য মানজুরুল হাসান এই আলোচনার সারকথা এভাবে বলেন, 'কুরআন

---

১২০ *তাদাব্বুরে কুরআন*, আমিন আহসান ইসলাহি : ১/৪৬।

১২১ *মিজান* : ৪৮।

১২২ প্রাগুক্ত : ৪৬।

১২৩ প্রাগুক্ত : ৪৭।

মাজিদ ইসলামের শেষ কিতাব। দীনের সূচনা এই কিতাব দিয়ে হয়নি। বরং তা হয়েছে প্রথমত সেই স্বভাব ও প্রকৃতির মাধ্যমে, যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন; দ্বিতীয়ত, শরিয়তের সেসব বিধানের মাধ্যমে, যা বিভিন্ন সময় নবিদের সুন্নাহ হিসেবে চালু ছিল এবং পরিশেষে সুন্নাতে ইবরাহিমি হিসেবে স্থির হয়েছে। এরপর এসেছে ঐশীগ্রন্থ তাওরাত, জাবুর ও ইনজিল। এসব গ্রন্থে শরিয়ত এবং হিকমতের বিভিন্ন দিক প্রয়োজন সাপেক্ষে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। সবশেষে আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে পাঠালেন। কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হলো। তাই কুরআন দীনের শেষ কিতাব; আর দীনের উৎস কুরআন ছাড়াও স্বভাব ও প্রকৃতির বাস্তবতা, সুন্নাতে ইবরাহিমির আমল এবং আগের সহিফাসমূহ।'[১২৪]

এ জন্য আগেকার আসমানি কিতাবগুলো যখন তাঁদের প্রণীত সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাঁরা কুরআনের আয়াতের মতো এসব কিতাব থেকেও ব্যাপকহারে প্রমাণ পেশ করেন। আমরা বলি, মূলত গামিদি উৎস নির্ণয়ে ভুল করেছেন। রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াত লাভ এবং কুরআন অবতরণের পর উম্মতে মুহাম্মাদি আগেকার কোনো শরিয়তের অনুগত নয়। রাসুল ﷺ-এর আনীত দীন ও শরিয়ত সর্বব্যাপী এবং পরিপূর্ণ। ধরে নিই, আগের শরিয়তগুলো যদিও নির্ভুল সাব্যস্ত হয়, তবু সে অনুযায়ী আমল করা যাবে না। অবশ্য কোনো বিষয় আগের শরিয়তের পাশাপাশি যদি তা আমাদের শরিয়তেও থাকে, তখন তার ওপর আমাদের শরিয়ত অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

গামিদির মতে, ইবরাহিম আ.-এর পরে আগত প্রায় সব শরিয়তই পূর্ণ ছিল, যা সর্বযুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা রাখত। কিন্তু আমরা এই বিবেচনায় সব শরিয়তকে পূর্ণ মনে করি যে, সেগুলো তখনকার স্থান-কালের জন্য পরিপূর্ণ ছিল। তবে এখন যেহেতু কুরআন এসেছে, তাই প্রাক্তন শরিয়তগুলোর কোনো প্রয়োজন আর নেই।

## সাত. লিখিত গ্রন্থ

জাবেদ আহমাদ গামিদির উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *মিজান*। ১৯৯০ সালে তিনি এর রচনা শুরু করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় পরবর্তীকালে পৃথক পৃথক বই আকারে প্রকাশ করা হয়। *আল-ইসলাম* তাঁর আরেকটি গ্রন্থ। এটি মূলত *মিজানেরই* সংক্ষিপ্তরূপ, যা ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি দীন, ইমান, আখলাক, ইবাদতের পদ্ধতি, সামাজিকতা, রাজনীতি, জীবন-পরিচালনা-পদ্ধতি,

[১২৪] *ইশরাক*—মার্চ ২০০৪ : ১১।

দাওয়াহ-নীতি, জিহাদের বিধান, হদ ও দণ্ডবিধি, পানাহার, নীতি ও শিষ্টাচার এবং কসম ও কাফফারা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আরেকটি গ্রন্থ হলো *বুরহান*। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ সালে। এতে গামিদির সামসময়িক আলিমদের নিয়ে লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলো ঠাঁই পেয়েছে। *মাকামাত* গামিদির আরেকটি গ্রন্থ, যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটিও বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধের সংকলন। এ ছাড়া *আল-বায়ান* নামে গামিদি চার খণ্ডে পবিত্র কুরআনের একটি তাফসির লিখেছেন। এছাড়াও *খিয়াল ওয়া খামাহ* নামে তাঁর একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

## আট. উপসংহার

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের মতো জাবেদ আহমাদ গামিদিরও অধিকাংশ বরং সমগ্র চিন্তাধারাই দাঁড়িয়ে আছে ভুল ভিত্তির ওপর। যুক্তি ও আধুনিকতাবাদী প্রবণতার টানে দুজনেই ইসলামের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করেছেন। এমনটা অবশ্য হবারই ছিল, দুজনই যেহেতু একই গুরুর শিষ্য। আমিন আহসান ইসলাহির সান্নিধ্য নিয়েছেন দুজনেই। আর ইসলাহি ছিলেন হামিদুদ্দিন ফারাহি থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত। তাই দেখা যায়, এক-আধটু ভিন্নমত থাকলেও মৌলিক চিন্তায় দুজনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ধরনের পণ্ডিতদের কিছু-না-কিছু অনুসারী সবসময়ই থাকে—হোক তা সাধারণ শ্রেণির মধ্যে অথবা শিক্ষিত ও আলিমশ্রেণির মধ্যে। এদের সমর্থনে তাঁদের অবস্থান ও প্রভাব ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়। তাঁরাও একেকজন নিজেকে বিরাট জ্ঞানী ভাবতে শুরু করেন। ফলে ইসলামের যেমন ক্ষতিসাধন এঁরা করেন, অন্যরা তার ধারেকাছেও যেতে পারেন না।

যেমন মুফতি কামালুদ্দিন মুসতারশিদ[১২৫] গামিদির পক্ষ নিয়ে বলেন, 'অধিকাংশ সময়ই যেমনটা ঘটে—কারও নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে আমরা তার সঙ্গে একমত না হতে পারলে তার অন্য কোনো বিষয়েও আস্থা রাখি না। জাবেদ আহমাদ গামিদির ব্যাপারেও আমাদের একই কথা। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্যকে দীনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় ঠিকই, তবে এটা ঘটে জ্ঞান বা অধ্যয়নের ঘাটতির কারণেই। আমরা এসব বিষয়ের গভীরে যেতে আগ্রহী নই।

গামিদিকে নিয়ে যখন আমরা গবেষণা শুরু করি, বিস্ময়কর হলেও স্পষ্ট হয় যে, তাঁর কোনো অবস্থানই নতুন নয়। প্রথমত দাড়ির কথা যদি বলা হয়, মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য আলিম ও স্কলার দাড়ি রাখতেন না অথবা ছোট রাখতেন। এ ব্যাপারে তিনি

[১২৫] জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরি টাউন করাচির স্নাতক। বর্তমানে করাচির জামিয়া ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম বেনারসে হাদিস পাঠদান করছেন। এ ছাড়া জামিয়া ইসলামিয়া ক্লিফটনেরও শিক্ষক তিনি।

ইমাম শাফিয়ি রাহ.-এর মতকে অধিক বিশুদ্ধ মনে করেন, যা ইমাম নববি রাহ. তাঁর সহিহ মুসলিমের টীকায় এবং ড. ওয়াহবা আল জুহায়লি *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। জুহায়লি বলেন, 'দাড়ি রাখা সাওয়াবের কাজ, আর কর্তন করা জায়িজ।' দ্বিতীয়ত ছবি তোলার বিষয়ে যদি বলা হয়, এক্ষেত্রেও অসংখ্য আলিম গামিদির মতোই চিন্তা লালন করেন। এঁদের মধ্যে ড. ইউসুফ কারজাবি, শায়খ আলি সাবুনি, ড. আহমাদ শারবাসি, মুহাম্মাদ বাখিত, শায়খ মুহাম্মাদ আলি আস সায়িস এবং শায়খ ইবনু উসাইমিনের নাম বলা যায়। তৃতীয়ত, পুরুষের টাখনু ঢেকে রাখার ব্যাপারে কথা হলো—একাধিক আরব আলিমের অবস্থান এমনই। অধিকন্তু, হানাফি মাজহাবের এক মতানুসারে একে মাকরুহে তানজিহি বলা হয়েছে। চতুর্থত, উত্তরাধিকারের সম্পদের বিধানে 'পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ' লাভের মতটি ইবনু আব্বাস রা.-এর এক শিষ্য আতা রাহ. পোষণ করতেন। পঞ্চমত, নারীর চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়—এই মত হানাফি ফিকহের পূর্ববর্তী প্রায় সকল আলিম এবং আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি প্রমুখের।

শালীন গান শোনা জায়িজ। তবে বর্তমানে যেসব গানবাজনা অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার প্ররোচক, তা নিঃসন্দেহে হারাম। এই মত যাঁরা পোষণ করতেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হামিদ গাজালি, মাওলানা জাফরশাহ নদবির নাম বলা যায়। এরপর কুরআনের প্রচলিত সাত কিরাআতের তাওয়াতুর বা ধারাবাহিকতা প্রমাণিত নেই—এই ধারণা পোষণকারীদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ.-এর জামাতা মাওলানা তা-সিন, মাওলানা হাকিম নিয়াজ আহমাদ, মাওলানা সায়িদ আহমাদ আকবরাবাদি, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশিমি নদবি, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা লখনৌয়ের সাবেক প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদিস ও মুফতি মাওলানা ইসহাক সিদ্দিকি নদবি, মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা তামান্না ইমাদি এবং মুফতি তাহির মাক্কি প্রমুখ।[১২৬]

—

১২৬ *গামিদি উলামা কে নজর মেঁ* : ২২-২৩।



# তথ্যসূত্র


১. আল কুরআনুল কারিম।

২. সহিহুল বুখারি, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল বুখারি।

৩. সুনানু আবি দাউদ, ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান আল আজদি।

৪. মুসনাদু আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল।

৫. আল-মাওসুআতুল মুয়াসসরা ফিল আদইয়ান ওয়াল মাজাহিব ওয়াল আহজাব আল মুআসিরা; দারুন নাদওয়া আল আলামিয়া, রিয়াদ।

৬. আল আ'লাম, খায়রুদ্দিন ইবনু মাহমুদ আজ জারকালি।

৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা, শামসুদ্দিন আজ জাহাবি।

৮. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলি আল খোরাসানি; মাকতাবাতুস সাওয়াদি, জিদ্দা।

৯. শারহুল ফিকহিল আকবার, নুরুদ্দিন আবুল হাসান আলি আল কারি; দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

১০. জুআমাউল ইসলাহ ফিল আসরিল হাদিস, ড. আহমাদ আমিন; মাকতাবাতুন নাহজাতিল মিসরিয়া, কায়রো।

১১. জামালুদ্দিন আল আফগানি ওয়াস সাওরাহ আশ শামিলা, সাইয়িদ ইউসুফ; আল হায়আতুল মিসরিয়া আল আম্মা, কায়রো। প্রকাশকাল: ১৯৯৯ খ্রি.।

১২. জামালুদ্দিন আল আফগানি, আবদুর রাহমান রাফিয়ি; দারুল কাতিবিল আরাবি, বৈরুত।

১৩. জামালুদ্দিন আল আফগানি: জিকরায়াত ওয়া আহাদিস, আবদুল কাদির আল মাগরিবি; দারুল মাআরিফ, মিসর।

১৪. জামালুদ্দিন আল আফগানি: আল মুসলিহ ওয়াল মুফতারা আলাইহ, ড. মুহসিন আবদুল হামিদ; মুআসসাসা আর রিসালা, বৈরুত।

১৫. খাতিরাতু জামালিদ্দিন আল আফগানি, মুহাম্মাদ আল মাখজুমি; দারুল ফিকরিল হাদিস, লেবানন।

১৬. শারহু দিওয়ানি সিহরি হারুত, সালিম আনহুরি; আল মাকতাবাতুল হাফনিয়া, দামেশক।

১৭. জামালুদ্দিন আল আফগানি, মুকিজুশ শারক ওয়া ফাইলাসুফুল ইসলাম; দার আশ শুরুক, মিসর।

১৮. তারিখুল উসতাজিল ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু, রশিদ রিজা; মাতবাআতুল মানার।

১৯. দাওয়াতু জামালিদ্দিন আল আফগানি ফি মিজানিল ইসলাম, মুসতাফা ফাওজি ইবনু আবদুল লাতিফ; দারু তাইয়িবা, রিয়াদ।

২০. জামালুদ্দিন আসাদাবাদি, মির্জা লুতফুল্লাহ খান আসাদাবাদি। ফার্সি থেকে আরবি রূপান্তর ও ভূমিকা: ড আবদুন নায়িম মুহাম্মাদ হাসানাইন; দারুল কিতাব আল লুবনানি, বৈরুত। প্রকাশকাল: ১৯৭৩ খ্রি.।

২১. জামালুদ্দিন আল আফগানি, মাহমুদ আবু রাইয়া; দারুল মাআরিফ, মিসর।

২২. মানহাজুল মাদরাসাতিল আকলিয়া আল হাদিসা ফিত-তাফসির, ফাহদ ইবনু আবদুর রাহমান আর রুমি; ইদারাতুল বুহুস আল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ্দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, রিয়াদ।
২৩. আল আমাল আল-কামিলা লি মুহাম্মাদ আবদুহু, ড. মুহাম্মাদ ইমারা; দার আশ শুরুক, মিসর।
২৪. রশিদ রিজা আল ইমামুল মুজাহিদ, ড. ইবরাহিম আহমাদ আল আদাবি; আল মুআসসাসাতুল মিসরিয়া আল আম্মা, মিসর।
২৫. তাফসিরুল মানার, রশিদ রিজা; আল হায়আতুল মিসরিয়া আল আম্মা, মিসর।
২৬. আল আমালুল কামিলা লি মুহাম্মাদ আবদুহু, ড. মুহাম্মাদ ইমারা; দার আশ শুরুক, মিসর।
২৭. তাহা হুসাইন ফি মিজানিল উলামা ওয়াল উদাবা, মাহদি মাহমুদ ইসতাম্বুলি; আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত। প্রকাশকাল: ১৯৮৩ খ্রি.।
২৮. ফিশ-শি'রিল জাহিলি, ড. তাহা হুসাইন; মাকতাবাতু দারিন নাদওয়াহ।
২৯. জাহরাতুল উমর, তাওফিক হাকিম; দার আশ শুরুক, মিসর।
৩০. ফিকরু তাওফিক আল হাকিম ফি মিজানিল ইসলাম, ড. আলি সাইয়িদ আহমাদ সাইয়িদ।
৩১. আ'লাম ওয়া আকজাম ফি মিজানিল ইসলাম, সাইয়িদ ইবনু হুসাইন আল আফফানি; দারু মাজিদ ইরি; জিদ্দা
৩২. আল কারজাবি ফিল মিজান, সুলায়মান ইবনু সালিহ আল খাররাশি; দারুল জাওয়াব, রিয়াদ।
৩৩. নাফাহাত ওয়া লাফাহাত, ইউসুফ আল কারজাবি; মাকতাবাতু ওয়াহবা, মিসর।
৩৪. আল-ইলাম বিনাকদি কিতাব আল হালাল ওয়াল হারাম, সালিহ ইবনু ফাওজান আল ফাওজান।
৩৫. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, ওয়াহবা আল জুহায়লি; দারুল ফিকর, দামেশক।
৩৬. আশ-শিআহ ওয়াত তাসহিহ, মুসা আল মুসাবি।
৩৭. জিঅবুল আনাজোল, মুসতাফা জায়ন; রিয়াজ আর রাইস, ব্রিটেন। প্রকাশকাল: ১৯৯১ খ্রি.।
৩৮. আর রাজুলুস সানাম, ফাতহি বাশির বালআবি; ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন। প্রকাশকাল: ২০০৮ খ্রি.।
৩৯. ইনসানি দুনিয়া পর মুসলমানোঁ কে উরুজ ও জাওয়াল কা আসর, আবুল হাসান আলি নদবি; মজলিস-ই তাহকিকাত ওয়া নাশরিয়াত-ই ইসলাম, করাচি।
৪০. উর্দু ইসলামি বিশ্বকোষ—প্রথম মুদ্রণ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর। প্রকাশকাল: ১৯৬৪ খ্রি.।
৪১. তাফসিরুল কুরআন, স্যার সাইয়িদ আহমাদ খান।
৪২. আইনা-ই পারভেজিয়াত, মাওলানা আবদুর রাহমান গিলানি; মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর। প্রকাশকাল:২০০৪ খ্রি.।
৪৩. তাফসিরে মাতালিবুল ফুরকান কা ইলমি ওয়া তাহকিকি জায়িজা, মুহাম্মাদ দিন কাসিমি; ইদারা-ই মাআরিফে ইসলামি, লাহোর।
৪৪. গোলাম আহমাদ পারভেজ আপনে আলফাজ কে আইনে মেঁ, মুহাম্মাদ দিন কাসিমি; বায়তুল হিকমা, লাহোর। প্রকাশকাল: ২০০৬ খ্রি.।
৪৫. গোলাম আহমাদ পারভেজ কে নিজামে রুবুবিয়াত পর এক নজর, মুহাম্মাদ দিন কাসিমি; বায়তুল হিকমা, লাহোর। প্রকাশকাল: ২০০৭ খ্রি.।
৪৬. মাসিক মুহাদ্দিস—ফিতনা-ই ইনকারে হাদিস সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২, লাহোর।

৪৭. সাপ্তাহিক আল ইতিসাম—হুজ্জিয়াত-ই হাদিস সংখ্যা; দারুদ দাওয়াতিস সালাফিয়া, লাহোর। প্রকাশকাল: ১৯৫৬ খ্রি.।

৪৮. ডক্টর তাহিরুল কাদিরি কি ইলমি খিয়ানতেঁ, ইমরান সাকিব; মিনহাজুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, গুজরানওয়ালা। প্রকাশকাল: ২০০৮ খ্রি.।

৪৯. প্রফেসর তাহিরুল কাদিরি: খাদিমে দীনে মাতিন ইয়া আফফাকে আজিম, গোলাম সারওয়ার কাদিরি; মিসবাহুল কুরআন, লাহোর। প্রকাশকাল: ১৯৮৮ খ্রি.।

৫০. মুতানাজাআ তারিন শাখসিয়াত, মুহাম্মাদ নাওয়াজ খারল; ফাতিহ পাবলিশার্জ, লাহোর। প্রকাশকাল: ২০০২ খ্রি.।

৫১. তাবির কি গলতি, ওয়াহিদুদ্দিন খান; মাকতাবাতুর রিসালা, নয়া দিল্লি। প্রকাশকাল: ১৯৬৩ খ্রি.।

৫২. রাহে আমল, ওয়াহিদুদ্দিন খান; মাকতাবাতুর রিসালা, নয়া দিল্লি। প্রকাশকাল: ১৯৯০ খ্রি.।

৫৩. মাসিক আর-রিসালাহ।

৫৪. সুবহে কাশমির, ওয়াহিদুদ্দিন খান।

৫৫. হায়াতে গামিদি, শাহ ইমরান হাসান; রাহবার বুক সার্ভিস, নয়া দিল্লি। প্রকাশকাল: ২০১৭ খ্রি.।

৫৬. গামিদি উলামা কে নজর মেঁ। নিরীক্ষণ: ফায়সাল খুরশিদ।

৫৭. মিজান, জাবেদ আহমাদ গামিদি; আল মাওরিদ।

৫৮. মাসিক ইশরাক।

৫৯. তাদাব্বুরে কুরআন, আমিন আহসান ইসলাহি।

